নতুন জাপান

কালীপদ বিশ্বাস

॥ ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি ॥

॥ কলিকাতা-১২ ॥

স্বর্গতা মাতৃদেবীর স্মরণে

প্রকাশকের নিবেদন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যে নতুন জাপান গড়ে উঠেছে তা' দেখে এলেন তিনজন নামকরা ভারতীয় সাংবাদিক। বর্তমান লেখক তাঁদের মধ্যে একজন।

জাপান দেখতে যাবার প্রাক্‌কালে লেখককে—অনেক দিনের পুরনো বন্ধু বলেই—অনুরোধ করেছিলাম নতুন জাপান নিয়ে একখানা বই লিখতে। সে অনুরোধের পেছনে একটা উদ্দেশ্য ছিল। সমতুল না হোলেও দেশ বিভাগের পর ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাঙলা দেশে, যে অবস্থা এলো জাপানকে তার চেয়েও অনেক কঠিন অবস্থার সামনে দাঁড়াতে হোল হিরোশিমা এবং ম্যাকআর্থারী যুগের পর।

জাপান সে অবস্থায় পড়ে কি করে আবার স্ব-প্রতিষ্ঠ হোতে চেষ্টা করছে এবং সে প্রচেষ্টা কতদূর সার্থকতার পথে এগিয়েছে তারই তুলনা ও তথ্যমূলক পরিচয় চেয়েছিলাম লেখকের কাছ থেকে। তিনি রাজীও হোলেন—তথ্য অনুসন্ধান ও পরিশোধন তাঁকে করতে হয়েছে সেই চুয়ান্ন সালের শেষ থেকে আজ পর্যন্ত। অভিজ্ঞ সাংবাদিকের দৃষ্টি পড়েছে জাপানের সমাজ-জীবনের নানা ক্ষেত্রে।

লেখকের জাপান দর্শনের পর এদেশের নামকরা অনেকেই সে দেশ ভ্রমণে গিয়েছেন এবং অবাক হয়ে ফিরে এসেছেন নতুন জাপানের বলিষ্ঠ কর্মজীবন দেখে। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হোলেন পশ্চিম বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু। শ্রীনেহরুর অর্ধ-শতাব্দী ধরে পুষ্ট জাপান দর্শনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার পর নতুন ভারতবর্ষের শুভদৃষ্টি স্বতঃই নতুন জাপানের ওপর বর্ষিত হবে।

এ অবস্থায় কেবল প্রকাশক বলে নয় ভারতীয় বলেই এ তথ্য-

মূলক বইখানা আগ্রহভরে পাঠকদের কাছে তুলে ধরলাম সমস্যা-জর্জরিত সমাজের মঙ্গল কামনায়। লেখকের "নতুন জাপান" আমাদের নতুন ভারতবর্ষ বুঝতে, আশা করি, অনেকখানি সাহায্য করবে।

যথাবিহিত যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও বইখানির মুদ্রণ সংক্রান্ত ছোটখাট ভুল-ভ্রান্তি বর্জন করা সম্ভবপর হয়নি। সে জন্যে পাঠকদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইছি।

বইখানির প্রচ্ছদপট কল্পনায় সাহায্য করেছেন গভর্নমেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়ার নিমন্ত্রিত সংস্কৃত সাহিত্যের এবং ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের ছু'জন জাপানী পণ্ডিত প্রফেসর নারা এবং প্রফেসর হাতরী। তাঁদের উভয়েরই কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

প্রকাশক

মুখবন্ধ

নতুন এশিয়ার ইতিহাস শুরু হয়েছে পুবের জাপান থেকে। সে ইতিহাস বড় বেশি দিনেরও নয়। শতাব্দীর গোড়া থেকে তার আরম্ভ। বণিক-পশ্চিম পুবের দরজায় ঘা' দিলে, এশিয়ার প্রতি ঘরে ঘরে প্রতিক্রিয়া শুরু হোল। গোড়ায় সেই প্রতিক্রিয়ার রূপ একই রকমের ছিল—ওদের সঙ্গে সর্ব প্রকারে অ-সহযোগ।

সে নীতি কিন্তু বিফল হোল। সিংহল, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, চীন, ইন্দো-চীন (বর্তমানের উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, লাওস ও কাম্বোডিয়া) প্রভৃতি দেশগুলো পশ্চিমাদের আনাগোনার পথে পড়ল এবং ধ্বসে গেল। জাপানেরও প্রায় সেই অবস্থা। তবে জাপান শীঘ্রই উট-পাখীর আত্মরক্ষার নীতিটা বদলে ফেলে গ্রহণ করল পশ্চিমী বিধিব্যবস্থা। জাপানী জাতটার বৈশিষ্ট্যটুকু আছে ঐ বদলানোর ক্ষমতার মধ্যে।

সে সব বিধিব্যবস্থায় যে পরিবর্তন এল জাপানে তার পরিচয় মিলল শতাব্দীর গোড়ায় রুশ-জাপান যুদ্ধে। যেমন ইয়োরোপ চমকাল জাপানী-বীর্যের প্রকাশে, তেমনি আত্মপ্রসাদ পেল এশিয়া।

ইতিহাস নতুন গতিপথ ধরল।

ক্রমে রুশ, তুরস্ক, চীন, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে এল জাগরণ। প্রথম মহাযুদ্ধে যে তরঙ্গ জাগল তা' আর থামল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নানা ঘাত প্রতিঘাতের, দুঃখ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এশিয়ার যৌবন-জল-তরঙ্গ উপছে পড়তে শুরু হোল। এশিয়া আজ দুর্বল হোলেও জাগ্রত।

কিন্তু জাপান?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজিত ও বিধ্বস্ত জাপান দেখে এলাম জাপানী সরকারের নিমন্ত্রণে।

স্বদেশে ফিরবার পর অনেক দিন ধরে মনস্থির করতে পারিনি পাকা খাতায় আমার কুড়িয়ে আনা ধারণাগুলো জমা রাখা উচিত হবে কি না?

অন্য কোনো দেশ হোলে হয়তো বেপরোয়া লেখনী-চালনা সম্ভবপর হোত। কিন্তু জাপান নিয়ে সে কাজ করা অতো সহজ নয়। কারণ, জাপানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করে দিয়েছেন ভারতবর্ষের কতকগুলো সেরা সেরা মাথা—বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, রাসবিহারী বোস আর সর্বশেষে নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

পূর্বাচার্যদের দেওয়া এই পরিচয় কিন্তু জাপানী সমাজের ও মানুষের অতীত ধ্যান-ধারণাগুলো আমাদের কাছে সহজবোধ্য করে রেখেছে। যে মন্তব্যগুলো এ বইতে উদ্ধৃত করেছি তা' থেকেই প্রমাণিত হবে অতীতের জাপানকে বুঝতে ও বোঝাতে কতখানি নির্ভর করেছি তাঁদের সুস্পষ্ট ও সুচিন্তিত মতামতের ওপর।

আজকের জাপানে যা' আমাদের কাছে সবচেয়ে জ্ঞাতব্য বলে মনে হয়েছে তা' হোল কেমন করে এক মহাপ্রলয়ের পর সম্পূর্ণ ভাবে ভেঙে-পড়া একটা জাত আবার উঠবার জন্যে চেষ্টা করে।

সমস্যা কোন্ দেশের নেই, জানিনে। তবে জাপানে আছে, যেমন আছে ভারতবর্ষে। সে সব সমস্যা নিরাকরণে জাপান যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে তা'ও দেখে এলাম।

এ সক্ষমতার কারণটাও খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছি, ধরতে পেরেছি কিনা জানিনে। মনে হয়েছে এর মূলে আছে গত শতাব্দীর মেইজী-যুগের নক্সাখানা। এ নক্সা সে দিনের সহজতর আন্তর্জাতিক অবস্থার মধ্যে, গোটা জাতটাকে একমুখী করে ফেলেছিল বিষয়-বৈভবের ক্ষেত্রে। আজও ঐ একমুখীকরণের

সবকিছু সুবিধা বিধ্বস্ত জাপান ভোগ করতে পারছে বলেই তার প্রচেষ্টা সার্থকতার মুখে। মেইজী-যুগের নক্সাখানায় নিশ্চয়ই ভুল-ভ্রান্তি ছিল—আজকের জাপানীদের কাছে সেটা অপরিজ্ঞাত নেই—কিন্তু তা' সত্বেও জাপানের আধুনিকীকরণে সে নক্সাই সাহায্য করেছে সবচেয়ে বেশি। জাপানকে জানতে হোলে সেই মেইজী-যুগের নক্সাখানার সঙ্গে সুপরিচিত হওয়া একান্তভাবে অপরিহার্য।

আজকের ভারতবর্ষে বহুত্বের মধ্যে একত্ব আনবার যে আয়োজন চলছে সম্পূর্ণ বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে তা' কতখানি সহজসাধ্য বা দুঃসাধ্য তা' মেইজী-যুগের নক্সাখানা দেখলে বুঝতে পারা যায়।

আমাদের মত নগণ্যদের বিদেশ দেখা আজ একেবারে অবাস্তব কল্পনা নয়। কিন্তু দেখবার ও দেখাবার 'টেকনিক' বর্তমানে সম্পূর্ণ ভাবে বদলে গেছে। জাপান দেখবার যে সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম তা' কিন্তু মনে হয়েছিল সুন্দরতম। জাপান থেকে সরকারী নিমন্ত্রণ এসেছিল একই পেশার তিনটি পেশাদারী প্রতিষ্ঠানে—টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, প্রেস ট্রাষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ও অমৃত বাজার পত্রিকায়। যে দু'জন সঙ্গী পেলাম তাঁরা ঝুনো সাংবাদিক—শ্রীফ্রান্‌ক্ মোরেস ও শ্রীদত্তাত্রেয় পুরুষোত্তম ওয়াগ্‌লে।

তিনজনেরই এক পেশা থাকাতে জাপানে আমাদের যে কোনো আলোচনা হোত 'সাস্‌টেন্‌ড'। একজন কোনো কিছু জানতে চাইলে অপরের লক্ষ্য সহজ ভাবেই গিয়ে পড়ত সে প্রশ্নটির ওপর এবং সে প্রশ্ন নিয়ে আরোও কিছু জানবার থাকলে আবার সেটি পরিষ্কার করে নেবারও সুযোগ মিলত। ভাষার অচলায়তন তো আছেই তবু সে বাধা থাকা সত্বেও প্রতিটি আলোচনার পরে যে জাপানের অন্দর-মহলে আরো কিছুটা প্রবেশের পথ পেলাম তা' মনে হোত। জাপানী রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পরে বা কোনো

বিষয় সূচী

চিত্র পরিচিতি

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন শিল্পী শ্রীনরেন দত্ত।

প্রচ্ছদপটের শেষের পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে একখানি নারী মুখোশ। জাপানী নো-অভিনয়ের প্রধান সজ্জাই হোল এ মুখোশ।

জাপানে অভিনয় কলার চরম আধুনিকীকরণ হয়েছে ম্যাকআর্থারী যুগে। কিন্তু সেখানে এখনও জনপ্রিয় হয়ে আছে স্বদেশী কাবুকী, পুতুলনাচ এবং নো বা মুখোশ-অভিনয়।

জাপানী পণ্ডিতদের মতে এ নো-অভিনয়েরও আদি জন্মস্থান ছিল ভারতবর্ষে। যাঁ'রা হিমালয়ের গুম্ফা-মঠে লামাদের মুখোশ-অভিনয় দেখেছেন তাঁ'রাই জাপানী নো-অভিনয়ের কলা-রূপ বোধহয় খানিকটা ধরতে পারবেন।

নো-অভিনয়ে মুখের হাবভাব দেখানর কোনই সুযোগ নেই, অঙ্গসঞ্চালন ও পদক্ষেপনও করতে হয় অতি সংযত ও সুপরিমিত ভাবে। অথচ এই স্বল্প পরিসর ক্ষেত্রে কলা-কৌশলী অভিনেতাকে প্রকাশ করতে হয় সর্বপ্রকার মানবীয় মনোভাব। তাই নো-অভিনেতা সৃষ্টি করেছেন অনেক মুদ্রা।

নো-অভিনয়ের তুলনা করা যায় মুদ্রা-বহুল ভারতীয় ভরতনাট্যম্ এবং কথাকলী নৃত্যের সঙ্গে। জাপানের নো-অভিনয়ের এবং ভারতীয় নৃত্যের মুদ্রাগুলো পাশাপাশি রাখলে মানুষের মুদ্রা-ভাষাও যে কত জীবন্ত ও ব্যাপক তার হয়তো সঠিক সন্ধানও মিলতে পারে।

নো-অভিনয়ের জন্যে মনের মত কাঠের মুখোশ বানাতে জাপানী শিল্পী অকাতরে ধ্যান করে এসেছেন বংশ বংশ ধরে। এ বিদ্যারও আছে বিরাট ঐতিহ্য। যে মুখোশখানির প্রতিরূপ প্রচ্ছদপটে দেওয়া আছে তার সৌন্দর্য মুগ্ধ করে রেখেছে জাপানের শিল্প-দৃষ্টিকে শত শত বৎসর ধরে। এ ছবিটি গ্রহণ করা হয়েছে প্রফেসর জিমারো তোকির নো-অভিনয় গ্রন্থ থেকে।

জাপানের যে ম্যাপখানা দেওয়া আছে বইতে তা' এঁকেছেন নামকরা ম্যাপ-আঁকিয়ে শ্রী অনিল মুখার্জি।

ভারত-জাপান মৈত্রীর প্রতীক

কামাকুরার দাইবাৎসু ধ্যানী বুদ্ধ

দু' চোখ ভরে টোকিওকে দেখে নিলাম—প্রথম দেখার তীব্র আগ্রহে। রাত হয়ে গেছে। টোকিও সহরের মাধুর্য ও যাদু তার রাতের ছবিতে। প্রথম দর্শনেই তার সেরূপের পরিচয় খানিকটা পেয়ে পুলকিত হলাম।

জাপানের রাজধানী টোকিও—কিন্তু অল্পই তার জাপানীত্ব। আধুনিক ভারতের যে কোন শহর থেকে আয়তনে ও জনসংখ্যায় বৃহত্তর; শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতায় অনেক, অনেক অগ্রসর। শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে দ্রুত যাতায়াতের জন্য যান-বাহনের সুব্যবস্থা তার উন্নত। অতি আধুনিক বৈদ্যুতিক ট্রাম ও ট্রেন, বাস ও রাস্তার নীচে ভূগর্ভস্থ রেলওয়ে—সবই আছে। কোনটারই অভাব নেই এই শহরে। এই সব সাধারণ যান-বাহন ছাড়াও আরও রয়েছে এক লক্ষের উপর মোটরকার, অসংখ্য ট্যাক্সী ও স্কুটার—টোকিওর একেবারে আধুনিকতম যান। রাজধানীতে পশুবাহিত কোন শকট দেখিনি। সমুদ্র থেকে শহরের অনেক জায়গায় খাল কেটে আনা হয়েছে এবং সেগুলিতে সর্বদাই মাল বোঝাই নৌকা যাওয়া আসা করে।

এই সব আধুনিক যান বাহন থাকা সত্ত্বেও টোকিও তার চির পুরাতন ও অতি পরিচিত রিক্সাওয়ালাকে ভুলতে পারেনি। এখনও শহরের রাস্তা-ঘাটে তাকে দেখা যায়। মোট যাত্রীসংখ্যার একটা অংশ এখনও রিক্সাতেই চলাফেরা করে। খড়ের টুপী আর প্রাচীন পোষাকে রিক্সাওয়ালাকে শহরে দেখে সেই কেতাবে-পড়া পুরনো জাপানের কথা মনে পড়ে। আজকের মহানগরী টোকিওতে

সে যেন অপরিচিত আগন্তুক। অতীতের সাক্ষী রিক্‌সাওয়ালারা টোকিওর পথে আজও কিন্তু আকৃষ্ট করে বেশীর ভাগ বিদেশীদের। বোধ হয় অতীতের সাক্ষী বলেই। এদের মধ্যেও বিশেষ করে বিদেশী সেনা বাহিনীর কর্মচারীদের পক্ষপাতিত্ব দেখা যায় রিক্‌সার উপর। রিক্‌সার বড় পৃষ্ঠপোষক ওরাই। কলকাতার রিক্‌সার তুলনায় এখানকার রিক্‌সা স্বল্প পরিসর। তবু প্রায় দেখা যায় তুজনে চাপাচাপি করে বসে কোনও রকমে চলেছে বুঝি একত্রে পাশাপাশি বসে যাবার আনন্দটুকুর লোভে।

আজকের টোকিও ১৯২৩ এর ভূমিকম্প ও হিরোশিমা যুগের ধ্বংসাবশেষের উপর পুনর্গঠিত। পুনর্গঠনের কাজ এখনও শেষ হয়নি। আজও শুনতে পাই টোকিও প্রতি বৎসর গড়ে পঞ্চাশ বার ভূ-কম্পনে আলোড়িত হয়। তবে টোকিওবাসী এই অবস্থাকে চমৎকার ভাবে মেনে নিয়ে পৃথিবীর ঝাঁকানো নাচানোতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আজ এ জন্যেই সে নির্ভীক চিত্তে সব কিছু তুচ্ছ করে গড়ে চলেছে কংক্রীট ও ইস্পাতের অতিকায় অট্টালিকা—ঐ ভূ-কম্পন মণ্ডলের মধ্যেও। এই সব যুদ্ধোত্তর স্থাপত্য নিদর্শনের অধিকাংশই দাঁড়িয়ে আছে দশতলা উঁচু হয়ে মাটীর উপর। মাটীর নীচেও গেছে তু'তলা। চারদিকেই চলেছে পুরনো বাড়ী ধ্বংস ও নতুন বাড়ী তৈয়ারীর কাজ। চারদিক ধ্বনিত হয়ে ওঠে হাতুড়ি, ড্রিল আর ক্রেনের আওয়াজ। রাত্রে বিছানায় শুয়ে এই পুনর্গঠনের সঙ্গীতের সঙ্গে বৈত্যুতিক ট্রেনের অবিরাম গর্জন মিশে যখন কানে আসে তখন কোলাহলময়ী কলকাতার কথাই মনে পড়ে। টোকিওবাসীর স্পর্শপ্রবণ মন কিন্তু আহত হয়, টোকিওকে যদি কোলাহলময়ী বলা হয়।

জাপানীরা সত্যি এত স্বল্প ও মৃতুভাষী যে পাশের ঘরের জাপানীটির অস্তিত্বই যেন অনুভূত হয় না—যদিও তু'ঘরের মাঝখানের ব্যবধান মাত্র একটী পাতলা কাঠের ও ঘষা কাঁচের পার্টিশন।

অধিকাংশ জাপানী হোটেলে এই ব্যবস্থা। গোটা জাতটা যেন স্তব্ধ—মূক হয়ে রয়েছে। রেলওয়ে ষ্টেশনে অধিকাংশ সময়েই খুব ভীড় দেখা যায়। শহরের বড় বড় দোকানগুলিতেও এই রকম ভীড় প্রায় সব সময়ই লেগে আছে। ট্রামে, 'বাসের স্ট্যাণ্ডে ত বটেই। কিন্তু কোথায়ও কোন সোর-গোল নেই। ভারতে যেখানে মৌন ব্রতের মহিমা এত শোনা যায়, যেখানে গান্ধীজী স্বয়ং সপ্তাহে একদিন মৌন ব্রত পালন করতেন, সেখানে স্বল্পভাষিতার আদর ততটা দেখা যায় না, যা জাপানের মাটি ছুঁলেই বুঝতে পারা যায়। জাপানীর স্বল্পভাষিতা তার জাতিগত ধর্ম বলে মনে হয়।

যেখানেই আপনি যান, কোন জাপানী আপনাকে দেখতে পেলে আপনাকে ভাল করে লক্ষ্য করবে, আর আপনার চোখ যদি তার চোখে পড়ে তবে হয়ত সে বেশ মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে আপনাকে অভিবাদন জানাবে। কিন্তু কোথাও সে নিজের হাঁড়ির কথা পেড়ে আপনার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করবে না, যেটা ভারতে অনেক জায়গায় বিশেষভাবে চোখে পড়ে। তার মানে এ নয় যে জাপানী বিদেশীকে ভাল করে জানতে চায় না। জানতে সে খুবই উৎসুক। তবে সেটা যথা স্থানে যথা সময়ে, ধীরে সুস্থে করতে সে অভ্যস্ত—অন্ততঃ রাস্তায়, ফুটপাতে বা বাস স্ট্যাণ্ডে নয়ই।

জাপানে এসে আমার মনে প্রথম প্রতিক্রিয়া কি দেখা দিয়েছিল তা আলোচনা করলাম একজন নবাগত ইংরেজ সাংবাদিকের সঙ্গে। ভদ্রলোক লণ্ডনের বিখ্যাত দৈনিক টাইমস্-পত্রিকার করেস্পন্‌ডেণ্ট। আলাপটা জমলো জাপানের পররাষ্ট্র দপ্তরের বার্তা বিভাগীয় ডিরেকটরের প্রদত্ত পার্টিতে। ভদ্রলোকের দূর-প্রাচ্যে এই প্রথম পদার্পণ। কিন্তু টোকিওতে এসে তিনি নাকি ধারণাই করতে পারছিলেন না যে, তিনি এশিয়াতে আছেন। হোলই বা টোকিও এশিয়ার মধ্যমণি। কিন্তু তাঁর কাছে এটা নাকি ইয়োরোপের শহরতলী মাত্র।

এখানকার লোকের গায়েই শুধু যা পীত আভা, অন্তরটা কিন্তু তাদের পশ্চিমী। পোষাকটা ত বটেই। ভদ্রলোকের এই অভিমত আমাকে মানতে হোল। এদের পুরুষের সাজসজ্জা বা মেয়েদের কেশ-বিন্যাস আমেরিকান না ইয়োরোপীয়ান এই প্রশ্নই প্রথমে আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এশিয়ার কথা ভুলেও মনে পড়েনি। টোকিও বা অন্য যে কোন শহরবাসী, অফিসের কর্মচারী, ট্যাক্সিচালক, মুটে, চাষী, জেলে, মালী সবারই পোষাক পশ্চিমী। মেয়েদের বেলাতেও তাই—ধনীঘরের মেয়েদের বা "গায়শাদের" কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। কিন্তু অফিসে কাজ করা সাধারণ ঘরের মেয়ে, বাড়ীর বা হোটেলের ঝি, দোকানের সেলস্ গার্ল, বা ফ্যাক্টরীর মেয়ে মজুর—সবারই চুল বব্‌ড করে ছাঁটা। ওরা ছেড়েছে কিমোনো—যার সুখ্যাতিতে একদিন রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। কিমোনো ছেড়ে ফেলে কিন্তু জাপানী মেয়ের কোন দুঃখ নেই—তাকে প্রশ্ন করলে সে দেখাবে এই ছেড়ে ফেলার পেছনের অর্থনৈতিক কারণ। সেটা খানিকটা সত্য হতে পারে। কিমোনোতে অনেক খরচ। ঝামেলাও বেশী। কিন্তু আজকের জাপানী জাতটাকে সমগ্রভাবে বিচার করলে দেখা যাবে অর্থনৈতিক কারণটাই একমাত্র কারণ নয়। জাপানীরা পশ্চিমী পোষাক আর পশ্চিমী মনোভাব ধরেছে, কারণ এটা আধুনিক জীবনের পক্ষে উপযোগী। ঘরে ফিরে কিমোনো পরে ওরা সনাতনী হবার চেষ্টা করে। বিদেশীর কাছে সেটা দেখতে ভালও লাগে। কিন্তু সেটা নিতান্তই চেষ্টা মাত্র।

ইংরেজ সাংবাদিক এবার আমাকে প্রশ্ন করলেন, জাপান দেখে প্রথম আমার কি মনে হয়েছে? উত্তরে জানালাম এখানকার শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ ভীড়ের কথা যা লক্ষ্য করেছি রাস্তাঘাটে, দোকানে, বাজারে, ট্রামে, বাসে সর্বত্র। এই সব জায়গায় যান বাহনে লোকে যখন ভীড় ঠেলে চলাফেরা করে না, তখন অবাক হয়ে চেয়ে

থেকেছি। দেখেছি নিঃশব্দে রিং ধরে দাঁড়িয়ে মাইলের পর মাইল ট্রামে সহযাত্রীর বিন্দুমাত্র অসুবিধা না ঘটিয়ে যাত্রীরা সব চলছে।

ইংরেজ সাংবাদিক হঠাৎ প্রশ্ন করলেন :

এমন অবস্থায় কলকাতায় কি হোত ?

আমাকে বলতে হোল, অন্ততঃ দু'টো একটা গরম গরম বাক্য বিনিময় ত হোতই—সে সহযাত্রীর সঙ্গেই হোক কি কণ্ডাক্টর বা ড্রাইভারের সঙ্গেই হোক। অবস্থা যদি আরও একটু ঝাঁঝালো হয় তা হলে ট্রামের অদৃশ্যমান কর্তৃপক্ষও দু' চারটা মধুর সম্বোধনে আপ্যায়িত হতে পারেন; যদি ব্যাপার আর একটু এগোয় তাহলে, নিঃসন্দেহে ট্রামটিকে জোর করে থামানো হবে, কিছু পাথর বর্ষণও হবে, আর চরম অবস্থায় ট্রামের যজ্ঞও হতে পারে,—সোজা কথায় জ্বালিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

ভদ্রলোক হাসলেন। কলকাতার ট্রাম বাস জ্বালানর খবর যা বিলেতে পড়তেন তার যেন একটা হদ্দিস পেলেন বলে মনে হোল।

পরে আমরা দুজনেই কিন্তু একই উপসংহারে এসে পৌঁছলাম। ভারতবর্ষে আমরা যখন যুগ যুগ ধরে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ প্রদর্শন ইত্যাদি করে এসেছি—তার কারণ যতই ন্যায়সঙ্গত হোক না কেন—জাপানীরা তখন শুধু শৃঙ্খলা আর নিয়মানুবর্তিতায় গড়ে উঠেছে। কাজেই আমরা হয়েছি প্রতিবাদী, অনিয়মক—আমরা শিখেছি ভাঙ্গতে। ওরা হয়েছে অনুগত, সমবায় ভাবাপন্ন—ওরা শিখেছে গড়তে।

আজকের জাপানের উপর ভূমিকা এখনও শেষ হয় নি।

টোকিওর জল হাওয়া চমৎকার। অবশ্য আমার পক্ষে সময়টা (সেপ্টেম্বর) এর মধ্যেই কন্‌কনে ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছে। যে হোটেলটিতে আছি তার তাপ উৎপাদনের যন্ত্রটা চেষ্টা করেও জ্বালাতে পাচ্ছি না। হোটেলের পরিচারিকাকে ডাকি। গত যুদ্ধে স্বামী-হারানো মেয়েটী দাঁড়িয়ে আমার অভিযোগটী শুনল, তাপযন্ত্রটির দিকে একবার তাকাল। তারপর সেটাকে কয়েক

মিনিটের মধ্যেই সচল করে তুলল। শিশু বয়সে বাধ্যতামূলক কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা যা সে পেয়েছে সে বিদ্যাটুকু আর সবাই-এর মত তাকেও মোটামুটি বেশ কারিগর তৈরী করে তুলেছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার টুকিটাকি যান্ত্রিক গোলযোগ মিটিয়ে কাজ চালিয়ে নেবার মত যথেষ্ট যোগ্যতা এখানে সকলেরই আছে। শুধু গ্যাস বা বিদ্যুত্ নয়, রেলগাড়ী, ট্রাক্টর, ফোটোগ্রাফী, পুতুল তৈরী, পর্দা তৈরী বাইসাইকেলের বিভিন্ন অংশ পালিশ করা, এমন কি তৈরী করা—সব কিছুরই কিছু কিছু জ্ঞান এদের আছে। জরুরী অবস্থায় এ সব যে কোন যান্ত্রিক ব্যাপারে কাজ চালিয়ে নিতে এরা পারে। স্কুলেই এ সব কাজে তাদের ট্রেনিং হয়ে যায়। তারপর ফ্যাক্টরীতে ঢুকে হয় অভিজ্ঞতা লাভ। মনে পড়ে নিজেদের কথা। মেয়েদের ত দূরের কথা, কলেজে পাশকরা ছেলেও বাড়ীতে ইলেকট্রিক ফেল করলে চুপ করে বসে থাকে যতক্ষণ না মিস্ত্রী এসে লাইন সারিয়ে দেয়।

জাপানের গ্রামাঞ্চল ছবির মত। অন্ততঃ যে অংশটা আমরা দেখেছি। সাগর, আকাশ ও মাটী যেখানে সেখানে ভাই-বোনের মত যেন গলাগলি করে দাঁড়িয়ে আছে।

যেতে যেতে কতবার মনে হয়েছে আধুনিক কবির সেই লাইন ক'টি—

"আহা, তুমি চেয়ে দেখতে যদি
ঘন হ'ল বন। বনের পরে,—
এঁকে বেঁকে যায় একটি নদী।
পৃথিবী হারায় নম্র নীলে
জল, বালু, আর আকাশ মিলে
একাকার। শীত রৌদ্রামোদী।
তুমি শুধু চেয়ে দেখতে যদি।"

অসিতকুমার। চিলিমপুরের ঘাট : প্রত্যাবর্তন।

উপকূল ছাড়িয়ে ভিতরে প্রবেশ করলে চোখে পড়ে বর্ণের সমারোহ। স্ফটিক স্বচ্ছ হ্রদের চার পাশে গাঢ়সবুজ ঘাস, বাতাসে যেন কি রকম একটা ঝিকিমিকি, শরৎ হেমন্তের ছায়া সঙ্গমে জল হাওয়া অতি মনোরম। বসন্তে চেরী ফুটলে ত কথাই নেই। সমস্ত জাতটা শুনি পাগল হয়ে ওঠে।

কিন্তু প্রাকৃতিক ছবির থেকে জাপানের মানুষের সৃষ্টি কোন অংশই কম নয়নাভিরাম নয়। যেখানেই প্রকৃতি তার পসার খুলে বসেছে সেখানেই জাপানী মানুষ হয় মন্দির বা আড্ডা দেবার ব্যবস্থা করে রেখেছে। এই সব জায়গায় প্রধানতঃ দুটি জিনিষ নজরে পড়ে। প্রথমতঃ জায়গাগুলো পরিচ্ছন্ন ও সাজ-গোজে এত নিখুঁত যে বিদেশীরা দেখা মাত্রই সুখ্যাতি না করে থাকতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ থাকবার বন্দোবস্তই বা কি চমৎকার—কেউ যে সামান্য অভিযোগ করবে এমন ফাঁক রাখা হয় নি। জাপানীরা নিজেরাও বিদেশী মুসাফিরদের মত এসব জায়গাগুলির পৃষ্টপোষকতা করতে একটুও কার্পণ্য করে না।

সারা শরতে, হেমন্তে আর বসন্তে জাপানী স্ত্রী-পুরুষ তাদের দ্বীপময় দেশটুকু দেখে বেড়ায়। স্বদেশীয় বা বিদেশীয়দের দেশের যা কিছু দ্রষ্টব্য তা দেখাবার জন্য আর্ন্তদেশীয় টুরিষ্ট সংস্থা অনেক রয়েছে। নিশান হাতে দেখেছি দলে দলে গাইডেরা এই সব জায়গায় অপেক্ষা করছে পর্যটকদের জন্যে। পৌঁছে দেবার জন্যে রয়েছে বাস, স্পেশাল ট্রেন ও ষ্টীমার। ছেলে, বুড়ো, স্ত্রীলোক, কেরাণী, মজুর কেউ বাদ নেই। প্রায় দেখা যায় একই মাপের শিশুরা, গায়ে একই ধরনের ইউনিফরম্ পরে, তাদের শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে এখানে ওখানে ঘুরে ফিরে সব দেখছে।

জাপানীদের মত বাঙালীর দেশ ঘুরে দেখবার নেশা অনেকদিন থেকেই রয়েছে। যুদ্ধোত্তর যুগে অনেকানেক কারণে এটা বাড়তে পারেনি। কিন্তু মনে হয় ভারতীয়দের মধ্যে তীর্থ ছাড়াও যে

বিরাট দেশটা আছে তা দেখতে বেশীর ভাগ বাঙালীই ছোটে। আজ দেশ জুড়ে এই নেশা বাড়ানোর সাড়া পড়েছে। শুভ লক্ষণ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এর আর একটী দিক আছে যার পরিচয় পেলাম জাপানে। প্রথমতঃ জাপানী স্কুলের শিক্ষকেরা নিজেরা ছেলে মেয়েদের এ সব যায়গা দেখাতে নিয়ে যান। প্রতি শিক্ষকের অধীনে ১০।১২টী করে একই ক্লাসের ছাত্র ছাত্রী থাকে, যাদের তত্বাবধানের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে দায়ী থাকেন তিনি। তাদের যান বাহনের ও হোটেলে থাকবার ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই ঠিক করা থাকে ও ঘড়ির কাঁটার মত সে ব্যবস্থা-মত কাজ করা হয়। বেড়ানোর খবর পাবার পূর্বেই অভিভাবকেরা টাকা জমা দিয়ে রাখেন স্কুলে এবং সেই ফাণ্ড থেকে খরচ করা হয়। যতদিন না এই সব ব্যবস্থা এ দেশের স্কুল কলেজে গড়ে তোলা যায় ততদিন, বিশেষতঃ ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে ভ্রমণে বেরুনো সুখপ্রদ না হবারই সম্ভাবনা বেশী।

এ রকম দল বেঁধে বেড়ানোর যেমন সামাজিক মঙ্গলের দিক আছে তেমন বাধাও আছে। টোকিও ইউনিভারসিটী দেখবার সময় একটী ছেলের সঙ্গে আলাপে সে দিকটা আমার চোখে ধরা পড়ল। মনে হয় এই দেশ দেখানোর চেষ্টা যা এখানে চলছে সেটা সার্থক করে তুলতে সেই জাপানী ছাত্রটীর নিজ জীবনের অভিজ্ঞতাটুকু কাজে আসতে পারে।

আমি তাকে নিজের থেকেই এই দেশ দেখাবার বিরাট চেষ্টা যে ভাল লেগেছে তাই জানালাম। সেও সেটা স্বীকার করে সঙ্গে সঙ্গে বলল যে, স্কুলে পড়বার সময় যখন একটু বড় হয়ে দল বেঁধে বেড়াতে গেছে তখন সিগারেট খাওয়া সে প্রথম শিখল হোটেলে থাকা কালে। হোটেলওয়ালা ও হোটেলের 'গায়শা' মেয়েরা অতিথিদের কাছে সিগারেট বিক্রী করতে উৎসাহী হয়, ফলে সে ও তার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বেশ একটা অংশ যখন ঘরে

ফিরল তখন সিগারেটের নেশায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। শুধু সিগারেট নয়, বিয়ার ও অন্যান্য ধরনের নেশার সঙ্গেও প্রথম পরিচয় লাভের সুযোগ আসে দেশ দেখার সময় এই সব হোটেলে থাকা কালে। "সাকের" পিয়ালা বদলা-বদলি হতেও থাকে।

ছেলে মেয়েরা একই সঙ্গে বেড়াতে বেরুলে যে ফল ফলে তাও সে জানে। এমনি এক দলের খবর নিয়ে সে টের পেয়েছে যে প্রায় প্রত্যেকের আধা ডজন বন্ধু-বান্ধবী হয়ে পড়েছে এবং ভ্রমণ শেষ হলেও তাদের মধ্যে চিঠিপত্রে ভালবাসার আদান-প্রদান আরম্ভ হয়েছে। প্রতি ক্ষেপে প্রতিটি ছেলেমেয়ের দেশ দেখাবার জন্য ২০০।৩০০ টাকা খরচ করে তার পরিণতি যদি এমনধারা হয় তবে কি আমি তা সমর্থন করি—সে জিজ্ঞাসা করল।

আমি তার প্রশ্নের উত্তর তখন দিতে পারিনি এবং এখনও পারি না।

দেশ দেখে বেড়াবার যে ভাল দিকটা আছে তাও কিন্তু সহজেই চোখে পড়ে। জাপানী যে তার বাড়ী ও ঘরখানি পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখতে ভালবাসে তার কারণ এই শিশুবয়সেই বাইরের সৌন্দর্যময় জগতের সঙ্গে পরিচিত হয় বলে। আর কিছু না থাক, এক গুচ্ছ ফুল যার ঘরখানিতে নেই এমন জাপানী বোধ হয় নেই। জাপানের পথে ঘাটে শিশুদের যে চিত্র প্রদর্শনী সব সময়েই দেখা যায় তাতে বিদেশী, বিশেষ করে আমাদের তাক লাগবার কথা। এটাও তাদের প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়ের সাক্ষাৎ ফল। আমার মনে হয় বহিঃপ্রকৃতির দৃশ্যাবলী ও তার সৌন্দর্যের সম্বন্ধে উন্নত ও জাগ্রত বোধ জাপানীরা অনেক জাত থেকে, বিশেষতঃ ভারতীয়ের থেকে, বেশী আয়ত্ব করেছে এই কারণেই। ফুলের সজ্জা, ঘরের মধ্যে ফুলের গাছ বসাবার রীতি, গাছ বেটে করে রেখে কৃত্রিম বাগান সৃষ্টি প্রভৃতিতে যে সূক্ষ্ম শিল্প ও সৌন্দর্য

বোধ প্রকাশ পায় তা মানুষের সভ্যতায় জাপানের অন্যতম দান। রবীন্দ্রনাথ জাপানের এই দিকটা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। জাপানের পুষ্প উপাসনা—উপাসনাই বলা চলে—আজকের নয়—অতি প্রাচীনকাল থেকে এর ঐতিহ্যধারা চলে আসছে।

গোটা দ্বীপটায় হয়ত এমন কিছুই নেই যা ফতেপুরসিক্রী বা তাজমহল বা দক্ষিণ ভারতের যে কোন বিরাট মন্দিরের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে সমৃদ্ধিতে। তা' না পারল, জাপানীর সৌন্দর্য বোধ পাথরের বদলে ফুটেছে প্রকৃতির সৌন্দর্য পূজায়, এবং এখানে সে একক, অদ্বিতীয়, নিজের স্বাতন্ত্র্যে অনুপম। দেখলাম ফুজিয়ামা যার নাম মাত্র উচ্চারণে জাপানীর ভাবের আবেশ হয়। দেখলাম নিক্কো মন্দির ও বাগ, মিয়াজামা দ্বীপের মন্দির ও হাকোনের উষ্ণপ্রস্রবণ। সুন্দর তো বটেই—তবে তাদের আরও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যে সুন্দর করে রেখেছে জাপানী নিজ হাতে। দূর থেকে ফুজিয়ামার তুষার শুভ্র চূড়ার দিকে তাকিয়ে মনে পড়েছে কালিম্পংয়ের কথা। ঠিক এই রূপটি দেখবার জন্য প্রতি সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে থেকেছি নিউ-হিলের মাথায় কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে তাকিয়ে। কিন্তু হিমালয়ের ঐ ভয়াল সৌন্দর্য উপভোগ করবার কেন্দ্রগুলিকে কী রকম অবহেলায় ফেলে রেখেছি আমরা! আর জাপানীরা ফুজিয়ামাকে কত যত্নে এমন সাজিয়ে রেখেছে যা দেখে বিদেশী মাত্রই মুগ্ধ হয়।

টোকিওতে অসংখ্য দোকান পসার ত আছেই তার উপর ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর এক ডজনেরও বেশী রয়েছে। তাদের সব চাইতে ছোটটিও দশতলা উঁচু। এর প্রত্যেক তলার দৈর্ঘ প্রস্থ নিয়ে মেঝের আয়তন কলকাতার সব চাইতে বড় স্টোরটির মেঝের অন্তত পাঁচ ছ গুণ বেশী। আমরা জাপানে থাকতে এদের একটির বিংশতিতম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হোল। সেই সঙ্গে সঙ্গে এর সংযুক্ত আর একটী উইঙ্গও খোলা হয়। সেটি এগারতলা বাড়ী। একটি তিনতলা করিডর দিয়ে

নতুন ও পুরনো স্টোর দুটি সংযুক্ত। স্টোর-বাড়ীর নয়, দশ আর এগার তলার প্রতিটি মেঝেতে একত্রে হাজার লোক আসন গ্রহণ করতে পারে। মাঝখানের হলটিতে একটি ঘোরানো স্টেজ ও সিনেমার পর্দা রয়েছে। এখানে চলচ্চিত্র দেখানো হয়। এর সঙ্গে যুক্ত আছে চায়ের ঘর এবং জাপানী প্রথায় সাজানো বাগান। একেবারে ছাতের উপর আছে বিরাট বাগান তার মাঝে বেশ মানানসই একটি জলাশয় এবং সামনে খোলা স্টেজ। ওঠা নামার জন্য রয়েছে প্রায় ডজনখানেক এক্‌সপ্রেস ও অর্ডিনারী লিফট ও দুটি স্বয়ংক্রিয় চলন্তমান সিঁড়ি। সচল সিড়ি দুটি মিনিটে ১৫০ গজ বেগে ওঠা নামা করে।

একটি বাড়ীর বিষয় এত কথা বললাম কারণ এর থেকেই টোকিওর চরিত্র-পরিচয় কিছুটা আঁচ করতে পারা যায়। এর যে কোনটিতে ঢুকলে আলোর ঔজ্জ্বল্যে চোখ ঝলসে যাবার উপক্রম হয়। পণ্য সম্ভারের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বিস্ময় আনে। কেনা বেচা যে কিরকম নিঃশব্দে নির্বিবাদে চলে সে ত এক আশ্চর্য ব্যাপার। জাপানের সেলস্ গার্ল যেন মুখ দেখেই বুঝে নেয় ক্রেতা কি চাইছে। আর তা বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি যা চাইছেন কাউণ্টারে এসে গেছে, মিষ্টি একটু হাসির ফাউ সমেত। আপনি ঠিক যা চাইছেন বা যা হয়ত ভাল ভাবে বুঝিয়ে দিতে পাচ্ছেন না সেটিও আপনার সামনে রাখতে ও আপনার হাতে তুলে দেবার জন্যই যেন সে আগ্রহশীলা। অতি সুষ্ঠু প্যাকিংএর জন্যে আপনাকে এক মিনিটও বেশী দাঁড়াতে হয় না।

স্টোরের কোন এক তলায় 'সেল' চলেছে। সেখানে বেশ ভীড়। কিন্তু সব কিছু হচ্ছে যেন নিঃশব্দে। কলকাতায় কোন স্টোরে সে রকম 'সেল' আরম্ভ হোলে কি ঘটত মনে মনে চিন্তা করে দেখলাম। কত গণ্ডার মাথা কাটত, কতগুলি পুলিসকে হাজির হতে হোত কল্পনা করলাম।

আজকের টোকিও এবং টোকিওর ছাঁচে গড়া অন্যান্য জাপানী শহর ইস্পাতের আর কংক্রীটের অতিকায় গগনস্পর্শী আধুনিক স্থাপত্যের সমারোহে ঐশ্বর্যময়ী, কিন্তু এর বিশালতা সত্ত্বেও টোকিও বা এই সব শহরের স্থাপত্য কলকাতার মতই বর্ণসঙ্কর। সে রূপ কেবল একবারই চোখ ঝলসাতে পারে। যে কোন একটা নমুনা দেখলেই গোটার স্যাম্পেল সারভে হয়ে যায়।

কিন্তু রাত্রের টোকিও অপরূপ, অপূর্ব—স্বপ্নের মত। ইন্দ্রজাল জড়ানো জাপানের মাটীতে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায় না, কিন্তু জাপানের জলই তার পেট্রল। সে জলের প্রতিবিন্দুটি পর্যন্ত জাপানী কাজে নিয়োগ করেছে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে এবং সেই বিদ্যুতের আলোতে শহরগুলি সাজাতে। এই বিদ্যুৎশক্তি এখানে কিরকম মুক্ত হাতে ব্যয় করা হয় দেখলে তা বোঝা যায়। আকাশ থেকে টোকিওকে দেখলে মনে হবে যেন গোটা আকাশটা সব তারা নিয়ে মাটীতে নেমে এসেছে। স্তরের পর স্তর আলোর সারি। শূন্যেই যেন জ্বলছে। হাজার হাজার আলোকিত জানলা, তলার পর তলা উঠেছে আকাশের দিকে। আলোর তৈরী স্তম্ভ, আলোর তৈরী চুড়া, আলোর পুকুর, আলোর পিরামিড, আলোর গোলোক, আলোর উপর আলো, তার উপর আলো—সে এক অলীক, অবিশ্বাস্য জগৎ যেন। কলকাতার এস্‌প্লানেডের আশে পাশে যে আলোর খেলা দেখা যায় জাপানের যে কোন ছোটখাটো মফঃস্বল সহরে গেলে তা চোখে পড়বে।

এই আলোর উৎসব সারারাত ধরে চলে। কিন্তু কেন—কিসের জন্য—কার প্রয়োজনে? আলো হঠাৎ ফেটে পড়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে চলেছে, চরকির মত, ঘূর্ণীর মত ঘুরে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে ভেংচি কেটে, চোখ মিটিমিটি করে বিজ্ঞাপন জানাচ্ছে, জ্বলে নিভে, আবার জ্বলে, ঘুরে ফিরে এসে, সেই এক বিজ্ঞাপনই নিবেদন কচ্ছে। প্রকাণ্ড দৈত্যের হাতের লেখার মত লাল, সাদা, নানা রংয়ের আলোর অক্ষর

ছাত থেকে ছাতে দৌড়য় লাফায়; নিভে যায় আবার জ্বলে; আবার দৌড়য় আবার লাফায় আর কেবলই বিজ্ঞাপন ঘোষণা করে চলে। বিদ্যুৎকে যেন সার্কাসের ট্রেনিং দেওয়া বানর করে রেখেছে এরা, খেলা দেখাবার জন্য; টোকিওর গিনজা এলাকায় আলোর এই নৃত্য দাড়িয়ে দেখা নাইট ক্লাবের নাচের মতই কৌতুকময়ী।

ওসাকায় কয়েকজন ক্রোড়পতি শিল্পপতির সঙ্গে আলাপে প্রশ্ন করলাম জাপান বিদ্যুৎ শক্তির এত অপচয় করে কেন? বেশ সরল ভাষাতেই ওঁদের একজন জবাব দিলেন জাপান প্রতিযোগিতায় বিশ্বাসী। অতএব সকলেই চায় তাদের পণ্যের শ্রেষ্ঠত্ব আপামর জন-সাধারণের সামনে তুলে ধরতে। আলোর বিজ্ঞাপন ত কেবল একটী মাধ্যম মাত্র। আরও অনেক মাধ্যম আছে সেখানেও জাপান বিজ্ঞাপন দেয় দরাজ হাতে।

সেই টেবিলেই আর একজন শিল্পপতি ছিলেন তিনি তাঁর লেখা এক খানা বই আমাদের হাতে গুজে দিলেন,—"জাপান কোন্ পথে?" বইখানিতে লেখক, এফ, তাকাহাতা জানাচ্ছেন—"জাপান বহুদিক থেকেই অপচয়ের দেশ, জাপানের ব্যক্তি ও গোষ্ঠী উভয়ই অপচয়শীল। সামান্য মুনাফার সম্ভাবনা যেখানে সেখানে মুলধন ঢালা হয় জলের স্রোতের মত, ফলে অতিরিক্ত উৎপাদন হয়। অবিক্রীত মাল জমে ওঠে, পুঁজি হয়ে যায় বন্দী। এইরকম মৃত ও বন্ধ্যা পুঁজির আতিশয্যে জাপান আজ প্রায় পুঁজি শূন্য। মুনাফাহীন অতিরিক্ত মুলধন খাটিয়ে আজ তার শিল্প মরতে বসেছে। বাঁচতে হ'লে জাপানীকে এ বিষয়ে অবহিত ও শিক্ষিত হতে হবে।"

কিন্তু আমোদ-মত্ত টোকিও বা ওসাকা এ ব্যাপারে বধির। কেনই বা তারা শুনবে সে কথা? হিরোশিমার পর তার জীবনে যে আমোদ প্রমোদের জোয়ার এসেছে, যুদ্ধ-পীড়িত কোন দেশে তা আসেনি। এই জোয়ারে গা ভাসিয়ে জাপানী থাকতে চায়—ভুলতে চায় তার বাকি বকেয়ার হিসেব।

জাপানে রওনা হবার প্রাক্‌কালে এক আমেরিকান বন্ধু বলেছিলেন—"সুন্দরী টোকিওর মুখে বিন্দুমাত্র দুঃখ বা দুঃশ্চিন্তার চিহ্ন দেখতে পাবেন না"। কথাটা ঠিকই বলেছিলেন বটে ভদ্রলোক। জাপানের এই রূপের পরিচয় পেয়ে কয়েক জন ফিলিপিনো সাংবাদিক বলেছিলেনঃ "জাপানের সমৃদ্ধি দেখে মনে হয় ফিলিপাইনের যুদ্ধ ক্ষতিপূরণের দাবী মেটাতে তার এখন কোন আপত্তি করা উচিত নয়।"

হিরোশিমা উত্তর-যুগের জাপান সত্যি এক অভিনব সৃষ্টি। বিজেতা এসেছিল তাকে পিষে মারতে, চিরকালের জন্য খোঁড়া করে রাখতে। কিন্তু সেই জিম্মেদারদের তাগিদে গড়ে উঠেছে এক নয়া জাপান। কি তার ভবিষ্যৎ সে তা নিজেও হয়ত জানে না।

জাপানের রাষ্ট্রনীতি

জাপানে যেমন গ্রাম এবং শহরের লোকদের জীবন যাত্রা লক্ষ্য করেছি, কারখানা ও দর্শনীয় স্থান দেখেছি, তেমনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, শিল্পপতি, অধ্যাপক, ছাত্র, কৃষক এবং নারী আন্দোলনের নেত্রীদের সঙ্গেও পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছি। আমরা যা কিছু দেখতে চাই জাপানের পররাষ্ট্র দপ্তর বিনা দ্বিধায় অনুমোদন করেছেন এবং যাদের সঙ্গে সরকারীভাবে কোন সংযোগ করা সম্ভব হয়নি তা বেসরকারী ভাবে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। জাপানী কমিউনিষ্টদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার এই ভাবেই সম্ভব হয়।

কলকাতা ফিরবার দিন সকালবেলা পর্যন্ত এই দেখাশুনা চলেছিল। শেষের দিন যে দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করেছিলাম তাঁর একজন হলেন তাকেতোরা ওগাতা। জাপানের তৎকালীন সহকারী প্রধান মন্ত্রী এবং অপর কাৎসুখো ওকাজাকী—বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী। প্রথম ভদ্রলোকের জাপানের রাজনীতি ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান বলে সুনাম আছে। পূর্বে তিনি ছিলেন সংবাদপত্রের মালিক। ভারতবর্ষেও বেড়াতে এসেছিলেন। দ্বিতীয় ভদ্রলোক ওকাজাকী ত্রিশ বৎসর ধরে কূটনৈতিক পদে বহাল থাকবার পর বর্তমানে সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত আছেন। ওকাজাকী একদা কলকাতায় জাপানের বাণিজ্যদূত ছিলেন। আমাদের সঙ্গে আলাপের সময় এই বিষয় উল্লেখ করে বললেন যে "আপনারা যখন দেশ ভাগ করে ছাড়াছাড়ি হননি, তখন আমি আপনাদের দেশে ছিলাম।"

জাপানী রাজনীতি আলোচনা অথবা জাপানের রাজনৈতিক নেতাদের পরিচয় দেবার পূর্বে ওকাজাকীর সঙ্গে আমাদের যে

আলোচনা হয়েছিল সেই বিষয়টি পাড়তে চাই। কারণ তিনি এমন একটি মৌলিক বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন যার একটু আলোচনা করলে জাপানের পররাষ্ট্রনীতি এবং যে নীতি পরে জাপানের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী হাতোয়ামা থেকে বর্তমান প্রধান মন্ত্রী কিসি অনুসরণ করে আসছেন তা অনেকটা বুঝতে পারা যেতে পারে।

বন্ধুবর ওয়াগ্নে ওকাজাকীকে একটি বিশেষ প্রশ্ন করে তাঁর নিজের মতেরই অনুমোদন চাইলেন। তাঁর বক্তব্য হোল এই যে চীন ও সোভিয়েটের মধ্যে রক্ষামূলক চুক্তি সম্পন্ন হোল বলেই জাপান আমেরিকার সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছিল। সিনো-সোভিয়েট (Sino-Soviet) চুক্তি না হোলে, প্রশ্নকারী মনে করেন, জাপান তার বর্তমান শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যুদ্ধ-পরিহার সম্পর্কিত ধারায় অটল থাকত এবং দেশরক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে জাতি-সংঘের উপর ছেড়ে দিয়ে হয়ত নিশ্চিন্ত হতে পারত।

প্রশ্নটি ধীর ভাবে শুনে ওকাজাকী বললেন, "সমস্যাটি অত সোজা হোল, বাঁচতাম! জাপান যদি চীন-সোভিয়েট চুক্তি নিয়ে অভিযোগ করে, তা হোলে অপর পক্ষও জাপান-আমেরিকার চুক্তির বিষয়ে অভিযোগ করতে পারে। কথা হচ্ছে যে চুক্তিটাই বড় কথা নয়, আসল বিষয় হোল চুক্তির পশ্চাতের ধ্যানধারণা, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া। চুক্তি কোন আদর্শবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাতে পরস্পরের মনে সন্দেহ জাগবার কোনও কারণ আছে কি না?"

উত্তরটি দেবার পর ওকাজাকী কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে নিরুত্তর থেকে ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহরুর "নির্ভীক সহ-অবস্থান নীতি"র উল্লেখ করে বললেন যে বর্তমান জগতে এবং বাস্তব দৃষ্টিতে পুরনো 'ভারসাম্য নীতি' (balance of power) গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন মতেই শান্তি বজায় রাখা যায় না বলেই তিনি মনে করেন এবং সেই হেতুই নেহরু-নীতি ও আদর্শ গ্রহণযোগ্য

ও কার্য্যকরী বলে মনে করেন না। তিনি এও জানিয়েছিলেন যে এই ভারসাম্য নীতির যদি কোন রকম বিচ্যুতি কোথায় ঘটে তা হোলে শান্তি অবশ্যম্ভাবী বিপন্ন হয়ে ওঠে।

ওকাজাকীর পররাষ্ট্রনীতির এই প্রকার সরল ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার পর যুদ্ধোত্তর জাপান কি চায় সে বিষয়ে গবেষণা করবার বিশেষ অবকাশ থাকে না। ওঁর সঙ্গে অন্যান্য যে আলোচনা হয়েছিল সেই সম্পর্কে কিছু বলবার পূর্বে জাপান বনাম প্রশান্ত মহাসাগরীয় গোষ্ঠীর এই ভারসাম্য নীতির অতীত ইতিহাস একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

সুদূর প্রাচ্যে ভার-সাম্যনীতির সূচনাকাল ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকান কমোডোর ম্যাথু পেরীর জাপানে আসবার ১৪ বছর আগে থেকে ধরা যায়। তখন বৃটেন ভারতে রাজত্ব কায়েম করে চীনের উপর থাবা বিস্তারে সবে মাত্র মন দিয়েছে। সে জন্য একটি ছোট সৈন্যদলও পাঠান হয় এবং অচিরে এর সুফলও ফললো। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে চীনেরা এক কোটি কুড়ি লক্ষ ডলার খেসারত দিয়ে ইংরেজের সঙ্গে নানকিং-এর (Treaty of Nanking) সন্ধি করতে বাধ্য হোল। এ সন্ধিতে ইংরেজ বণিক বিনা বাধায় চীনে আফিং রপ্তানী করবার সুবিধা পেল।

ব্রিটেনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ফরাসী, আমেরিকা ও জার্মেনী পর পর চীনের রঙ্গমঞ্চে শীঘ্রই দেখা দেয়। চীনের পক্ষে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ হয়ে পড়ল বিশেষ স্মরণীয় বছর। সেদিন এই সব বিদেশী শক্তিধরেরা স্বদেশীয় মিশনারি ও বণিকদের—যারা চীনেদের পারত্রিক মুক্তির জন্য ধর্ম-প্রচার অথবা ঐহিক সুবিধার জন্য ব্যবসা খুলে চীন জুড়ে বসেছিল—রক্ষা কল্পে চৈনিক মতামতের কোনো তোয়াক্কা না রেখেই চীন ভূখণ্ডে দূতাবাস প্রতিষ্ঠা করে ফেল্‌ল। টিএনট্‌সিন চুক্তি (Tientsin Treaties of 1858) এবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ইংরেজ-ফরাসী অভিযানে (Anglo-French March to Peking)

আলোচনা হয়েছিল সেই বিষয়টি পাড়তে চাই। কারণ তিনি এমন একটি মৌলিক বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন যার একটু আলোচনা করলে জাপানের পররাষ্ট্রনীতি এবং যে নীতি পরে জাপানের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী হাতোয়ামা থেকে বর্তমান প্রধান মন্ত্রী কিসি অনুসরণ করে আসছেন তা অনেকটা বুঝতে পারা যেতে পারে।

বন্ধুবর ওয়াগ্নে ওকাজাকীকে একটি বিশেষ প্রশ্ন করে তাঁর নিজের মতেরই অনুমোদন চাইলেন। তাঁর বক্তব্য হোল এই যে চীন ও সোভিয়েটের মধ্যে রক্ষামূলক চুক্তি সম্পন্ন হোল বলেই জাপান আমেরিকার সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছিল। সিনো-সোভিয়েট (Sino-Soviet) চুক্তি না হোলে, প্রশ্নকারী মনে করেন, জাপান তার বর্তমান শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যুদ্ধ-পরিহার সম্পর্কিত ধারায় অটল থাকত এবং দেশরক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে জাতি-সংঘের উপর ছেড়ে দিয়ে হয়ত নিশ্চিন্ত হতে পারত।

প্রশ্নটি ধীর ভাবে শুনে ওকাজাকী বললেন, "সমস্যাটি অত সোজা হোল, বাঁচতাম! জাপান যদি চীন-সোভিয়েট চুক্তি নিয়ে অভিযোগ করে, তা হোলে অপর পক্ষও জাপান-আমেরিকার চুক্তির বিষয়ে অভিযোগ করতে পারে। কথা হচ্ছে যে চুক্তিটাই বড় কথা নয়, আসল বিষয় হোল চুক্তির পশ্চাতের ধ্যানধারণা, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া। চুক্তি কোন আদর্শবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাতে পরস্পরের মনে সন্দেহ জাগবার কোনও কারণ আছে কি না?"

উত্তরটি দেবার পর ওকাজাকী কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে নিরুত্তর থেকে ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহরুর "নির্ভীক সহ-অবস্থান নীতি"র উল্লেখ করে বললেন যে বর্তমান জগতে এবং বাস্তব দৃষ্টিতে পুরনো 'ভারসাম্য নীতি' (balance of power) গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন মতেই শান্তি বজায় রাখা যায় না বলেই তিনি মনে করেন এবং সেই হেতুই নেহরু-নীতি ও আদর্শ গ্রহণযোগ্য

ও কার্য্যকরী বলে মনে করেন না। তিনি এও জানিয়েছিলেন যে এই ভারসাম্য নীতির যদি কোন রকম বিচ্যুতি কোথায় ঘটে তা হোলে শান্তি অবশ্যম্ভাবী বিপন্ন হয়ে ওঠে।

ওকাজাকীর পররাষ্ট্রনীতির এই প্রকার সরল ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার পর যুদ্ধোত্তর জাপান কি চায় সে বিষয়ে গবেষণা করবার বিশেষ অবকাশ থাকে না। ওঁর সঙ্গে অন্যান্য যে আলোচনা হয়েছিল সেই সম্পর্কে কিছু বলবার পূর্বে জাপান বনাম প্রশান্ত মহাসাগরীয় গোষ্ঠীর এই ভারসাম্য নীতির অতীত ইতিহাস একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

সুদূর প্রাচ্যে ভার-সাম্যনীতির সূচনাকাল ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকান কমোডোর ম্যাথু পেরীর জাপানে আসবার ১৪ বছর আগে থেকে ধরা যায়। তখন বৃটেন ভারতে রাজত্ব কায়েম করে চীনের উপর থাবা বিস্তারে সবে মাত্র মন দিয়েছে। সে জন্য একটি ছোট সৈন্যদলও পাঠান হয় এবং অচিরে এর সুফলও ফললো। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে চীনেরা এক কোটি কুড়ি লক্ষ ডলার খেসারত দিয়ে ইংরেজের সঙ্গে নানকিং-এর (Treaty of Nanking) সন্ধি করতে বাধ্য হোল। এ সন্ধিতে ইংরেজ বণিক বিনা বাধায় চীনে আফিং রপ্তানী করবার সুবিধা পেল।

ব্রিটেনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ফরাসী, আমেরিকা ও জার্মেনী পর পর চীনের রঙ্গমঞ্চে শীঘ্রই দেখা দেয়। চীনের পক্ষে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ হয়ে পড়ল বিশেষ স্মরণীয় বছর। সেদিন এই সব বিদেশী শক্তিধরেরা স্বদেশীয় মিশনারি ও বণিকদের—যারা চীনেদের পারত্রিক মুক্তির জন্য ধর্ম-প্রচার অথবা ঐহিক সুবিধার জন্য ব্যবসা খুলে চীন জুড়ে বসেছিল—রক্ষা কল্পে চৈনিক মতামতের কোনো তোয়াক্কা না রেখেই চীন ভূখণ্ডে দূতাবাস প্রতিষ্ঠা করে ফেল্‌ল। টিএনট্‌সিন চুক্তি (Tientsin Treaties of 1858) এবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ইংরেজ-ফরাসী অভিযানে (Anglo-French March to Peking)

চীন হয়ে পড়ল এক মগের মুল্লুক, বাঁশ গাড়ি করে দখল করলেই সত্ব হতে।

জাপানেও এসব পশ্চিমী শক্তির চাপ নানা প্রকার পরিবর্তন নিয়ে আসে। সম্রাট তখন ছিলেন নেপালের রাজার মত নজরবন্দী জাপানী রাণাদের কাছে। এদের উপাধি ছিল শোগান (Shogun)। চারদিকে পশ্চিমীদের আনাগোনা দেখে এবং তাদের ঠেকাতে অসমর্থ হোয়ে শোগানদের একদল ঠিক করে ফেল্‌ল যে সম্রাটকে পুরোধায় রেখে গোটা দেশটাকে সংঘবদ্ধ না করতে পারলে "বর্বরদের" হাত থেকে নিস্তার নেই।

জাপানের মেইজী-যুগ (১৮৬৮-১৯১২ খৃষ্টাব্দ) এমনিভাবে শুরু হোল এবং সূচনা করল এশিয়ার এক নতুন অধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথ সে যুগের উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন ঃ

"এশিয়ার মধ্যে জাপানই এই কথাটি একদিন হঠাৎ অনুভব করলে যে, য়ুরোপ যে শক্তিতে পৃথিবীতে সর্বজয়ী হয়ে উঠেছে একমাত্র সেই শক্তির দ্বারাই তাকে ঠেকানো যায়। নইলে তার চাকার নীচে পড়তেই হবে এবং একবার পড়লে কোনো কালে আর ওঠবার উপায় থাকবে না।"

এই কথাটি যেমনি তার মাথায় ঢুকলো অমনি সে আর মুহূর্ত দেরি করলে না। কয়েক বৎসরের মধ্যেই য়ুরোপের শক্তিকে আত্মসাৎ করে নিলে। য়ুরোপের কামান-বন্দুক কুচ্‌কাওয়াজ কল-কারখানা আপিস-আদালত আইন-কানুন যেন কোন্ আলাদিনের প্রদীপের জাদুতে পশ্চিমলোক থেকে পূর্বলোকে একেবারে এনে বসিয়ে দিলে।" [জাপান যাত্রী, পৃষ্ঠা ১০৫]

দেশ-জোড়া এ ভাঙ্গা-গড়ার বিরাট দায়িত্ব গিয়ে পড়ল মাত্র অল্লাধিক একশত সামুরাই-গোষ্ঠীভুক্ত মেইজী-যুগের নব্য যুবক নেতাদের উপর। নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পুরনো শোগান-ধৃত শাসন-ব্যবস্থা একান্তভাবে ছিল অক্ষম। কিয়োটোর শোগান-নায়ক সে অবস্থা জেনে গদি ছেড়ে দিলেন। ১৫ বছরের কিশোর বালক সম্রাট মুৎসুহিতো (Mutsuhito) যিনি মেইজী (Meiji) নামে দেশে-বিদেশে সুপরিচিত তিনি গদি ফিরে পেলেন

এবং তাঁর সিংহাসনের পাশে এসে দাঁড়াল এইসব মেইজী-যুগ প্রবর্তকেরা। তাঁরা ঠিক করলেন দেশের স্বাধীনতা যাতে এসব পশ্চিমী শক্তিদের দ্বারা কোনও প্রকারে ক্ষুণ্ণ না হয় তার জন্যে, যেমন করেই হোক, জাপানকে সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য আদর্শে গড়ে তুলতে হবে।

কিয়োটো থেকে রাজধানী এল টোকিওতে, ওসাকা আর কোবে হোল বৈদেশিক বাণিজ্য-বন্দর, প্রথম রেল-গাড়ী চলল রাজধানী থেকে ইয়োকোহামায় (১৮৭২ খৃষ্টাব্দে), জাপানী পঞ্জিকা হোল সংস্কৃত, নতুন ফৌজদারী আইন হোল প্রবর্তিত এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরনো বিধি ব্যবস্থা ছেড়ে ফেলে দিয়ে গড়ে তোলা হোল পশ্চিমী ধরণের পোস্টাল, সিভিল ও বাণিজ্য সারভিস। সর্বোপরি সামরিক শিক্ষা-রীতি ভেঙে সাজান হোল জার্মেন আদর্শে (১৮৭২-৭৫ খৃষ্টাব্দে)। অশিক্ষিত চাষী ফৌজ নিয়ে আধুনিক রাষ্ট্র চালনা বিড়ম্বনা-মাত্র বুঝে মেইজী যুগের জাপান গ্রহণ করল আপামর শিক্ষা-ব্যবস্থা। মিনিস্ট্রি অফ এডুকেসন গড়া হোল (১৮৭১ খৃষ্টাব্দে)। টোকিও বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হোল (১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে)। জাপান হোল এশিয়ার একমাত্র দেশ—ইয়োরোপও তুলনার বাইরে যায়না—যেখানে সেই মেইজী-যুগ থেকে চাষী সৈন্যকে "ঘাস-বিচালী" বোলে কুচ-কাওয়াজ শেখবার প্রয়োজন হয়নি।

বছরগুলো লক্ষ্যণীয়। মেইজী-যুগের নেতারা মাত্র ১০ বছরে দেশটার কাঠামো দিলেন বদলে। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ এসব সংস্কারে জাপানের পূর্বে হাত দিলেও এখন পর্যন্ত তার কাছে গিয়ে পৌছতে পারেনি।

মেইজী পূর্ব-যুগের বিখ্যাত সামুরাই-নেতা ইতো নিজে গেলেন ইয়োরোপে রাজ্য আর শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা নীতি দেখতে আর বুঝতে। জাপানী ছাত্রের দল ছুটল ফ্রান্সে আইনজ্ঞ হোতে, ইংলণ্ডে নৌবিদ্যা আয়ত্ব করতে, আমেরিকায় পশ্চিমী-ব্যবসা রীতি-

নীতির সঙ্গে পরিচিত হতে। তখন ইয়োরোপে বিসমার্ক জার্মেন সাম্রাজ্য গড়ে তুলছেন। ঘরে বিসমার্কের হাতে পড়ে শতধা বিভক্ত জার্মেন রাজ্যগুলো হয়ে পড়ল সংঘবদ্ধ জার্মেন রাষ্ট্র। সে রাষ্ট্রের সামনে ডেনমার্ক, অষ্ট্রিয়ার হাবসবুর্গেরা ও ফরাসী টিকে থাকতে পারল না। ইতো গ্রহণ করলেন জার্মেন আদর্শ এবং সেই আদর্শেই জাপানে চালু করলেন আপামর সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা আর শাসন-পরিচালনা নীতি। ফরাসী কুচ-কাওয়াজ চালু করবার সমস্ত আয়োজন তখন হয়ে গেছে যখন খবর আসল ফ্রাঙ্কো-জার্মেন যুদ্ধে ফরাসীর পরাজয় (১৮৭১ খৃষ্টাব্দে)। অমনি জাপান ছেড়ে দিল ফরাসী-ব্যবস্থা আর গ্রহণ করল জার্মেন আদর্শ।

কিন্তু ছাব্বিশ বছর ধরে এত সব কিছু করেও জাপান বাইরের সঙ্গে অস্ত্রের কোনো পরীক্ষায় এগুতে সাহসী হয়নি। সামুরাইদের কেউ কেউ জাপানকে ও-বৃত্তিতে হাত পাকাতে উপদেশ দিলেও মেইজী-নেতারা ঘরের সংস্কারেই লেগে পড়ে থাকলেন। জাপানীদের এভাবে সংস্কার কাজে উঠে পড়া দেখে পশ্চিমীদের মধ্যেও কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দিল না।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বাইরে দেখা দিল প্রথম চাঞ্চল্য। সেদিনকার সর্বশ্রেষ্ঠ পশ্চিমা ব্রিটেন নিজ থেকে এগিয়ে এসে প্রস্তাব করল যে জাপানের মাটিতে অন্যান্য পশ্চিমী-শক্তির মত সে যে অতি আঞ্চলিক অধিকারগুলো (Extra-territorial rights) ভোগ করে আসছিল তা ছেড়ে দেবে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ থেকে। (Aoki-Kimberley treaty to abolish British extra-territoriality of 1899)। ব্রিটেনের এ সুমতির কারণ বুঝতে হলে সেদিনকার এশিয়ার মানচিত্রের দিকে তাকাতে হয়। রুষ-সম্রাট জারের পারশ্য, আফগানিস্তান, তিব্বত এবং চীন ও মাঞ্চুরিয়াতে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা দেখে ব্রিটেন তখন উদ্বিগ্ন। জাপানের এ নব অভ্যুদয়ে ব্রিটেন যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারল। মেইজী-যুগের নেতাদের

সঙ্গে চলল তার সলা-পরামর্শ। জাপানকে সম্ভাষণ জানাল ব্রিটেন নৌবহর ধার দিয়ে।

*সুদূর প্রাচ্যে দেখা দিল পশ্চিমী শক্তিদের স্রষ্ট ভার-সাম্য-নীতির এক সত্যিকারের রূপ। ইংরেজ-জাপানী মিতালী দানা-*বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হোল চীনের উপরা জাপানী আক্রমণ। চীনের হোল পরাজয়। জাপানের অধিকার স্বীকৃতি পেল পশ্চিমী দরবারে। শিমোনয়াস্কী (Treaty of Shimonoeski, 1895) চুক্তির ফলে মাঞ্চুরিয়ার লিয়াওটুং (Liaotung) উপদ্বীপ, ফরমোজা আর তার পার্শ্ববর্তি পেসকাডরস্ (Pescadores) দ্বীপ চীন জাপানকে ছেড়ে দিয়ে করল সন্ধি এবং খেসারত বাবদ জাপানকে দিল ৩৫০,০০০,০০০ ইয়েন। পর রাজ্য অধিকার ও যুদ্ধ বিজয়ের ফলে জাপানের এই প্রথম ঘরে উঠল চীন থেকে লুঠ করা লক্ষ্মী আর তার সাহায্যে জাপান গড়ে তুলল মেইজী-সমর্থক সামুরাই বংশীয় নতুন জায়বাত্‌সু শিল্পপতি গোষ্ঠী।

বলাই বাহুল্য জাপানের বিজয়ে ব্রিটেন বিশেষ ভাবে হোল খুশী। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে মারমুখো জাপানের সঙ্গে ব্রিটেনের মিত্রতা বিশেষ প্রীতির দৃষ্টিতে দেখল না রাশিয়া ও তার বন্ধু ফরাসী। এশিয়ার পূর্ব উপকূলে হোঁচট খেয়ে রাশিয়া যদি ইয়োরোপের দিকে দৃষ্টি দেয় এই কল্পনায় বিচলিত হোল জার্মেনীও। ফরাসী, জার্মেনী, রাশিয়া তখন একজোট হয়ে জাপানকে চীনের জায়গা ফিরিয়ে দিতে দিল চাপ। সে চাপ অসহনীয় হয়ে ওঠাতে সেদিন জাপানকে জয়-মাল্য স্বরূপ পাওয়া এ জায়গাগুলো চীনকে প্রত্যর্পণ করতে হোল নিতান্ত অনিচ্ছায়। তবে সে ক্ষতি পুরণ হিসেবে চীনের কাছ থেকে আরও মোটা অর্থ আদায় করে তবে ছাড়ল। এ অর্থও জাপান নিয়োগ করল তার ব্যবসা বাণিজ্যে। জাপানী-গ্রাসমুক্ত এলাকাগুলো কিন্তু চীন ভোগ করতে পারল না। যাঁরা রক্ষক হয়ে জাপানের কাছ থেকে এলাকাগুলো চীনকে প্রত্যর্পণ

করার মূলে ছিল তারাই কিছু দিনের মধ্যে আবার ভক্ষক রূপে দেখা দিল। যারা সবচেয়ে চড়া গলায় প্রতিবাদ জানিয়েছিল তারা নিজেরাই এই জায়গাগুলো ভাগ করে নিল।

ব্রিটেন কিন্তু খুব হুঁশিয়ার। তার দৃষ্টি সুদূর প্রসারিত। এসব ব্যাপার প্রথম থেকেই সে দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিল। যখন রাশিয়া, ফরাসী আর জার্মেনী জাপানের ফিরিয়ে দেওয়া চীনের এলাকাগুলো নিজেরা গ্রাস করতে ব্যস্ত তখন ব্রিটেন সবচেয়ে বড় সুযোগ পেল ক্রুদ্ধ জাপানকে তার নিজের বন্ধু বলে গ্রহণ করতে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ইংরেজ-জাপানী চুক্তি (Anglo-Japanese Alliance, 1902) মূলতঃ প্রতিরক্ষা চুক্তি। সে চুক্তির বলে জাপানের শুধু যে মর্যাদাই বাড়ল তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে সে ব্রিটেনের কাছ থেকে এই আশ্বাস পেল যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় তাকে কেউ একতরফা বিরক্ত করতে পারবে না।

সে সময়ের আন্তর্জ্জাতিক অবস্থায় এই ভার-সাম্য চুক্তিকে জাপান এবং ইংরেজ উভয়েই সাদর সম্বর্দ্ধনা জানাল। জার্মেনীর ক্রমবর্দ্ধমান নৌশক্তির জন্যে ইংরেজ ইয়োরোপীয় এলাকায় বিশেষ উদ্বেগ বোধ করে আসছিল। এশিয়াতে রাশিয়ার উপর দৃষ্টি রাখতে এবং প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের খবরদারী করবার দায়িত্ব জাপানের উপর রাখতে পেরে ব্রিটেন হোল কতকটা নিশ্চিন্ত। জাপানও বুঝতে পারল অতঃপর যদি এই অঞ্চলে কোন সংঘর্ষ বেধে ওঠে তা হোলে সে অবাধ গতিতে তার রথচক্র চালাতে পারবে এবং তার যোগান দেবে তখনকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি ব্রিটেন। এই ভার-সাম্য চুক্তির প্রত্যক্ষ ফল হোল রুশ-জাপান যুদ্ধ। সে যুদ্ধ আসতে একটুও দেরী হোল না। ইঙ্গ-জাপানী সন্ধির দুই বছরের মধ্যেই বেধে উঠল। মিত্রতার সূত্রে আবদ্ধ ব্রিটেন সে যুদ্ধে জাপানকে আগাম ধারে নৌবহর নির্ম্মানে এবং অন্যান্যভাবে বেশ সাহায্য করেছিল। রাশিয়া হোল যুদ্ধে পরাজিত। ফলে গোটা পৃথিবী

চমকে উঠল জাপানের অভ্যুদয়ে—বিশেষ করে এশিয়াতে এল এক অভূতপূর্ব্ব আলোড়ন—ভারতবর্ষ থেকে তুরস্ক পর্য্যন্ত।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ফিলিপাইন কেড়ে নেবার পর সুদূর প্রাচ্যের সমস্যায় আমেরিকা নিজেকে জড়িয়ে রাখল। তা ছাড়া বক্সার বিদ্রোহে (১৯০০ খৃষ্টাব্দে) যে আন্তর্জাতিক বাহিনী পিকিং অভিযানে যোগদান করে, (Boxer Expedition) তার মধ্যে যে আমেরিকান সৈন্যদল ছিল সেটা কোন দৈব ঘটনা নয়। আমেরিকান প্রেসিডেণ্ট থিওডোর রুজভেল্ট জাপানের অপ্রত্যাশিত অভ্যুদয়ে ও সঙ্গে সঙ্গে জাপানের কাছে ইয়োরোপীয় শক্তি রাশিয়ার পরাজয়ে পৃথিবীর ভার-সাম্যে বৈষম্য ঘটতে পারে এই আশংকায় রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে এলেন। আমেরিকার পোর্টসমাউথ শহরে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের বৈঠকে শান্তি স্থাপিত হোল (Treaty of Portsmouth, 1905)। জাপান রাশিয়ার কাছ থেকে যুদ্ধ খেসারত বাবদ যে ২০০,০০০,০০০ ইয়েন পেল তা দেশের শিল্প বাণিজ্য বিস্তারে নিয়োগ করে আরও শিল্পোন্নতি করতে সক্ষম হোল।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকা শান্ত থাকল বটে কিন্তু এ্যাটলাণ্টিক এলাকার ভার-সাম্য চলে গেল, যার ফলে ন' বছর পরে ঠিক এমনি এক আগষ্ট মাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে উঠল। এ ন' বছর ইংরেজ ও জাপানের মিত্রতার চুক্তি কিন্তু ভালভাবেই চলল। জাপানের মুখ চেয়ে ব্রিটেন পূর্ব এশিয়ার সমস্ত দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত। জাপানও চীন এবং রাশিয়ার চাপ থেকে বেরিয়ে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে নিঃশব্দে ও বিনা বাধায় গোটা কোরিয়াকে হজম করে ফেলল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪ খৃষ্টাব্দে) জাপান তার নিজস্ব শিল্প ও বাণিজ্য প্রসার করবার অভূতপূর্ব সুযোগ পেল এবং সে সুযোগ কাজেও লাগাল। ইয়োরোপে মিত্র শক্তি গোষ্ঠী যুদ্ধে ব্যস্ত আর জাপান শিল্প সম্ভার দিয়ে তাদের প্রচুর সাহায্য করে

সঙ্গে সঙ্গে এশিয়ার নানা ভূখণ্ডে খুলল তার লেন দেন কারবার। এমন সুযোগ সে বৈদেশিক বাণিজ্যে কোনো দিন পায়নি; প্রথম বিশ্ব যুদ্ধটা যেন জাপানের সুবিধার জন্যেই বেধেছিল। জাপানের জাতীয় সম্পদ সাতগুণ ফাঁপল। জাপান অবশ্য তার বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। এমনকি জার্মেনীর এমডেন ডুবো জাহাজটি যখন বঙ্গোপসাগরে এসেছে এবং মাদ্রাজ ও ডায়মণ্ড হারবারের স্থানে স্থানে হানা দিয়ে চলেছে, সেই সময়ে যুদ্ধ জাহাজ পাঠিয়ে জাপান ইংরেজকে নিশ্চিন্ত করে।

১৯১৯ সালে ভার্সাইতে যে শান্তি বৈঠক বসে তাতে বৃহৎ পঞ্চশক্তির অন্যতম শক্তি হিসেবে জাপান পেল আসন। জাপানের শক্তি ও প্রতিপত্তি তখন পৃথিবীর সবদেশই, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, মানতে শুরু করেছে। প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় জার্মেনীর যে সব উপনিবেশ ছিল সেগুলো জাপান ও ইংরেজ অধ্যুষিত অষ্ট্রেলিয়া নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল।

জাপানী ক্যালেণ্ডারে ১৯২২ সাল আবার হয়ে পড়ল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় জাপানের এই উত্থান ও ক্রমবর্ধমান প্রসার আমেরিকাকে বিশেষভাবে শংকিত করে তুলল। জাপানকে না ঠেকাতে পারলে আবার ভার-সাম্য নীতি বানচাল হয়ে যায় এই আশংকায় আমেরিকা বিটেনকে এই হুমকি দিয়ে হুসিয়ার করে দিল যে ব্রিটেন যদি আয়ারল্যাণ্ডে রিপাব্লিকান বিদ্রোহীদের শক্তিবৃদ্ধি দেখতে না চায় তা হোলে ব্রিটেনকে জাপানের সঙ্গে চুক্তি খতম করতে হবে। সেই যুদ্ধোত্তর সন্ধিক্ষণে ও ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করে অক্ষম ব্রিটেনের পক্ষে আমেরিকার এই দাবী না মেনে নেওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না। যে ভারসাম্য চুক্তি একদা ব্রিটেন নিজেই করেছিল শতাব্দীর গোড়ায় প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় তার তাঁবেদারী রক্ষা হেতু তা নতুন পরিপ্রেক্ষিতে হোল অগ্রাহ্য।

ওয়াশিংটনে নৌ-সম্মেলন বসল (১৯২২ খৃষ্টাব্দে)। জাপানের নৌ-বহর বাড়ানর প্রচেষ্টা থামাতে আমেরিকা প্রস্তাব করল অতপর ৫-৫-৩ অনুপাতে আমেরিকা, ব্রিটেন ও জাপানের নৌ-বহরের হার নির্দ্দিষ্ট হবে। এ প্রস্তাব গ্রহণ না করে কোনো উপায়ই ছিল না, তাই নিতান্ত অনিচ্ছায় জাপানকে আমেরিকার হুকুম মেনে নিতে হোল। খুব অল্পদিনের মধ্যেই আমেরিকা তার মুখোস খুলে যে "ভদ্রলোকনীতি" (Gentleman's agreement) অনুসারে সে বছরে বছরে কিছু সংখ্যক জাপানীকে আমেরিকাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে দিয়ে আসছিল, তা বাতিল করে দেয়। পৃথিবীর বৃহৎ শক্তির খাতা থেকে জাপানের নাম কেটে দেওয়া হোল এবং সে যে এশিয়ার অন্য যে কোন জাতের সঙ্গে সম-গোত্রীয়, আধুনিক সব কিছু থাকা সত্ত্বেও, সেটা আমেরিকা আরও ছোট বড় অনেক ঘটনার সাহায্যে জাপানকে বুঝিয়ে দিতে একটুও দেরী করল না।

হঠাৎ কৌলিন্য হারিয়ে জাপান পৃথিবীটাকে অন্যচোখে দেখতে শুরু করল জাপানের ঘরে ঘরে তখন কানাঘুসো আরম্ভ হয়েছে, যে পাতলা উদারনীতির ক্ষীণ ধারা জাপানী রাজনীতিতে দেখা দিয়েছিল তা এই গরম আবহাওয়ায় বাষ্পাকারে উড়ে যেতে লাগল। জাপানী যুদ্ধবাজরা বুঝল ইয়োরোপের সঙ্গে পাল্লা দিতে হোলে বন্দুক কামানের উপরই নির্ভর করা ভিন্ন গত্যন্তর নেই। জাপানী প্রতিক্রিয়া নানাদিকে নানাভাবে শুরু হোল। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিতে ওলোট-পালট দেখা দিল। জাপান ইয়োরোপ ও আমেরিকার দিকে না তাকিয়ে নিজেই নিজের বেছে নেওয়া পথে দৃঢ় পদক্ষেপে চলতে মনস্থ করল।

ভার-সাম্যের এই অধ্যায়টি জাপানের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জাপান তখন মাঞ্চুরিয়ায় অভিযান আরম্ভ করে দিয়েছে (১৯৩১ খৃষ্টাব্দে)। ব্রিটেন ও আমেরিকা প্রতিবাদ জানাল সত্যি, কিন্তু তা যেন জলো। জাপান তাতে তোয়াক্কা করল না। সত্যি কথা

বলতে কি, যখন ব্রিটেন জেনেভাতে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে আলাপ আলোচনা চালাচ্ছে ঠিক সেই সময় মাঞ্চুরিয়াতে এবং সাংহাইতে জাপানী কামানের আওয়াজ কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে। আমাদের বন্ধু এল, এফ, আমেরী সাহেব কিন্তু তখনও জাপানের পক্ষে কোন অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করতে পারলেন না। তিনি সেই সময় ব্রিটেনের পার্লামেণ্টে দাঁড়িয়ে যা বললেন তা এত পরিষ্কার যে চার্চ্চিলের ভারত সম্পর্কে উক্তির থেকেও বেশী ঐতিহাসিক এবং স্মরণীয়। আমেরী বললেন, "আমরা যদি জাপানের কাজের নিন্দা করি তা হোলে ভারত ও মিশর সম্পর্কে আমাদের নীতির চরম নিন্দাই করা হয়।" জাপানের মাঞ্চুরিয়া অভিযানে কোন অসঙ্গতিই তিনি দেখেননি। আমেরী সাহেব জাপানের কাজের যে প্রশংসাই করুন না কেন জাপানের এই অভিযান জেনেভায় বিধি বহির্ভূত বলেই ঘোষিত হোল। ক্রুদ্ধ জাপানী ডেলিগেট, ইস্যুকি মাত্‌সুয়োকা (Yosuke Matsuoka) লিগ অফ নেসনের কাউনসিল কক্ষ হতে ফাইল বগল-দাবা করে বেরিয়ে গেলেন। (১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে)। লিগের হোল অপঘাত মৃত্যু। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিষবৃক্ষ হোল পত্তন।

হতাশায় জাপান ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে হিটলারের জার্মেনীর সঙ্গে কমিউনিষ্ট বিরোধী চুক্তি করে এবং শীঘ্রই ওদের দলে ভীড়ে পড়ল ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে। জাপান একটা না একটা "ভার-সাম্য" চুক্তি ছাড়া বেঁচে থাকতেই পারে না।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় ভার-সাম্যের অতীত কথা একটা বিচ্ছিন্ন আঞ্চলিক ব্যাপার নয়; পশ্চিমী অঞ্চলেও এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। ক্ষমতা-দ্বন্দ্বের চাকা অবিরাম গতিতেই ঘোরে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে জাপান এই দ্বন্দ্বের হাত থেকে পরিত্রাণ চাইলে হয়ত বা পেতো। কিন্তু জাপান এটা চায়নি বা চেয়েও পারেনি। ওকাজাকীর বক্তব্য থেকে আমাদের সে ধারণাটা বেশ সুস্পষ্ট হোল।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী যখন ভার-সাম্যনীতি বুঝিয়ে দিচ্ছেন তখন আমরা এই নীতির আর্থিক দিকটা তুলে ধরলাম। বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই ওকাজাকী জানিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন যে ভার-সাম্যনীতিই পৃথিবীতে শান্তি রাখতে পারে এবং এ নীতি অনুসরণ করতে জাপানের সাম্রাজ্য বা উপনিবেশ ফিরে পাবার জন্যে অথবা কাঁচা মালের সস্তা বাজারের জন্যে অনুন্নত দেশগুলোকে কবজির মধ্যে পেতে আদৌ দরকার হবে না। ভার-সাম্যনীতির সঙ্গে জাপানের পক্ষে সহজ ও সরল বৈদেশিক সম্পর্ক রাখার কোনই বিরোধ থাকতে পারে না—বললেন তিনি।

ওয়াগ্‌লে মন্ত্রীকে তখন জিজ্ঞাসা করলেন যে জাপানের বৈদেশিক মন্ত্রি-দপ্তর থেকে ভারতবর্ষের গোয়া সম্পর্কে যে বিবৃতিটা দেওয়া হয়েছিল তা কি স্মরণ করতে পারেন? সে বিবৃতিটা ছিল অতি ক্ষুদ্র এবং নানাদেশে এমন কি ভারতবর্ষেও প্রচারিত হয়েছিল। বৈদেশিক দপ্তর থেকে বিবৃতিটা অনাড়ম্বরভাবে ছাড়লেও প্রকাশের পরদিন জাপানের বিখ্যাত "আসাহী সিমবুন" পত্রিকাটী বিবৃতির মধ্যে লুকান উদ্দেশ্যটুকু স্পষ্ট করে খুলে দেয়। ব্যাপারটী হোল পর্ত্তুগাল এবং তার নিকটতম আত্মীয় ব্রেজিল এশিয়ার বিশিষ্ট শক্তি বলেই জাপানের উপর চাপ দিয়ে গোয়া সম্পর্কে ভারতের পক্ষে এই অসুবিধাকর বিবৃতিটী একপ্রকার আদায় করে নেয়। ব্রেজিলের ইচ্ছানুসারে জাপানকে এই অহেতুক বিবৃতি দিতে হয়; কারণ, দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিল হোল জাপানের একটা প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। বৈদেশিক দপ্তর ছোট্ট বিবৃতিটা ছেড়ে দিয়ে মনে করেছিল যে এর গূঢ় উদ্দেশ্যটুকু হয়ত ধরা পড়বে না। কিন্তু পরের দিনই খবরের কাগজে তা প্রকাশ হওয়াতে দপ্তরের কর্তৃপক্ষ বিব্রত হয়ে পড়েন। বিবৃতিটা এমন একটা দেশ সম্বন্ধে যার মন্দ কামনা অন্ততঃ জাপানের পক্ষে কোনো প্রকারে কাম্য হতে পারে না। ভারতবর্ষই হোল দক্ষিণ-পূর্ব

এশিয়ার একমাত্র দেশ যে স্বেচ্ছায় জাপানের কাছ থেকে যুদ্ধ-ক্ষতির দাবী প্রত্যাহার করে নিয়েছিল এবং এমন একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল যার ধারাগুলি সান-ফ্রানসিস্কোতে জাপান-আমেরিকা চুক্তি অপেক্ষা জাপানী সম্মানের পক্ষে অনেক সুসঙ্গত। কিন্তু বাণিজ্যের এবং জাপানীদের ব্রেজিলে বসবাস করবার সুযোগ লাভের আশায় জাপান ভারতবর্ষ সম্পর্কে সে বিব্রতকর বিবৃতি না দিয়ে থাকতে পারেনি। এ বিবৃতি অবশ্যই ভারতবর্ষের গোয়া-দাবী খানিকটা ব্যহত করেছিল, কারণ এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ, নিরপেক্ষ এবং বন্ধুত্ব ভাবাপন্ন জাপানও প্রকাশ্যে পর্ত্তুগালের স্বার্থ অটুট রাখবার পক্ষে। জগৎ সভায় জাপানী বিবৃতিটা ভারতবর্ষের দাবীর প্রতিকুলে গেল।

ওকাজাকী প্রশ্নের জবাবে স্বীকার করলেন যে জাপানকে ঐ বিবৃতিটী দিতে হয়েছিল অনেক কারণে এবং সোজাসুজি অনুরোধ জানালেন ঐ বিষয়টা উত্থাপন না করবার জন্যে। আমরা অবশ্যই আর কোনো প্রশ্ন করিনি। কিন্তু ভার-সাম্যনীতির যে কি পরিণাম তা বুঝতে পেরেছিলাম তাঁর ঐ অনুরোধ থেকেই। অতি ক্ষুদ্র পর্ত্তুগালই যদি জাপানের উপর এতটা চাপ দিতে পারে তবে অন্যে পরে কা কথা!

জাপানের সর্বাধিক প্রচারিত 'আসাহী সিম্বুন' পত্রের বন্ধুরা আমাদের আমন্ত্রন করলেন তাঁদের অফিস, প্রেস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান দেখবার জন্যে। জাপানের সংবাদ-পত্র প্রতিষ্ঠানগুলো যেমনি অতিকায় তাদের গড়ে তোলা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোও তেমনি বিস্তৃত। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকা ত আছেই, সেই সঙ্গে আছে ছেলেদের ও মেয়েদের পত্রিকা, খেলার ও রঙ্গ-জগতের পত্রিকা প্রভৃতি। সবগুলো একসঙ্গে হাতধরে চলেছে, যেমন চালে চলে জাপানী বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো জায়বাত্সু কর্মধারায়।

বন্ধুদের সঙ্গে অনেক বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা হোল। মনে

পড়ছে "আসাহী"-এর প্রধান সম্পাদককে একটা "ভুল" ধারণা ভাঙবার জন্যে অনুরোধ করেছিলাম। ধারণাটা পেয়ে বসেছিল সেদিন একটা অসামান্য ঘটনায়। চীনের প্রধান-মন্ত্রী ভারতবর্ষে প্রথম ভ্রমণে এসেছেন। ভারতীয় রাষ্ট্রপতি চৈনিক প্রধান মন্ত্রীকে এক ভোজ-সভায় আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। রাষ্ট্রপতির নিমন্ত্রন পত্র যথা সময়েই জাপানের তদানীন্তন রাষ্ট্র-দূতের নিকট গিয়ে পৌছল এবং তিনি তা গ্রহণও করলেন কিন্তু শেষ মুহূর্তে জাপানী রাষ্ট্রদূত সে ভোজ-সভায় আসেননি।

প্রধান সম্পাদককে ঐ ঘটনা উল্লেখ করে বলেছিলাম যে ভারতবর্ষের কোনো কোনো মহলে একটা ধারণা আছে যে জাপান এখনও স্বাধীন ভাবে চলা-ফেরা করতে পাচ্ছে না। সম্পাদক ঘটনাটা শুনে উত্তরে জানালেন বর্তমান জাপানের অসুবিধার কথা, জাপান কর্তৃক ফরমোজার চীনা সরকার স্বীকারের কথা এবং বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন যে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা থেকে কোনো প্রকার সিদ্ধান্তে আসা উচিত হবে না। ও ভাবে কোনো সিদ্ধান্তে আসা কেবলমাত্র কমিউনিষ্টদের একচেটে অধিকার আছে বলে তিনি মন্তব্য করলেন।

জাপানী বন্ধুদের কথা সেদিন গ্রহণ করতে একটুও কষ্ট হত না যদি না জাপান ও আমেরিকান ডিফেন্সের রূপ সম্পর্কে কোনো হক-কথার পরিচিতি না থাকত।

এশিয়ার বিভিন্ন রাজধানীগুলোর তুলনায় টোকিও এক বিষয়ে বিশেষ ভাগ্যবান। কারণ এখানে কেবল জাপান নয়, সমগ্র দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ অনেক বৈদেশিক সংবাদদাতা আছেন। কোন বেয়াড়া বা মৌসুমী হাওয়া এ অঞ্চলে বইলে তার স্বরূপ এবং ভবিষ্যৎ প্রকৃতি কি হতে পারে তা' এঁদের দৃষ্টি এড়াতে পারে না এবং তার বিশদ ব্যখ্যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অতি শীঘ্রই পৌঁছে দিয়ে থাকেন এঁরা।

বিখ্যাত আমেরিকান সংবাদপত্র ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটরের (Christian Science Monitor) সংবাদদাতার সঙ্গে টোকিও পৌঁছেই ভারতীয় দূতাবাসের জনৈক বন্ধুর এক পার্টিতে পরিচয় হোল। আলোচনা হোচ্ছিল প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকান পলিসি নিয়ে। তখন সবে ম্যাক-আর্থারী নীতির অবসান হয়েছে। তাই সেই নীতির উল্লেখ করে ভদ্রলোক জানালেন ম্যাক-আর্থারী নীতির জন্যে ঐ এলাকায় আমেরিকার সুনাম জলাঞ্জলি যেতে বসেছে। একটু বিরক্তির সঙ্গেই তিনি জানিয়ে দিলেন যেহেতু আমেরিকাকে কয়েক সহস্র কোটী ডলার ঢালতে হয়েছে এ অঞ্চলে এবং ছোট বড় সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে হয়েছে কেবল সে জন্যেই তাদের থাকতে হচ্ছে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ঐ এলাকায়।

প্রশ্ন করলাম ব্যাপারটা কি তিনি অতো সোজাই মনে করেন? তা ছাড়া কি?—জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। ফরেষ্ঠালের বিখ্যাত ডাইরী খানা সত্ত সত্ত পড়া ছিল তাই উদ্ধার করে সবিনয়ে জানালাম যে ম্যাক-আর্থার ফরেষ্ঠালকে বিশেষভাবে বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলেন আমেরিকার পক্ষে উচিত হবে মৃতপ্রায় ইয়োরোপের দেশগুলোকে ছেড়ে দিয়ে প্রাচীর উপর ভর করতে, কারণ ম্যাক-আর্থার মনে করেন এবং ফরেষ্টাল তা অনুমোদন করেই ডাইরীতে লিপিবদ্ধ করেছেন যে আগামী দশ-হাজার বছরের মানুষের ইতিহাস রচিত হতে চলেছে এই প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে।

ভদ্রলোকের সেদিন মনে পড়েছিল সেই ম্যাক-আর্থারী টীকা ও ভাষ্যের কথা এবং স্বীকার করলেন যে যদিও ম্যাক-আর্থারী নীতি তাঁর ধাতে অসহ্য তবুও ঐ ভাষ্য সম্পর্কে ভদ্রলোকের কোনো দ্বিধা বোধ নেই।

আমেরিকান সংবাদ-দাতা ভদ্রলোকের লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় জাপানে যাবার পূর্বেই ঘটেছিল। তিনি একাধিকবার

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া ইন্দো-চীন, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে ঘুরেছেন এবং এসব দেশের মাথা মাথা কর্তা-ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তাঁদের মুখ্য বক্তব্য নিজের কাগজের মাধ্যমে পাঠকদের জানিয়েছেন। ভারতবর্ষে তিনি প্রধান মন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে এই ভার-সাম্যনীতি নিয়ে আলোচনা করে নেহরুর মতামত যথাযথভাবে প্রকাশ করেছিলেন। কেন ভারতবর্ষ ভার-সাম্য নীতিতে অবিশ্বাসী সে প্রশ্নটী তিনি নেহরুকে করেছিলেন। উত্তর পেয়েছিলেন যে বর্তমান পৃথিবীতে যদি কোনও দেশ অপর কোনো শক্তিশালী দেশের লেজুড় হয়ে পড়ে তা হোলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশটী তাঁবেদার না হয়ে থাকতেই পারে না। এর পরিণাম নেহরুর মতে অত্যন্ত দুর্বিসহ হয়, কারণ দুর্বল দেশটী ইচ্ছা করলেও (রাজনৈতিক এবং বিশেষভাবে অর্থ-নৈতিক কারণে) আর মুক্তি পায়না।

ভার-সাম্য নীতির পরিণাম এর চেয়ে বেশী পরিষ্কার ভাবে বোধহয় বলা যায় না। অতীতে যখন পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার অঞ্চলগুলো বৈদেশিক শক্তির খেলার পুতুলের মত ছিল তখন ইয়োরোপের পক্ষে নাবালক জাপানকে সাথী করে রাখতে কোনো আপত্তি হয়ত ছিল না বরং আগ্রহের সঙ্গেই জাপানের মিতালি তাদের কাম্য হয়েছিল। কিন্তু আজ যখন এসব অঞ্চল জাগ্রত, যদিও দুর্বল, তখন ভার-সাম্য মিতালি কোথায় নিয়ে যেতে চায় এবং কোন উদ্দেশ্য সাধনে ?

জাপানের রাজনীতিতে আর একটা মজার জিনিস লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক দেশেরই রাজনৈতিক স্নায়ু-কেন্দ্র সেই দেশেই খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু সেখানে তা পাওয়া যায় না। এত শিল্প-সম্ভারের দেশ, বাণিজ্য-রীতি ও নীতি এত মার্জ্জিত ও ভারতবর্ষ থেকে উন্নত তবুও কেন এর রাজনৈতিক স্নায়ু-কেন্দ্র স্বদেশে বা এশিয়ায় খুজে পাওয়া যায় না ? সে কেন্দ্র খুঁজে বের করতে হয় প্রশান্ত

মহাসাগরের অপর কূলে—আমেরিকায়। কারণ অবশ্যই আছে। *প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধটা অল্প বিস্তর আমেরিকাকেই করতে হয়েছে। সেজন্যে আমেরিকার প্রভাব জাপানের উপর পড়া* অস্বাভাবিক নয়। জাপানের বুকের উপরে এখনও আমেরিকান সৈন্য মোতায়েন, জাপানী মাটীতে শত শত আমেরিকান উড়ো-জাহাজের ঘাটি বর্তমান—সবই সেই যুদ্ধের জের।

তবুও শান্তি আসবার পর যখন জাপান আত্ম শক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে নতুন সামাজিক কাঠামো গড়ে তুল্‌ছে, যখন "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"র প্রতিরূপ মিকাডোর জয়ধ্বনি আর জাপানের পথে ঘাটে শোনা যায় না, যখন জাপানিরা সম্রাটকে নিয়মতান্ত্রিক সম্রাট করে ফেলেছে, যখন ডায়েট পার্লামেণ্টে আলোচনার মাধ্যমে ও পার্টি-সরকার দ্বারা জাপানের রাজনৈতিক জীবন পরিচালিত হচ্ছে তখন রাজনৈতিক স্নায়ু-কেন্দ্রটী দেশের মাটিতে না দেখতে পেলে অবাক হতে হয় বৈকি। কাগজে কলমে নিশ্চয়ই জাপান স্বাধীন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কে অস্বীকার করবে যে তার মাটীতে চুক্তির বলেই এখনও একলক্ষ আমেরিকান সৈন্য মোতায়েন, যাদের সেদিনও বলা হোত "দখলকারী" সৈন্য। স্যান-ফ্রানসিসকো শান্তি চুক্তিতে দখলী-আমল শেষ হোল (১৯৫২ খৃষ্টাব্দে) কিন্তু আজও এই আমেরিকান সৈন্য ও তাদের ঘাটি জাপানী সরকারের কোনো তোয়াক্কা না করেই তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলো চালিয়ে আসছে। মাঝে মাঝে বিক্ষোভ ফেটে পড়ে কিন্তু আজ যে সরকার জাপানের মন্ত্রিত্বে আসীন তাদের কেউই এ সব ব্যবস্থা পালটে দিয়ে জাপান-আমেরিকা সৌহার্দ্য নষ্ট করতে রাজী নয়। রাজনীতিজ্ঞরা দেখাবে রাজনীতিক কারণগুলো, শিল্প-পতিরা দেখাবে অর্থনৈতিক কারণগুলো কিন্তু সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখলে আমেরিকা যে জাপানের নতুন অভিভাবক তা শুধু কথার মারপ্যাঁচে অস্বীকার করা কঠিন।

যোশিদা সরকার তখনও গদীতে মোতায়েন। কিন্তু আর যে বেশীদিন থাকতে পারবে না তা' অনায়াসেই বুঝতে পারা যাচ্ছিল দলের বিদ্রোহ থেকে। এ বিদ্রোহ অপ্রত্যাশিতও ছিল না। কোরিয়া যুদ্ধ খতম হয়েছে এবং আমেরিকাও হাত গুটাতে আরম্ভ করেছে। প্রধান-মন্ত্রী যোশিদা বার বার আমেরিকার মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা করেও হালে পানি পাননি। সর্বশেষে আমেরিকাতেই উপস্থিত হলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে দলের বিদ্রোহী-সদস্যেরা উদারপন্থী শাখার দলপতি হাতোয়ামাকে (Ichiro Hatoyama, President of Liberal Party) নেতা করে ফেলেছে। সাধারণ নির্বাচন আসন্ন। আমরা জাপানে উপস্থিত হোলাম এই পরিস্থিতির মধ্যে।

দেশের রাজনৈতিক দলগুলির প্রধানদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা হোল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রধান-মন্ত্রী শিগেরু যোশিদার (Shigeru Yoshida) সহগামীরা, পরবর্তী প্রধান-মন্ত্রী হাতোয়ামা, বিখ্যাত কূটনীতিজ্ঞ এম্ সিগেমেত্সু (Mamoru Shigamitsu, President of Progressive Party) যিনি যুদ্ধ পরাজয় চুক্তি-পত্র (আগস্ট ১৯৪৫) সই করেছিলেন। তিনি নেতাজী সুভাষের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং হাতোয়ামা ক্যাবিনেটে বৈদেশিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হয়েছিলেন। পরবর্তী প্রধান-মন্ত্রী তানজান ইসিবাসি (Tanzan Ishibashi) ও আজকের প্রধান-মন্ত্রী নবস্থকে কিসির (Nobosuke Kishi) সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। এঁরা সকলেই হয় দক্ষিণপন্থী নয় উদারপন্থী এবং অতি রক্ষণশীল গোষ্ঠী ভুক্ত। এঁদের বিরুদ্ধে ছিলেন এবং বর্তমানেও আছেন প্রধানতঃ সোস্যালিষ্টের বা সমাজতন্ত্রীরা। এঁরাও সে সময়ে দুই দলে বিভক্ত ছিলেন তবে যা'তে একই দলভুক্ত হন তার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলছিল এবং নির্বাচনের পর সে চেষ্টা সফলও হোল।

সমাজতন্ত্রীদের দুই শাখার দুই দলপতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল। জাপানের কমিউনিষ্ট-পার্টির প্রতিনিধিদের সঙ্গেও আমাদের সাক্ষাৎকার হয়েছিল এবং তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা তাঁদেরই মুখ থেকে শুনেছিলাম।

এইসব শ্রেষ্ঠ জাপানী রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে এবং ডায়েট পার্লামেন্টে তাঁদের কর্মতালিকার সঙ্গে পরিচিতির ফলে আমাদের দুটো ধারণা হয়েছিল। প্রথমটার উল্লেখ করছি। সেটা হচ্ছে যে জাপানের রাষ্ট্রনীতির স্নায়ু-কেন্দ্র আমেরিকাতে প্রতিষ্ঠিত। একথা শুধু যে কেবল দক্ষিণপন্থী বা উদারপন্থী সংরক্ষণশীল দলগুলিই খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেন তা' নয়, নানা রকমের প্রতিবাদ ও বিরক্তি প্রকাশের মাধ্যমে বামপন্থীরাও এটা স্বীকার করে থাকেন। ঠিক যেন একই শক্তির দুটি গতি-ধারা—একটা সটান আমেরিকার দিকে ছুটেছে আর একটা আমেরিকা থেকে দূরে যেতে আগ্রহী। উভয় ক্ষেত্রে কিন্তু আমেরিকাই হোল কেন্দ্র-বিন্দু।

জাপানী রাষ্ট্রনীতির গতিবিধি এ রূপ নেবার জন্যে আমাদের আলোচনাও পরিণামে জাপান-আমেরিকার সম্পর্কের চড়ায় গিয়ে ঠেকত। সিগেমেত্‌সুর কাছে জানতে চাইলাম পূর্বে জাপানের বহির্বাণিজ্যের শতকরা ৩০ ভাগই চীনের সঙ্গে হোত, জাপানের পশ্চিমী বন্ধুরা এই বাণিজ্যে এখন সম্মতি না দিলে জাপান কি করবে? তিনি ঝানু কূটনীতিজ্ঞ; তাই অতি সহজেই প্রশ্নটা এড়িয়ে বল্‌লেন, কে কি পছন্দ করবে বা কিসে রাজী হবে বা না হবে তা'তে জাপানের মত একটা স্বাধীন দেশের কিছুই যায় আসে না। বাণিজ্যনীতি নির্ধারণের ক্ষমতা জাপানেরই আছে। সিগেমেত্‌সু প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন বটে কিন্তু হাতোয়ামা উত্তর দিলেন। ফ্র্যাঙ্ক্‌ মোরেস্‌ তাঁকে প্রশ্ন করলেন যে উদারপন্থীদের মধ্যে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে তার পেছনে কি জাপানকে রাজনীতিতে স্বয়ংসিদ্ধ করবার ইচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছেনা?

উত্তরে হাতোয়ামা বললেন, "না"। পরে বিশদভাবে জানালেন জাপানের কিছু লোকের হয়ত এরকম একটা ধারণা আছে যে জাপানকে আমেরিকা থেকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত, কিন্তু তিনি নিজে সে মত পোষণ করেন না। সম্প্রতি তিনি জাপানের বিভিন্ন এলাকার গভরনরদের এক সম্মেলন ডেকে যে সব মন্তব্য শুনেছেন তাতে তাঁর এই মত দৃঢ় হয়েছে যে দেশের লোকও জাপান-আমেরিকা সৌহার্দ্য ভাঙতে ইচ্ছুক নয়। হাতোয়ামার মতে জাপানের প্রকৃত অবস্থা ও বক্তব্য ঠিক ঠিক ভাবে আমেরিকায় পেশ করলে জাপানের পক্ষে রাশিয়া বা চীনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য বা কূটনৈতিক সম্পর্কে স্থাপন করা কঠিন হবে না।

সমাজতন্ত্রী নেতা মোসাবুরো সুজুকির (Mosaburo Suzuki, Secretary General of left wing Socialist Party) সঙ্গে আলাপ হোল অনেকটা মরমী পরিবেশের মধ্যে। সুজুকি ভারতবর্ষে এসেছিলেন, নেহরুর সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ, পঞ্চশীলে বিশ্বাসী, ভারতের বৈদেশিক নীতির সমর্থক এবং তাঁর দলের একান্ত ইচ্ছা ঠিক ঐ ভাবেই জাপানকে শক্তিগোষ্ঠীগুলো থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। কথায় কথায় বললেন যে আমেরিকা কনষ্টিটিউসন অগ্রাহ্য করে জাপানের উপর চাপ দিচ্ছে পুনরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে। জাপানের উপর আমেরিকার চাপ অত্যধিক, এখনও জাপানে প্রায় ৭০০ আমেরিকান ঘাঁটি বর্তমান, প্রভৃতি।

প্রশ্ন করলাম যে আমেরিকার সাহায্য প্রত্যাহৃত হোলে জাপান কিভাবে দেশ চালাবে? সুজুকি উত্তরে জানালেন স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্য চালু থাকলে জাপান নিজেই নিজের ব্যবস্থা করে নিতে পারবে। জাপানের শিল্প-জীবন যতটা উন্নত তাতে তার পক্ষে অপরের সাহায্য ছাড়াও উন্নতি করা অসম্ভব নয়। চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশগুলো আজ দেশের উন্নয়ন কাজে নিযুক্ত,

এক্ষেত্রে জাপান যদি তার শিল্পসম্ভার স্বাভাবিকভাবে সেখানে পৌঁছে দেয় তবে দু' পক্ষই ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধাটুকু সহজে গ্রহণ করবে বলে তিনি আশা পোষণ করেন। তাঁর একমাত্র অভিযোগ হোল আমেরিকা জাপানকে সে সুযোগ দিচ্ছেনা।

স্বভাবতই জাপানী কমিউনিষ্টেরা আমেরিকানদের তাঁবেদারী পছন্দ করেন না। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে কথা উঠল পুনরস্ত্রীকরণের। কানিচি কায়াকামী, এম. পি ; শুয়োচি কাসুগা ও বাত্রু ইয়োনাহাতা (Mr. Kanichi Kawakami. M. P., Mr. Shyoichi Kasuga the chief of Central Direction Committee and Mr. Wataru Yonahata, member Central Committee) অতীতের জাপানী ইম্পিরিয়ালিজমের ধারা থেকে তাঁদের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বললেন। পুনরস্ত্রীকরণের একমাত্র উদ্দেশ্য হোল, তাঁদের মতে, জাপানকে আমেরিকার ঘাঁটি বানান।

প্রশ্ন করলাম জাপানের সামুদ্রিক অঞ্চলে জাপানী মাছের জাহাজগুলো যে কোরিয়ার সিংমান-রী একটির পর একটি আটক করে রাখছেন তা' কি করে কমিউনিষ্ট পার্টি ফৌজী সাহায্য ছাড়া ঠেকাবেন ? মুখপাত্র উত্তরে বল্‌লেন যে জাপান ও কোরিয়ার বিরোধের মধ্যে আমেরিকা নাক না গলালে উভয় দেশ সহজেই পারস্পরিক বোঝাপড়া করে নিতে পারবে।

আমেরিকার প্রতি অনুরাগ অথবা বিরাগ দেখাতে জাপানের রাজনৈতিক দলগুলি সমানভাগে বিভক্ত বলে মনে হোল। যাঁরা এখন গদীতে মোতায়েন তাঁরা বাস্তব জগতের ধাক্কা অস্বীকার করতে পারেন না বলেই খোলাখুলি স্বীকার করেন সে অনুরাগের কথা এবং অন্যেরা সে আনুগত্যের দাবীকে সরাসরি অস্বীকার করেন। এঁদের মধ্যেও অনুরাগ বা বিরাগ দেখানর ব্যাপারে আবার ইতর-বিশেষ আছে। যোশিদার অনুগামীরা এবং কমিউনিষ্টরা উগ্র অনুরাগী

বা উগ্রবিরাগী। ওকাজাকী ছিলেন এমনিধারা উগ্র অনুরাগী। তিনি চীন-জাপানের সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন যে ফরমোজাকে না চটিয়ে মূল-ভূখণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্য জাপানকে করতেই হবে একদিন, কিন্তু সে যোগাযোগ যাতে আমেরিকা-বিরোধী প্রচারের সহায়ক না হয় তাও দেখতে হবে।

আজ এটাই হোল জাপানের রাষ্ট্র-নীতির সর্বপ্রধান প্রশ্ন। হাতোয়ামা পদত্যাগ করবার পূর্বে সোভিয়েটের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু জাপানের ভবিষ্যৎ জীবন-সমস্যার যে প্রশ্নটী চীন-জাপান সম্পর্কের মধ্যে নিহিত আছে তার সমাধান কিছুই করতে পারেননি। বান্দুং কনফারেন্সে জাপানী ও চৈনিক সদস্যেরা আলাপ ও আলোচনার মাধ্যমে পরস্পরকে জানতে ও চিনতে পেরেছেন, বে-সরকারী ডেলিগেশন পাঠিয়ে উভয় দেশই উভয় দেশের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন এবং বৃহৎ বৃহৎ জাপানী শিল্প-পতিদের চৈনিক বাণিজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ক্রমাগত চাপের ফলে প্রতিটি পার্টি-সরকারই সেদিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন বটে, কিন্তু সমস্যার সমাধান হচ্ছে কৈ?

জাপানী রাষ্ট্রনীতির অপর ধারাটি নিতান্তই জাপানের ঘরোয়া ব্যাপার। হাতোয়ামাকে প্রশ্নচ্ছলে পার্লামেণ্টারী ডিমোক্রেসির উপর তাঁর মতামত কি তা' শুনতে চেয়েছিলাম। উত্তরে তিনি বললেন যে জাপান পার্লামেণ্ট কি বস্তু তা' জানে, কিন্তু পার্লামেণ্টারী ডিমোক্রেসির সহিত পরিচিত নয়। ডায়েটের বিরাট প্রাসাদ, তুটো হাউসের সাজান-গুছান বিধিব্যবস্থা, প্রতিটি মেম্বরের হাউসে বসবার এবং যখন হাউস না বসে তখন তাঁর পার্লামেণ্টারী কর্তব্য করবার সুযোগ সুবিধা, প্রতিটি মেম্বরের জন্য প্রাইভেট সেক্রেটারী ও ডায়েটের কাছেই আসন করে দেবার বিধিব্যবস্থা দেখে বেশ মনে করা যেতে পারে যে জাপান পার্লামেণ্টারী ডিমোক্রেসির নিয়মতান্ত্রিক পথে এগুতে শুরু করেছে।

কিন্তু সদস্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলে জাপানী ডিমোক্রেসির কোনোখানে যেন একটা বিরাট খুঁত থেকে গেছে বলে মনে হয়। যেমন বড় বড় প্রশ্নে প্রধান-মন্ত্রী ও বৈদেশিক মন্ত্রী বরাবর পরস্পর-বিরোধী মতামত দিয়ে আসছেন। যদি আজ ভারতবর্ষের ক্যাবিনেটে সামরিক চুক্তি বা জাতীয়করণের প্রশ্নে নেহরু ও পন্থের পরস্পর বিরোধী মতামত শোনা যেত এবং তাতে যেমনি বিস্মিত হোতে হোত এও প্রায় তদনুরূপ। সিগেমেত্সু সোভিয়েটের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে ফিরে এসে বললেন, "চুক্তি অসম্ভব"। প্রধান-মন্ত্রী হাতোয়ামা বৈদেশিক মন্ত্রীর মতামত অগ্রাহ্য করে মস্কো গিয়ে চুক্তি করে এলেন।

এমনধারা বিরোধ জাপানী ক্যাবিনেটের মেম্বরদের কাছ থেকে বড় বড় বিষয়ে নিত্যই আশা করা যেতে পারে। কেন এমনটা হয়? হয় ছোট ছোট দল নিয়ে ক্যাবিনেট গঠিত হয় বলে দলগত-বিরোধ লেগেই থাকে ক্যাবিনেটের মধ্যে, নতুবা জাপানের বর্তমান অবস্থা বুঝে ক্যাবিনেটের মেম্বরদের মধ্যে একটা বুঝাপড়া হয়ে থাকে যে তাঁরা বেসুরো মতামত দেবেন যাতে কোন প্রশ্নই চিরকালের জন্য হাঁ বা না এর মধ্যে ডুবে না যায়। অথবা ওয়াশিংটন এবং মস্কোর টানাটানিতে টোকিও বিষাদ রোগাক্রান্ত বলেই এমনটি হয়। মোটের উপর ক্যাবিনেট মেম্বরদের পরস্পর-বিরোধী মতামত দেওয়া জাপানী রাষ্ট্রনীতির যেন একটা অচ্ছেদ্য অঙ্গ।

বিরুদ্ধদলের সদস্যদের অভিযোগগুলো শুনলে তার মধ্যে এমন দু' একটা প্রশ্ন ওঠে যা মারাত্মক। যেমন পুনরস্ত্রীকরণের প্রশ্ন। জাপানী কনষ্টিটিউসনে এর বিধান নেই। যদি নতুন বিধান আনতে হয় তবে ডায়েটের তিন-চতুর্থাংশের সমর্থন নিয়ে করতে হবে। বর্তমানে তা' অসম্ভব। সেজন্যে সোস্যালিষ্টরা সন্দেহ করেন যে সরকার পেছনের দরজা দিয়ে পুনরস্ত্রীকরণের ব্যবস্থা কচ্ছেন। সিগেমেত্সু কথাটা পরিষ্কার করে দিলেন। "পুনরস্ত্রীকরণ"

কথাটাই তিনি পছন্দ করেন না বল্‌লেন। তবে কি না, জাপানী সম্পত্তির তদারক করবার জন্য একটা বাহিনীর ত প্রয়োজন হবে। সেটা পুনরস্ত্রীকরণ নয়, ওটাকে বড়জোর পুলিসী-তদারক বাহিনী বলা যেতে পারে! সোস্যালিষ্টরা উত্তরে মন্তব্য করলেন যার নাম ভাজা-চাল তারই নাম মুড়ি। ঐ তদারক বাহিনী হোল পুনরস্ত্রীকরণের প্রথম ধাপ।

কমিউনিষ্টরা আরও স্পষ্টভাবে কথাটা বলেন। "ভারতবর্ষ ও জাপানকে এক পর্যায়ে ফেলে ভুল করবেন না," এই হোল তাঁদের প্রথম অনুরোধ। তাঁদের মতে একটা ছিল সাম্রাজ্যবাদী-কবলিত ও অন্যটী সাম্রাজ্যবাদে-বিশ্বাসী দেশ, অতএব বাহিনী গড়ে উঠলে সাম্রাজ্যবাদের পুরনো ঐতিহ্য আবার জাঁকালো হয়ে বেড়ে যাবে। বর্তমানে সেই ব্যবস্থাই করা হচ্ছে। ওয়াগ্‌লে প্রশ্ন করলেন, কেন, আপনারা নির্বাচনে জয়ী হোলে ত সে ভয় থাকবে না? মুখপাত্র উত্তরে জানালেন যে, সে পথ খোলা রাখা হয়নি। তাঁদের দলের সক্রিয় চাষী ও শ্রমিক কর্মীদের জেলে পুরে রাখা হয়েছে। অতএব ফলাফল সেদিক দিয়ে ভাল হবার কোনই সম্ভাবনা নেই। কথাটা সত্যেই পরিণত হোল। পূর্বেকার ডায়েটে যদিও বা দু' একজন কমিউনিষ্ট ছিল, বর্তমানে একজনও নেই।

সোস্যালিষ্টরা অবশ্য এ অভিযোগ আনেন নি। তাঁদের মতে জেলে পুরে রাখা হয়েছে তাদেরই যারা শান্তি-শৃঙ্খলা ভাঙ্গবার চেষ্টা করেছিল। তাঁদের অভিযোগ যে কনষ্টিটিউসনে যে সব ধারা দেওয়া আছে সেগুলো বর্তমান পার্টি-সরকার নানা উপায়ে বাতিল করে দেবার চেষ্টায় আছেন। যখন জিজ্ঞাসা করা হোল, কেমন করে? উত্তর এল যে দখলকারী-কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে যে সব সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেছিল সরকার তা' একে একে বাতিল করে দিচ্ছে। অভিযোগটি কৌতুকাবহ। যেদিন থেকে জাপান শিল্প-বাণিজ্যের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল সেদিন সে একদিকে পেয়েছিল

জাইবাত্‌সুদের আর অন্যদিকে অগণিত খেটে-খাওয়া শ্রমিক। আমাদের সেকালের জমিদার ও তাদের আমলাদের মধ্যে যে ধরণের সম্বন্ধ ছিল এদের মধ্যে অনেকটা সেই ধরণের আত্মীয়তাবোধ গড়ে উঠেছিল। ইয়োরোপ থেকে জাপান কৌশলটুকুই নিয়েছিল, নেয়নি শ্রমিকদের মান উন্নয়নের ধারাগুলো। ফলে একদিন জাপানী শিল্প অতি সহজে ইয়োরোপের মাল বাজার থেকে হটিয়ে দিতে পেরেছিল। বেধে উঠেছিল সেদিন তর্কাতর্কি, ইয়োরোপ চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণিত করবার চেষ্টা করতে লাগল যে জাপান শ্রমিককে তার প্রাপ্য মজুরী দেয়না বলেই সস্তায় মাল ছাড়তে পারে। জাপান অস্বীকার করে আসছিল এ অভিযোগ।

সেই পুরনো জাপানী শিল্প-নীতির কাঠামোটা দাঁড়িয়ে ছিল তিনটী বিরাট স্তম্ভের উপর। প্রথমত সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে জাতীয় সম্মান ও সমৃদ্ধি-বোধ বিষয়ে একটা মানসিক ঐক্য। দ্বিতীয়ত মাছ-ভাত যোগান দিতে সক্ষম অর্থনীতি এবং তৃতীয়ত আপামর জনসাধারণের মধ্যে অবিরাম কাজ করবার একটা আগ্রহ। আমরা একদিন কৌতুক-বোধ করেছিলাম যখন আবুল কাশেম ফজলুল হ'ক বাংলা-সরকারের প্রধান-মন্ত্রী হয়ে কামনা করেছিলেন যে প্রতিটা বাঙালীর ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করবেন। তিনি অবশ্য তা' পূরণ করতে পারেননি, কিন্তু শতাব্দীর গোড়ায় মেইজী-যুগ শুরু হবার পর জাপান সেই প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল এবং কাজেও সফল হতে পেরেছিল। ফলে স্বল্পে সন্তুষ্ট মাছ-ভেতো জাপানী কৃষক ও শ্রমিক জাইবাত্‌সু ও সেনানায়কদের হাতে পড়ে হয়ে উঠল অক্লান্ত চাষী ও সুদক্ষ টেকনিসিয়ান। জাপানী মাল ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীর বাজারে বাজারে এত সস্তায় যে ইয়োরোপের সে মাল তার সামনে দাঁড়াতে পারল না।

জাতীয়-শিল্পে ট্রেড ইউনিয়নের ধারা এগুতে পারেনি কারণ জাপানী শ্রমিক-মালিক সম্বন্ধটা ইয়োরোপীয় ধারায় গড়ে ওঠেনি।

মজুরীর হার অবশ্য কমই ছিল কিন্তু সেটা ধর্তব্যের মধ্যে তত আসেনি স্বল্পে-সন্তুষ্ট জাপানী শ্রমিকের কাছে যতটা বড় হয়ে উঠেছিল শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত শ্রমিকদের বোনাসের, বসবাসের, খাদ্য সরবরাহের, যাতায়াতের অথবা চিকিৎসার ব্যবস্থাগুলি। শ্রমিক-সংখ্যা অগণিত হবার দরুণ জাপানী শিল্পে কোনো দিনই লোকের অভাব হয়নি বলে শ্রমিকের পাওনা-দাবী সঠিকভাবে গড়ে ওঠেনি। আবার ভারতবর্ষের মত এক প্রদেশ হতে অন্য প্রদেশে সস্তা শ্রমিক আমদানী করতে হয়নি বলে প্রতিষ্ঠানের প্রতি স্থানীয় শ্রমিকের মমতা অতি সহজেই গিয়ে পড়েছে। তাই বিরোধের কারণ থাকলেও সে বিরোধ কোনো-পক্ষই এমন স্তরে নিয়ে যেতে রাজী হোত না বা এখনও চায় না যাতে প্রতিষ্ঠানটীর ভবিষ্যৎ নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে।

আমেরিকানদের হাতে পড়ে জাপানের এই সনাতন বিধি-ব্যবস্থা উলটে-পালটে গেল। আমাদের কাছে তাই একাধিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মাতব্বরেরা আমেরিকান দখলকারীদের জাপানী চাষী ও শ্রমিকদের প্রতি প্রযুক্ত নতুন ব্যবস্থাগুলো সম্পর্কে অনেক অভিযোগ করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্যগুলি অনেক সময় অদ্ভুত মনে হয়েছিল। তাঁদের মতে যাঁরা আমেরিকান বিধানগুলি যুদ্ধোত্তর কালে প্রয়োগ করেছিলেন তাঁরা নাকি ছিলেন বামপন্থী! এবং সে জন্যেই তাঁরা জাপানী সনাতন বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে গ্রহণযোগ্য কিছুই দেখতে পারেননি এবং এমন মনগড়া আইন চাপিয়ে দিলেন যা সমর্থনযোগ্য নয়। ব্যাপারটী কিন্তু আসলে অন্য রকম। জাপানের আদিম ব্যবস্থা ভালই হোক বা মন্দই হোক যখন জাপান বর্তমান জগতের শিল্প-সম্ভার আমদানী করছে তখন তার শ্রমিক-সংস্থাও হবে বর্তমানের অনুরূপ, এই ছিল আমেরিকানদের গোড়ার পলিসি। তাঁদের অন্য মতলব ছিল জাইবাত্‌সু পরিবারের হাত থেকে জাপানী জাতীয়-জীবনের অর্থনৈতিক সূত্র কেড়ে নেওয়া। (Creation

of Holding Company Liquidation Commission for dissolution of Zaibatsu holdings, 1946.)

শ্রমিকরা আমেরিকানদের কাছ থেকে অধিকার পেল এক রকম বিনা আন্দোলনে এবং অতি সহজেই। অধিকার এল বটে কিন্তু বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকল না কোরিয়া মরশুমের পরে। যুদ্ধোত্তর কালের অল্পাধিক বিশৃঙ্খলা ত ছিলই তার উপর প্রকাশ পেল উগ্র শ্রমিক-আন্দোলন যার এক ধাক্কা আমেরিকানদের পরই গিয়ে পড়েছিল। বামপন্থীরা সেদিন যেমন ভারতবর্ষে তেমনি জাপানেও এই উগ্র বিরোধের জন্য তাঁদের প্রভাব নতুন অধিকার-প্রাপ্ত শ্রমিকের উপর বেশিদিন রাখতে পারেননি। বাস্তব অবস্থা এইসব উগ্র বামপন্থীদের কুক্ষিগত শ্রমিকদের উদ্ধারে সাহায্য করল আমেরিকা দত্ত সাহায্যে পুষ্ট শিল্প-পতিদের। স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটীতে হুকুম গেল শিল্প-প্রতিষ্ঠান থেকে যে, ভবিষ্যতে নিযুক্ত করা হবে সেইসব শ্রমিকদের যাদের ধ্যানধারণা উগ্র বামপন্থী নয়।

আমরা যখন জাপানে তখন উগ্র বামপন্থীরা প্রায় একঘরে হয়ে পড়েছেন এবং সেই সঙ্গে আরম্ভ হয়েছে শিল্পপতিদের একদিকে জাইবাত্‌সু শ্রেণীর উদ্ধার প্রচেষ্টা অন্যদিকে শ্রমিকদের পুনরায় জাপানী সনাতন ব্যবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া। সোস্যালিষ্ট নেতারা সেদিন খোলাখুলি অভিযোগ করতে শুরু করেছেন যে দখলকারী কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে যে সব সুযোগ সুবিধা দিয়েছিলেন বর্তমান সরকার তা' প্রত্যাহার করতে ব্যস্ত।

কিন্তু কি পুনরস্ত্রীকরণ, কি নতুন শ্রমিক-নীতি সবারই পেছনে বর্তমান জাপানের রাষ্ট্র-নীতিক সমস্যা এবং সে সমস্যার যে পর্যন্ত কোনো সমাধান না হচ্ছে সে পর্যন্ত জাপানী জাতীয় জীবন পুনরায় সহজ ও সরল হবার সম্ভাবনা কোথায়? সে সমস্যা শুরু হয়েছে সেই ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে যখন জাপান-আমেরিকা সন্ধি-সূত্র গ্রথিত হয়

স্যান ফ্রান্সিসকোতে। জাপানী রাষ্ট্রনীতির ভার-কেন্দ্র সেদিন থেকে গিয়ে পড়েছে আমেরিকায়, জাপানী বাণিজ্যের অর্থনীতিও সেদিন থেকে ভর করে আছে আমেরিকার দক্ষিণ হস্তের উপর।

সোস্যালিষ্ট নেতারা বার বার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন আমাদের কাছে যে জাপানী রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ ভারতবর্ষের মত পঞ্চশীল নীতির স্বপক্ষে হওয়া উচিত। কিন্তু তা' কেবল ইচ্ছা মাত্রই থাকবে, বাস্তব অবস্থা সে নীতির বিপক্ষে। আমেরিকার সাহায্য প্রত্যাহৃত হোলে জাপান কিভাবে দেশ চালাবে সে প্রশ্ন আমরা সোস্যালিষ্ট নেতাদের কাছে বার বার উত্থাপন করেছি। তাঁরা সদুত্তরও দিয়েছিলেন এই বলে যে স্বাভাবিক ব্যবসা বাণিজ্য চালু হোলে কারও দানের উপর জাপানকে নির্ভর করতে হবে না। তাঁদের এও দৃঢ়মূল ধারণা যে, অতীতের তিক্ততা ভুলে মহাচীন জাপানের সঙ্গে বাণিজ্য করতে আগ্রহশীল। সবই হয়ত ঠিক। কিন্তু সন্ধি ত এক পক্ষ নিয়ে হয় না, ওকিনওয়া আমেরিকান ঘাঁটি থাকবেই, ফরমোজা আমেরিকান নৌবহর রক্ষা করবেই, দক্ষিণ কোরিয়া উত্তর কোরিয়া থেকে বিভক্ত হয়ে সন্দেহের চোখে চীন ও সোভিয়েটের দিকে তাকাবেই, পুরনো ইন্দোচীনের স্থানাঞ্চলে, থাইল্যাণ্ডে ও পাকিস্তান নিয়ে ব্যূহ রচনা চলবেই। এ অবস্থায় যুদ্ধে পরাজিত জাপান পার্লামেণ্টারী ডিমোক্রেসিতে বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, পঞ্চশীল নীতি তার কাছে গ্রহণযোগ্য হোক আর নাই হোক, মহাচীনে ও মহাভারতে জাপানী শিল্পের যে কোনো বিরাট সম্ভাবনা থাকুক আর নাই থাকুক, বিরাট শক্তির আকর আমেরিকা ও সোভিয়েটের মধ্যে নতুন কোনো বন্ধুত্বের গুঞ্জন যতদিন শুরু না হচ্ছে সে পর্যন্ত জাপানকে উদ্বিগ্ন হয়ে দিন গুণতেই হবে। ফরেষ্টাল বাজে কথা লেখেননি যে আগামী দশ হাজার বৎসরের মানুষের ইতিহাস লেখা হতে চলেছে প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে কূলে।

এসব বাধানিষেধ সত্ত্বেও জাপান যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই অপর দেশকে আত্মীয়তাসূত্রে বাঁধবার চেষ্টাই করে আসছে। জার্মেন চ্যান্‌সেলর আদেনুয়ারের পথ অনুসরণ করে নিজ স্বার্থের পরিপন্থী কারণ থাকা সত্ত্বেও সোভিয়েটের সঙ্গে মিতালী চুক্তি করা জাপানী প্রধানমন্ত্রী হাতোয়ামার পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে। এর সাক্ষাৎ প্রতিফলস্বরূপ সে আজ স্থান পেল ইউনাইটেড নেশন্ প্রতিষ্ঠানে। মহাচীনের সাথেও তার বাণিজ্যে আদান-প্রদান আজ অনেকটা সহজসাধ্য। সর্বোপরি জাপান আজ বোধ হয় প্রথম বুঝতে পেরেছে যে কেবল তার ভৌগোলিক সংস্থানই নয়, সমগ্র ভবিষ্যতও জড়িয়ে আছে এশিয়ার এইসব দেশের ভবিষ্যতের সাথে। টোকিও পৌঁছে আমরা দেখা করলাম ষ্টেট-মন্ত্রী কে, ওকুমুরার সঙ্গে। তখন কেবল ঠিক হয়েছে যে বান্দুংএ এশিয়ার মহা-সম্মেলন বসবে। ওঁকে প্রশ্ন করলাম জাপান সে কনফারেন্সে যোগদান করবে কি না। মন্ত্রিবর অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই সে সম্মেলনের কথা উড়িয়ে দিয়েছিলেন, যদিও যখন সে কনফারেন্স বসেছিল জাপান অত্যন্ত আগ্রহ-ভরেই তাতে যোগদান করেছিল। আমেরিকার দিকে নিবদ্ধ জাপানী চোখ সেদিন এশিয়ার ভৌগোলিক সংস্থা ছাড়া আর কিছু দেখতে পেত কি না সন্দেহ। তাই সেদিন প্রধান-মন্ত্রী যোশিদা জাপান থেকে আমেরিকা এবং আমেরিকা থেকে ইয়োরোপে উড়ে যাওয়া আসা করতে পারলেন কিন্তু এশিয়ায় দৃষ্টিক্ষেপ করবার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

আজ কিন্তু প্রধান-মন্ত্রী কিসি আমেরিকা-যাত্রার পূর্বে এশিয়া ঘোরা প্রয়োজন মনে করলেন। মহাকালের রথচক্র অশান্ত গতিতেই "চরৈবেতি"। ভাঙা-গড়ার মাঝ দিয়ে নতুন আহ্বান দিকে দিকে যেমন অতীতে তেমনি ভবিষ্যতে এসেছে ও আসবে। যে দেশ সমাহিত চিত্তে সে আহ্বানে সাড়া দেয়, বর্তমান তার কাছে যতই গ্লানিদায়ক হোক না কেন, মহাকাল তার পথও দেখিয়ে দেন।

এর অর্থ এই নয় যে জাপান আমেরিকার দিক থেকে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে চীন বা সোভিয়েটের উপর রাখবে। এর একমাত্র অর্থ হোল যে, জাপানকে হতে হবে আত্মস্থ। মহাকাল অল্পে অল্পে সে সুযোগও জাপানের দ্বারে পোঁছে দিচ্ছেন এবং যুদ্ধোত্তর জাপান সাগ্রহে সে সুযোগ গ্রহণও করছে। ব্যাঙ্ক অফ জাপানের গভরনর ও পরে হাতোয়ামা ক্যাবিনেটের অর্থমন্ত্রী ইসিমাদা (H. Ichimada, Governor of Bank of Japan) আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে বলেছিলেন যে ন'কোটি মানুষের দেশ জাপানকে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা যায় না। তাঁর সে কথা তর্কসাপেক্ষ বলে মনে হয়নি। কিন্তু শক্ত মাটিতে পা রাখবার চেষ্টা জাপানকেই করতে হবে। পুরনো ভার-সাম্যনীতি আজ নতুন এশিয়ায় অচল।

শিল্প ও শিল্প-জীবনের কথা

টোকিও এবং ওসাকায় ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা—জাপানের শিল্প ও অর্থনৈতিক জীবনে কার গুরুত্ব কত বেশি? অনেকটা আমাদের কলকাতা ও বম্বের রেষারেষির মত। শিক্ষিত আধুনিকেরা স্বীকার করেন যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের পূর্বে টোকিও ছিল জাপানের রাজনৈতিক রাজধানী আর ওসাকা ছিল নিঃসন্দেহে জাপানের শিল্প ও বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু যুদ্ধের পরে অবস্থার অনেক অদল-বদল হয়ে গেছে এবং টোকিওর গুরুত্ব আজ অনেক বেশি। লাইসেন্স ইস্যু করা বা পলিসি নির্ধারণ করা আজ টোকিওর এক্তেয়ারভুক্ত কাজ, তবে গোটা জাপানের মধ্যে ওসাকায় ভারী ভারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এখনও সমধিক।

এই সব কথা শুনে আমরা আগে থেকেই ধারণা করতে পেরেছিলাম যে ওসাকায় গিয়ে জাপানী শিল্প-জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতে পারব। সুযোগও মিলেছিল। কয়েকজন বড় বড় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, এঁদের মধ্যে আবার দু'একজনের ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতাও ছিল।

ব্যবসার কথা উঠল। শুনলাম দখল (Occupation) হবার পর এদের সকলেরই ধারণা হয়েছিল যে এতদিন ধরে যে শ্রম ও অধ্যবসায়ের গুণে জাপান শিল্প-জীবন প্রতিষ্ঠা করে এসেছে তা' লুপ্ত করে দেওয়া হবে। জাপান যে সেদিন রাতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিল—কেবল ভবিষ্যৎ শিল্প-জীবনের পরিণতি চিন্তা করে নয়—তার কাহিনী আমরা অন্য যায়গায়ও শুনেছিলাম। আমরা শুনেছিলাম যে জাপানে সেদিন অনেক যায়গায় এমন কি মেয়েরা মুখে কালি

মেখে পাহাড়ে জঙ্গলে পালিয়েছিল যাতে দখলকারী সেনাবাহিনীর সামনে না পড়তে হয়। বিজিত হয়ে শত্রুর চোখের উপরে নিজের দেশে চলাফেরা করা আপামর সকল শ্রেণীর জাপানীর কাছে হয়ে পড়েছিল এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। শিক্ষিত জাপানীর সেদিনকার অভিজ্ঞতা শুনবার ইচ্ছা থাকলেও, কি মনে করবে এই আশংকায় সে প্রশ্ন করিনি তবে কেতাবে পড়েছি এবং টোকিওতে সে সময় যে সব স্বদেশীয়েরা ছিলেন তাঁদের দু'একজনকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসাও করেছি। জেনেছিলাম যে দখলে যাবার পূর্ব মুহূর্তে জাপানী সামাজিক খোলস শহরে অনেকখানিই ভেঙে পড়েছিল। লুটতরাজ সুরুও হয়েছিল সেই শ্রেণীর মধ্যে যাদের উপর ভার থাকে সমাজ-জীবনে শৃঙ্খলা বজায় রাখার।

অবশ্য দখলকারীদের সম্পর্কে আশংকা সাধারণভাবে অমূলক প্রমাণিত হয়েছিল। দেশে বিদেশী সৈন্যবাহিনী মোতায়েন, তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশেষতঃ যৌন-জীবন, অব্যাহত রাখতে জাপানী কর্তৃপক্ষকে বিধি ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। শুনেছিলাম যে গায়শা মেয়েরা সাদাদের চেয়ে কৃষ্ণকায়দের নিকট থেকেই অধিকতর ভদ্র ব্যবহার পেত।

ওসাকায় শিল্পপতিদের কাছে শুনলাম তাঁদের কাহিনী। তাঁদেরও ধারণা ছিল যে যুদ্ধে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো যেটুকু বা বেঁচেছে তাও পণ্ড হয়ে যাবে এবার। অকুপেসন আর্মি প্রথমেই এ্যনটি-ট্রাষ্ট-আইন (Enactment of Economic Deconcentration Law 1947) প্রয়োগ করল। যুদ্ধের আগে চারটে শিল্পপতি পরিবার গোটা দেশটাই ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন। তাঁদের মাথা মাথাগুলোকে তাড়িয়ে দেওয়া হোল এবং গোষ্ঠী ভেঙে প্রত্যেকটা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হোল।

কিন্তু জাপানের সুদিন অপ্রত্যাশিতভাবে এসে পড়ল। যুদ্ধ-বিরতির পর পরই সোভিয়েট শক্তির সঙ্গে ক্রমবর্ধমান বিরোধের

ফলে পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জ জাপানের শিল্প সম্ভাবনা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হোল। কোরিয়ার যুদ্ধ লেগে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার জাপানের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোকে পূর্ণোদ্যমে কাজে লাগাবার অনুমতি এল। জাপানও এ সুযোগ গ্রহণ করল। যে জাপান আত্ম-সমর্পণ করবার পর প্রায় দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল, কেবল দু' বছরের মধ্যে (১৯৫০-৫২) ধাপে ধাপে ডলার রিজার্ভ তৈরী করে ফেলল। আমেরিকান জাহাজ, মিসৌরির ডেকে-পাতা টেবিলের উপর রাখা যুদ্ধ-পরাজয় খত-খানা যেদিন জাপান সই করে আসল ১৯৪৫ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে সেদিন থেকে আমেরিকার দাক্ষিণ্য শ্রাবণের ধারার মত যে কত খাতে বর্ষিত হয়েছে জাপানের প্রতিটি শিরে সে এক বিরাট কাহিনী।

অংকের হিসেবে বলা যায় যে ১৯৪৫ খৃস্টাব্দ থেকে ১৯৫৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকা থেকে নানা খাতে আসা অর্থের পরিমাণ হচ্ছে মোট ৪৭০০ মিলিয়ান ডলার (অর্থাৎ তেইশ শত পঞ্চাশ কোটি টাকা)।

আমরা যখন জাপানে, তখন কোরিয়া-যুদ্ধ শেষ হয়েছে এবং জাপানের অর্থনৈতিক কাঠামো বদলাতে শুরু করেছে। কোরিয়া-যুদ্ধের সময় গড়ে-তোলা রিজার্ভ ফাণ্ড ভাঙা আরম্ভ হয়েছে। কোরিয়ার মরশুম শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আর আমেরিকা যে কোনো মূল্যে জাপানের কাছে দ্রুত সরবরাহ চাচ্ছে না; এদিকে নির্বিঘ্নে বাণিজ্য চালানর বাজার সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে, যুদ্ধ-পূর্ব জাপানী সাম্রাজ্যের শতকরা ৪৫ ভাগ তার হস্তচ্যুত এবং সেই সঙ্গে চলে গেছে কাঁচামালের উৎস ও তৈরী মালের বাজার। জাপানের নতুন বাজার চাই-ই চাই। নিজে বেঁচে থাকবার জন্যে, নিজের তৈরী মালের বিনিময়ে অন্য দেশের কাঁচামাল আমদানীর জন্যে। তার জীবন-যাত্রার মান বাঁচানর জন্যে এটি একান্ত অপরিহার্য।

ওসাকার শিল্পপতি তাকাহাতা পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিলেন অবস্থা। জাপানের লোক সংখ্যা প্রায় নব্বই মিলিয়ান (ন' কোটি) এবং এদের শতকরা ৭৫ জনের উপযুক্ত খাদ্য জাপানে উৎপন্ন হয়। বাকি ২৫ জনের খাদ্যের জন্যে জাপানকে বৈদেশিক বাণিজ্যের লাভের উপর নির্ভর করতে হয়। এজন্য তাকে প্রতি বৎসর ৫০-৬০ কোটি টাকা খরচ করতে হয়। এ টাকাটা এখন কোত্থেকে আসবে? নিজের ঘরের তৈরীমাল বাইরের বাজারে পাঠান ছাড়া এ খরচ মেটাবার নান্য পন্থা।

কোরিয়া মরশুমের দিনে বিদেশে নিজের তৈরী মাল ছাড়বার প্রয়োজন জাপান একেবারে ভুলে বসেছিল। ঘরের বাজার তখন বেশ গরম ছিল, মাল তৈরী হোলে তখনই বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল। প্রতি ঘরের সিন্দুকে টাকা, প্রতিটি লোক ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘর-বাড়ী সংস্কারে আর নতুন আসাবাবপত্র কিনতে ব্যস্ত, কি দরকার জাপানের বিদেশী বাজারে মাল পাঠাবার ঝক্কি নিয়ে? ঘরের গরম-বাজারের জন্যে এবং আমেরিকান দরাজ বিধি-ব্যবস্থায় মালের দামও চড়ে গেছে, ঐ চড়া-দামে বিদেশের বাজারে কে জাপানী মাল কিনবে? ফলে দরকার থাকলেও বিদেশের বাজার জাপানী মাল কিনতে টাল-বাহানা শুরু করেছে। যেখানে যুদ্ধের পূর্বে জাপানী-মালের একচেটে অধিকার ছিল, সেখানে বিলেতি ও জার্মেন মাল এসে পড়েছে।

এ ছাড়া রাজনৈতিক কারণেও জাপানী মাল অচল হয়ে পড়বার উপক্রম হয়েছে। এশিয়ার যে বিরাট ভূ-খণ্ড চীন যুদ্ধের পর জুড়ে বসেছে সেখানে ব্যবসাতে অনেক সুযোগ সুবিধা থাকলেও জাপান যেতে ভয় খায় পাছে আমেরিকা বাধা দেয় বা চটে যায়। অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো যাদের প্রভূত ক্ষতিসাধন জাপান যুদ্ধের সময় করেছে তাদের

ক্ষতিপূরণ দাবী—এক ব্রহ্ম ছাড়া—মেনে নিতে বা মিটমাট করতে অক্ষম হওয়াতে সেখানেও ব্যবসা-বাণিজ্যের পূর্ণ সুযোগ * গ্রহণ করা অসম্ভব। এদের মধ্যে কেবলমাত্র ভারতবর্ষই জাপানের উপর ক্ষতিপূরণ দাবী ত্যাগ করে মিত্রতা-সূত্রে চুক্তি করেছে। এজন্যে ভারতবর্ষের প্রতি জাপানের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। কিন্তু ভারতেও শিল্প সমৃদ্ধি বাড়ানর জন্যে পূর্বেকার মত জাপানী মালের বিশেষত বস্ত্রের অবাধ বাণিজ্য-সম্ভাবনা অনেক সংকুচিত।

যুদ্ধোত্তর কালে জাপানী তৈরী মালের বাজার অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশে গিয়ে পড়ল, অথচ তার কাঁচা মাল কিনতে হচ্ছে অধিকতর ধনী দেশ থেকে। একদিকে আমেরিকা বা কানাডা থেকে জাপানকে চড়া দামে কাঁচা মাল কিনতে হচ্ছে অন্যদিকে কোরিয়া, তাইপে (ফরমোজা), ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার মত গরীব দেশে তৈরী মাল বিক্রী করবার আশায় ছুটে যেতে হচ্ছে।

জাপান পূর্ব থেকেই বাজারের এই অবস্থার দিকে কেন দৃষ্টি দেয়নি স্বতই এ প্রশ্ন মনে ওঠে এবং আমাদেরও তাই মনে হয়েছিল। কেন কোরিয়া মরশুমের দিনে জাপান তার বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে উদাসীন হয়ে কেবল ঘরোয়া বাণিজ্য নিয়েই ব্যস্ত থাকল? এ প্রশ্ন জাপানী সমালোচকদের মত আমরাও এই শিল্পপতিদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম সেই ওসাকা বৈঠকে।

জাপানী সমালোচকেরা যোশিদা সরকারকে এই অপরাধের কথা স্মরণ করিয়ে বিশেষভাবে তখন অভিযুক্ত করতে ব্যস্ত ছিলেন। তাদের মত হোল যে যোশিদা সরকার কোরিয়া যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত অর্থের কেবল ছিনিমিনি করেছে। শুধু গাদাগাদি নিত্য ব্যবহারের পণ্য উৎপাদনে আর বিরাট বিরাট অট্টালিকা বানিয়ে সে অর্থের অপচয় করা হয়েছে বলে যোশিদা সরকারকে এসব সমালোচকেরা দোষী করেছেন। তাদের মতে সরকারের কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছিল না বা যুদ্ধোত্তরকালে যে জাপানী সস্তা ও হাল্‌কা পণ্যদ্রব্য

বা মান্ধাতা আমলের বাণিজ্য নীতি যে চলবে না এ খেয়ালই তাঁদের মাথায় আসে নি। যুদ্ধোত্তর কালে জাপানের যে নতুন বাণিজ্য-নীতির ভিত্তি স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন ছিল এবং নিত্য ব্যবহার্য পণ্য আর হাল্কা বস্ত্র ও কল-কব্জা উৎপাদন ছেড়ে দিয়ে গুরু শিল্পের দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল এ কথাটি ঐসব সমালোচকেরা জোরে উল্লেখ করে আসছিলেন।

যখন যোশিদা সরকারের বিরুদ্ধে এই সব সমালোচনার কথা ক্যাবিনেটের মেম্বারদের কাছে আমরা উঠিয়েছি তখন উত্তর পেয়েছি কিন্তু অন্য রকম। তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করেছিলেন যে অর্থের সম্যক ব্যবহার করা হয় নি। একজন ক্যাবিনেট মিনিষ্টার (ওকাজাকী) বল্‌লেন "যা করা হয়েছে তা না করে উপায়ই ছিল না। আজকে আপনারা ধারণাই করতে পারবেন না যুদ্ধের ঠিক পরে পরেই জাপানে কি অবস্থা এসেছিল! নিঃস্ব মানুষ, বাড়িঘর ধ্বংস, ফ্যাক্টরী ও কল-কারখানা ভস্মীভূত, চিন্তা ভারাক্রান্তেরা দলে দলে বিধ্বস্ত টোকিও ও অন্যান্য শহরে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রপার হতে জাপানী রিফুইজীরা এসে পড়ছে, যারা বংশ বংশ ধরে কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও চীনে বসবাস করে আসছিল। সে কী অবস্থা! মানুষের মনে বিশ্বাস না জাগিয়ে তাদের দেহের, চোখের ও কানের পরিতৃপ্তির জন্যে এবং বিশেষ করে অতি সহজে যে সব মাল উৎপাদন করা যায় সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে যুদ্ধোত্তরকালে কি বাণিজ্য নীতি বা উপায় গ্রহণ করা উচিত তা চিন্তা করবারও সময় তখন ছিল না।"

যোশিদা সরকারের বিরুদ্ধ-পক্ষেরা কিন্তু এই কৈফিয়ৎ স্বীকার করেননি। তাদের কাছে সরকারের বক্তব্য পেশ করাতে উত্তর পেয়েছি ঠিক উল্টো। তাঁরা উত্তর দিয়েছিলেন পশ্চিম জার্মেনীর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে। জার্মেনীও ঠিক একই অবস্থার সামনে পড়েছিল, তারাও আমেরিকার সাহায্য পেয়েছিল কিন্তু সে সাহায্য নিয়ে এই

যুদ্ধোত্তরকালের উপযুক্ত শিল্প গড়ে তুলতে মনোনিবেশ করেছিল। নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য-প্রস্তুতি জার্মেনীর পুনর্বাসন কর্মতালিকায় একদম শেষের দিকে স্থান পেয়েছিল—বললেন তাঁরা।

রাজনৈতিক দলগুলির এই বাণিজ্য-নীতি নিয়ে উত্তর ও প্রত্যুত্তর ওসাকার শিল্পপতিদের কাছে উত্থাপন করলে যে উত্তর পেলাম তা অনেকটা 'ধরি মাছ না ছুই পানি' গোছের। শিল্পপতিরা বললেন যে যোশিদা সরকার এখন বিদ্যুৎ, লোহা ও ইস্পাত, ভারী-শিল্প, জাহাজ প্রস্তুত প্রভৃতি শিল্পে টাকা খাটাচ্ছেন। যখন জিজ্ঞাসা করলাম যে বড় বড় বাড়ি ঘর, থিয়েটার, টেলিভিসন ষ্টেশন না বানিয়ে ঐ দিকেই তখন কেন টাকা ঢালা হয়নি তখন যে উত্তর পেলাম তাতে জাপানে যুদ্ধের ঠিক পর পরই কি অবস্থা ছিল তার খানিকটা সদুত্তর মিলল। শিল্পপতিরা বলেছিলেন যে জাপান যদি সেদিন কেবল ভারী শিল্পের দিকেই দৃষ্টি দিত, তাহোলে "সাধারণ গরীব জাপানীদের কমুউনিজমের খপ্পরে ঠেলে দেওয়া হত।"

যুদ্ধোত্তর কালে মাতব্বরেরা যে ভুল ভ্রান্তিই করুন না কেন আজ জাপান তার বিদেশী-বাজার সম্পর্কে অতি সচেতন। কিন্তু তার দুশ্চিন্তা সহজে যেতে পাচ্ছে না। তার প্রধানতম কারণ হচ্ছে যে জাপানের পূর্বেকার সামাজ্য ও বাজার আর নেই। খোলা-বাজারে প্রতিযোগিতায় মাল কেনা-বেচা করে তাকে চলতে হবে। তৈরীমালের দাম বেশি হোলে বাজারে চলবে না, বেশি-দামে কাঁচামাল কিনে কম-দামে সরকারী সাহায্যে ছাড়বার বা ঢেলে (dump) দেবার ক্ষমতাও আজ সীমাবদ্ধ। অপর দিকে তৈরীমাল সস্তাদরে বিদেশের বাজারে চালাতে হোলে ঘরের শ্রমিককে কম পারিশ্রমিকে সন্তুষ্ট রাখা আজকের জাপানে ও আমেরিকার অকুপেসনের পর অবাস্তব। এসব কারণে জাপানে বর্তমানে দুটো বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করতে হয়েছে। এর একটা হোল জাতীয় শিল্প এমন কতকগুলো ক্ষেত্রে গড়ে তুলতে

হবে যাতে বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারা যায় এবং ঐ সব শিল্প সরঞ্জাম উৎপাদন ব্যয়ও অপেক্ষাকৃত কম হয়। যুদ্ধোত্তর কালে এশিয়ায় নতুন আশার ছোয়াচ প্রায় প্রতিটী দেশেই লেগেছে। প্রতিটী দেশই শিল্প সমৃদ্ধি বাড়ানর জন্য উদগ্রীব, আর পূর্বেকার মত কেবল মাত্র কাঁচামাল সরবরাহে সন্তুষ্ট নয়। অতএব জাপান দৃষ্টি দিতে আরম্ভ করেছে সেই সব যন্ত্রপাতি বানাতে যা প্রতিটী দেশেরই শিল্প গড়ে তুলতে একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। কাপড়ের বাজার বা সাবানের বাজার বা খেলনার বা সাইকেলের বাজার যাতে যুদ্ধের পূর্বে জাপান এ এলাকায় একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে এসেছে আজ সেখানে তার প্রতিদ্বন্দ্বী এসে জুটেছে। এমন কি ভারতবর্ষের কাপড় রপ্তানীও ম্যানচেষ্টারের মত জাপানও ভয়ের চোখে দেখ্‌ছে। সে বুঝতে পেরেছে এসব ব্যবসায়ে তার আর কোন ভবিষ্যৎ নেই। সেজন্য কাপড় কলের যন্ত্র, ইঞ্জিন তৈরীর যন্ত্র, জাহাজ তৈরীর যন্ত্র, জলবিদ্যুতের যন্ত্র (Turbine) ইলেকট্রিক তার, মোটর ও নানাবিধ অস্ত্র ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রভৃতি বানাতে আজ জাপান উদ্যোগী। সে জানে যে এশিয়ার দেশগুলি থেকে এসব ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আসতে এখনও অনেক দেরি আছে। আমরা স্বচক্ষে জাপানের এই নতুন বাণিজ্যনীতির রূপায়ন নানা বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানে দেখেছি।

এদের মধ্যে ছিল বিরাট তোসিবা বিদ্যুত শিল্প-কারখানা, নেসেম মোটর কারখানা, সুমতমো বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানা, ইয়াতা লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা, আসাহী কাঁচ-শিল্প কারখানা ও দাইনিপ্পন জাহাজ তৈরীর কারখানা। এদের কোনো কোনোটীর উৎপন্ন পণ্যের উৎকর্ষ ইতিমধ্যেই এশিয়াতে রেকর্ড স্থাপন করেছে এবং কারখানায় ঢুকলে সেইসব রেকর্ডের কথা যে কোন দর্শকের দর্শনীয়

বন্ধ হয়ে পড়ে। পশ্চিমী গোষ্ঠীর ঈর্ষা ও একঘরে করে রাখার ষড়যন্ত্র অগ্রাহ্য করে জাপান যে মনোবল ও যান্ত্রিক-কলা-কৌশলের সাহায্যে পৃথিবীর যান্ত্রিক অগ্রগতির সঙ্গে পা ফেলে চল্‌ছে তার পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। এদের যন্ত্রপাতির খরিদ্দার-গোষ্ঠীর নামের তালিকায় লেখা আছে ভারতবর্ষের দামোদর ভ্যালী করপোরেশন, ভাকরা নাঙ্গাল প্রভৃতির নাম। জাপান প্রতি-যোগিতায় জয়লাভ করেছে। আনন্দের সঙ্গে জাপানকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম, মনে মনে অনুভব করলাম সেই অনাগত ভবিষ্যতের দিনের কথা যেদিন ভারতবর্ষের কারখানাগুলিতেও এই রকম বৈদেশিক নাম লেখা দেখা যাবে।

কিন্তু এ অসাধ্য সাধন করেও জাপান অস্বস্তি হতে পরিত্রাণ লাভ করতে পারছেনা কেন? প্রশ্নটা বিশেষভাবে মনে পড়ল কোরিয়া প্রণালীর উপকূলস্থিত বিরাট ইয়াতা লৌহ ও ইস্পাতের (Yawata Iron and Steel Company) কারখানাটী দেখে। কারখানাটি আদর্শ জায়গায় গড়ে তোলা হয়েছে এবং এইটাই জাপানের আদি লোহার কারখানা। একদিকে ভূখণ্ড ও পাশেই সমুদ্র, মাল তৈরী ও পাঠানর সুন্দর ব্যবস্থা যেন প্রকৃতিই জাপানের জন্যে করে রেখেছে।

জাপানী-চায়ে চুমুক দিতে ও পুস্তিকার পাতা উল্‌টাতে লাগলাম। দেখলাম গত শতাব্দীর অন্তে যখন জাপান সবে যন্ত্রযুগে পা বাড়িয়েছে তখন এই কারখানার মূল যন্ত্রপাতি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জার্মেনী থেকে এনে এখানে বসানো হয়। সেই সঙ্গে এসেছিল জার্মেন-বিশেষজ্ঞের দল জাপানী শ্রমিককে লোহা তৈরীর কৌশল শেখানর জন্য। পরে ধাপে ধাপে কারখানা বাড়তে লাগল। এ উন্নতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ছিল এক একটা যুগান্তরকারী ঘটনার, যেমন চীন-জাপানী যুদ্ধ, রুশ-জাপানী যুদ্ধ, মাঞ্চুরিয়া-গ্রাস যুদ্ধ, প্রথম মহাযুদ্ধ প্রভৃতি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ-অধ্যায়ও এইখানে এই ইয়াতা কারখানার প্রতিটী

যন্ত্রে লেখা রয়েছে। কেবলমাত্র এই কারখানায় বসে সে অধ্যায় সুন্দর-ভাবে অধ্যয়ন করা যায়—যেমন পালল শিলাস্তর থেকে বিজ্ঞানী পৃথিবীর ইতিহাস অধ্যয়ন করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে যখন জাপান মাঞ্চুরিয়া অভিযান চালাতে পশ্চিমী গোষ্ঠীর বিরাগভাজন হয়ে পড়েছে, তখন জাপানের একমাত্র চিন্তার কারণ হয়ে পড়েছিল লোহার কাঁচামালের (অর্থাৎ আকরিক লৌহ) সরবরাহ বজায় রাখা। সে মাঞ্চুরিয়াতে গড়ে তুলল সোয়া লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা। তার আশা ছিল মাঞ্চুরিয়া চিরদিনই তার কুক্ষিগত থাকবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অপরাহ্ণে তার সে আশা দুরাশায় পরিণত হোল। মাঞ্চুরিয়ার সোয়া কারখানা থেকে কাঁচা ও অল্প শিল্পে-পরিণত লৌহ ইয়াতায় আনবার জন্য জাপান সেদিন মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেও যোগান রক্ষা করতে পারেনি। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে-এর মধ্যেই ইয়াতার কলগুলো বিকল হয়ে উঠল, উৎপাদন বন্ধ হয়ে আসতে লাগল কাঁচামালের অভাবে, এবং ইয়াতার কারখানার শ্রমিক ও মালিকেরা সবচেয়ে আগেই বুঝতে পারলেন যে জাপানের আত্ম-সমর্পণের দিন আগত। সে দিন যতটা দূরে রাখা যায় তার জন্য জাপান চেষ্টা করেছে আপ্রাণ। বাইরের কাঁচালোহা আমদানী বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে জাপানের ইস্পাতের যোগান রক্ষা করবার চেষ্টা যে কত ব্যাপক ও তীব্র হয়েছিল—তা জাপানের শহর ও পল্লী অঞ্চলে ঘুরে আমরা বুঝতে পারলাম। পার্কে পার্কে পাথরের তৈরী জাতীয় নেতাদের মুর্তিগুলো সবই ঠিক আছে। কিন্তু নেই সেইগুলো যা পিতল বা অন্য ধাতুতে প্রস্তুত হয়েছিল। জাতীয় প্রয়োজনে সেদিন জাপান জাতীয়-স্মৃতি বিসর্জন দিতে কার্পণ্য করেনি। তার হাত কাঁপেনি। অতীতকে মুছে ফেলতে তার একটুও কষ্ট হয়নি ভবিষ্যৎ বজায় রাখতে।

ইয়াতা পুর্ণগতিতে আজকে পুনরায় পূর্বাপেক্ষা অধিকতর কর্ম ক্ষমতা নিয়ে এগিয়ে চলেছে জাপানের, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এবং

ভারতবর্ষের পুনর্গঠন কাজের সহায়তায়। সে কাজ নিজের বা এসব দেশের সামরিক শক্তি যোগানের জন্যে নয়—জীবন যাত্রার মান বাড়াবার কাজে। সে সব লোহা-লক্কর তৈরী হচ্ছে দেখলাম ও যে সব দেশে ঐসব মাল যাচ্ছে তার তালিকা হাতে পেলাম। ভারতবর্ষের নাম রয়েছে সে তালিকার শীর্ষে। ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার নিজে পরীক্ষা করে পাশ করে দিচ্ছেন সে ইস্পাত-পণ্য। ইয়াতার নূতন লক্ষ্য বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকতে পারেনা। কিন্তু এই লক্ষ্য ঠিক রাখা বা না রাখা কি জাপানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে?

কথায় কথায় জানলাম জামসেদপুরের টাটার কারখানার পরিচালকদের সঙ্গে এরা সুপরিচিত। সে কারখানা সম্পর্কে ওঁদের কোনো বক্তব্য আছে কিনা প্রশ্ন করায় উত্তর এল যে ইয়াতা যখনই কিছু জানতে চেয়েছে টাটার কর্তৃপক্ষ সাদরে সে সুযোগ দিয়ে এসেছেন। এমন ধারা সহযোগিতা এঁরা ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোনো দেশ থেকে সচরাচর আশা করেন না। কথাটা ভাল লাগল তাই জামসেদপুরের বিষয়ে অন্য কোনো বক্তব্য আছে কি না পুনরায় প্রশ্ন করলাম। ভদ্রলোক এবারও অনুরোধটা রাখলেন এবং বললেন যে জামসেদপুর দেখে তাঁদের কেবলই মনে হয়েছে, অত লোক সেখানে কেন কাজে নিয়োগ করা হয়।

কারখানাটী দেখে আসবার পর পরিচালককে জিজ্ঞাসা করলাম, যে ইয়াতার আধুনিকীকরণের জন্য (rationalisation) নিশ্চয়ই লোক-ছাঁটাই করতে হয়েছে এবং আজ যেখানে মানুষের সাহায্যে ইস্পাত তৈরী হচ্ছে সেখানে ভবিষ্যতে যন্ত্রের সাহায্যেই সেগুলো তৈরী করা হবে? ভদ্রলোক উত্তরে জানালেন "তাতো হবেই। আমরা যদি রেশানালাইজেসন না করি, তা'হোলে মাল তৈরীর কাজ সস্তায় হবেনা এবং বাজারে প্রতিযোগিতায় টেকা কঠিন হবে। তাতে লোকছাঁটাই করতেই হবে এবং আরও আধুনিক-যন্ত্রপাতি বসাতে হবে যন্ত্রের সাহায্যে মাল তৈরীর জন্য। আমরা যদিই বা না করি, আমাদের

প্রতি-পক্ষেরা ত চুপ করে বসে থাকবে না!" ঠিক কথা, কিন্তু প্রতি-যোগিতার ত নিরসন হবেনা, কেবল ক্রমাগত নির্মমই হয়ে চলবে। সে মানবতাহীন পশুধর্মী প্রতিযোগিতার জন্যে যেমন একদিকে কারিগরকে যত কমে পারা যায় সেই মজুরিতে রাখবার চেষ্টা চলবে, অপর দিকে আধুনিকতম যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে সেই কারিগরকে যতদূর সম্ভব কারখানা থেকে বিদায়ও দেওয়া হবে। এবং যত সস্তায় সম্ভব মাল ছাড়া যায় বিদেশের বাজার আকড়ে ধরবার জন্যে তারও চেষ্টা করা হবে।

কিন্তু যখন সে চেষ্টাও বিফল হয়ে যাবার উপক্রম হবে তখন ভদ্রতার খোলস আপনা থেকেই খসে পড়বে না কি এবং সনাতন দ্বিপদ হিংস্র জীবটি অস্ত্রের সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে কেল্লা ফতে করবার জন্যে? বাজার তার চাই-ই, নইলে সে যে টিকতে পারে না। ইয়াতার অতীত এবং যে ভবিষ্যৎ এখনই দেখা দিয়েছে তাতে এই কথাটিই কেবল মনে হয়েছে যে, আর কতদিন এই বিরাট সমৃদ্ধির কর্মশালা মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে? কতদিন নিজের ও অন্যান্য দেশ গঠনের মহা-প্রচেষ্টায় ইয়াতার ইস্পাত ব্যবহৃত হবে? কতদিন ঐ লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে জাপান এগুতে পারবে বা তাকে এগুতে দেওয়া হবে?

ওয়াগ্‌লে ইঙ্গিত করলেন, ইয়াতা তা'হোলেও জাপানেরই বৃহত্তম ইস্পাতের কারখানা! কর্তৃপক্ষ উত্তরে আমাদের ধারণা ভেঙে দিলেন। ইয়াতা প্রাচ্যের সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম ইস্পাত প্রতিষ্ঠান।

তবুও প্রশ্ন করলাম, ভবিষ্যতে ভারতের দিক থেকে জোর প্রতি-যোগিতার আশংকা নেই কি? "অবশ্যই আসবে"—উত্তর এল দ্বিধাহীন স্বরে। তবে সে প্রতিযোগিতা দেখা দেবে কেবল লৌহপিণ্ড-এর (pig iron) ক্ষেত্রে। ইস্পাতের বেলায় ভারতের প্রতিযোগিতা এমন গুরুতর হবার সম্ভাবনা তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন না। জাপানে একদল বিশেষজ্ঞ আছেন যাঁদের দৃঢ় মত হচ্ছে যে কাঁচা মালের

(iron ore) অভাব জাপানের ইস্পাত শিল্পের পক্ষে অন্তরায় নয়। ওকাজাকীকে যখন প্রশ্ন করা হোল যে ঔপনিবেশিক বাজার না থাকলে কি করে জাপানী শিল্পে পুনর্জীবন ফিরে আসবে, তখন তিনি আমাদের জানিয়েছিলেন যে কাঁচামাল এখন এশিয়া ও এশিয়ার বাইরের দেশগুলি হতে বেশ যোগান পাওয়া যায়। স্থানের দূরত্ব অবশ্য বেশি, সেজন্য খরচাও বেশি হবার সম্ভাবনা। কিন্তু জাপানী জাহাজ আজ পূর্বাপেক্ষা দ্রুততর পাড়ি দিতে পারে, সেজন্যে দূর বাণিজ্যের পক্ষে কোনো অন্তরায় নেই। মাল আনার ভাড়াও দামের সঙ্গে সমতা রাখতে পারে, সেজন্যে খরচাও গায়ে লাগে না বা লাগবে না, কারণ অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতিই হবে, অবনতি নয়।

এ ছাড়াও আর একটা মতের পরিচয় পেয়েছিলাম। সেটা হচ্ছে জাহাজ ও রেলের ভাড়ার অসমতা। দক্ষিণ ভারতে লৌহ-পিণ্ড আছে, কয়লা নেই; অতএব দক্ষিণ ভারত থেকে লৌহ-পিণ্ড বা উত্তর ভারত থেকে কয়লা রেলপথে নিয়ে ইস্পাত তৈরী করতে যে খরচা পড়বে জাপান তার চেয়ে সস্তায় জাহাজে লৌহ ও কয়লা ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে ইস্পাত তৈরী করে যোগান দিতে পারবে বলে আশা রাখে।

কিন্তু জাপানের এই আত্মতৃপ্তির মূলে আছে বিজ্ঞানের শেষ পরিণতির একটা আবছা ধারণা। দক্ষিণ ভারতের চূন-কয়লাকে (lignite) কাজে লাগানর ও যাতায়াতের মাল-গাড়ীর ভাড়া কমানর অর্থ নৈতিক অক্ষমতা যেন্ কোনোদিনই অপসারিত হবে না। অপর পক্ষে এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে জাপানের নির্বিরোধ শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যৎ বাণিজ্যের উপর দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু যখন জরুরী অবস্থা এসে পড়ে— তখন? সে অবস্থায় জাপান কি করবে? ইয়াতার অতীত ইতিহাস কি বলে? মাঞ্চুরিয়ার সোয়া কারখানার মাল এত কাছে থাকলেও জরুরী অবস্থায় ইয়াতায় ত আসতে পারেনি!

জাপানে পৌঁছেই আমরা চারটি কথা হামেসাই পথে ঘাটে শুনতে

পেয়েছিলাম। সেগুলো হচ্ছে—গামবাত্‌সু (Gumbatsu) অর্থাৎ যুদ্ধগোষ্ঠী, মটসাত্‌সু (Motsatsu) জমিদার-গোষ্ঠী, জাইবাত্‌সু (Zaibatsu) পুঁজিপাতি-গোষ্ঠী ও কামবাত্‌সু (Kambatsu) আমলা-গোষ্ঠী। এই চারটী গোষ্ঠীরই জন্ম হয়েছিল মেইজী (Meiji) সংস্কার-যুগে। যে সব গোষ্ঠী সোগান-মন্ত্রীদের তাড়িয়ে দিয়ে সম্রাটকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিল তাদেরই আদর করে ঐ সব নামকরণ করা হয়েছিল।

এদের মধ্যে বিশেষ করে মটসাত্‌সু ও জাইবাত্‌সু গোষ্ঠীদের কথাই যে কোনো আলোচনায় উঠত। সম্রাটকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে এঁরা দেশের জমি, অরণ্য-সম্পদ এবং অন্যদিকে শিল্প ও শিল্প-জাত দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী করবার একচেটিয়া অধিকার আদায় করে নিয়েছিল। প্রাচীন জাপানের সামুরাই-গোষ্ঠী এদের আবির্ভাবে কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিল সেদিন। এঁদের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি জাপানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পরিণতির দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

জেনারেল ম্যাক-আর্থারের দখলী বাহিনী জাপানে খুঁটী গেড়ে বসেই এই "বাত্‌সু" পদার্থগুলোকে উৎখাত করতে উঠে-পড়ে লাগল। জমিদারগোষ্ঠী উচ্ছেদ করা সহজ হোল। গোটা জাপানের চাষের জমি চাষীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হোল। জাপানের মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ কেবল চাষের উপযোগী জমি, যদিও মোট চাষী-সংখ্যার অনুপাতে ঐটুকু জমি বিশেষ বেশি নয় তবুও যুগ-যুগান্তর ধরে বঞ্চিত জাপানী চাষী এই জমি অর্পণের জন্যে জেনারেল ম্যাক-আর্থারকে চিরকাল স্মরণ করবে। বাকী ৭৫ ভাগ অনাবাদী বা বন-সম্পদের জমি কিন্তু চাষীর হাতে যায়নি। আমরা কয়সু দ্বীপে বেড়াবার সময় একরাত্রি ম্যাক-আর্থারের দ্বারা তাড়িত এক জমিদারের দেশের বাড়িতে থাকবার সুযোগ পেয়েছিলাম। জাপানী-জমিদার ও আমাদের জমিদার বা রাজ-রাজড়াদের বসবাসের ধরণ-ধারণের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান ছিল তা' লক্ষ্য করতে পেরেছিলাম সেদিন।

পুরনো জমিদার-শ্রেণীই পশ্চিমী-প্রথার সবরকমে বিরোধী ছিলেন, যেমন ছিলেন আমাদের জমিদার-শ্রেণী স্বদেশের সামাজিক উৎসবাদি রক্ষা-কল্পে। বর্তমানে সে জমিদার-গৃহটীকে ক্লাবে পরিণত করেছেন স্থানীয় বিভিন্ন কারখানার ম্যানেজার বা উপরের চাকুরে-ওয়ালারা। তাঁরা জমিদার-কুঠিটির বাইরের রূপ অবশ্য ঠিকই রেখেছেন কিন্তু যেখানে হয়ত একদিন গায়শা-নাচওয়ালীর নাচ ও কীর্তনে অথবা জাপানী শিল্পীর তুলির আঁচড়ে গোটা কুঠিটী লাস্যমুখর বা স্বপ্নে কোমল হয়ে পড়ত আজ সেখানে কেবল সন্ধ্যায় কারখানার ম্যানেজারেরা মিলিত হয়ে বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বাজারের কথা পেড়ে থাকেন।

ম্যাক-আর্থারের উদ্যত মুষ্টির সামনে জাপানী জাইবাত্সু গোষ্ঠীও দাঁড়াতে পারল না। আইন হোল—"অর্থনৈতিক ক্ষমতার অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণের অবসান।" জাইবাত্সু-গোষ্ঠী ধ্বসে পড়ল, কেউ কেউ জেলে স্থান পেল, বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান যেগুলো কয়েকটী পরিবারের নামে পৃথিবীর সর্বত্র পরিচিত ছিল তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হোল।

জাপানে যেদিন জাইবাত্সু বিলোপ আইন প্রয়োগ করা হয়েছিল সেদিন যে ত্রাস দেখা দিয়েছিল, তার সঙ্গে কেবলমাত্র যুদ্ধে পরাজয় কাহিনীরই তুলনা চলে। এসব বিরাট বিরাট শিল্প-পতিরা যারা বংশ বংশ ধরে নিজেদের অভিজ্ঞতা দ্বারা যে কোনো আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সমস্যা অগ্রাহ্য করে ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি অব্যাহত রেখেছেন তাদের অবর্তমানে সে সব প্রতিষ্ঠানের কি ভবিষ্যৎ সে চিন্তায় কেবল জাইবাত্সু-গোষ্ঠী নয়, তাদের আশ্রিত আমলা ও শ্রমিক এবং তাদের দ্বারা পুষ্ট ও তাদের সমর্থক পণ্ডিত-শ্রেণী একেবারে হতাশায় অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

ম্যাক-আর্থারের মন যখন এসব প্রার্থনায় আর্দ্র হোল না, জাপানে চিরকালের জন্য যুদ্ধ-রসদের ও উৎসাহের দ্বার বন্ধ করতে যখন

তাঁকে একান্ত দৃঢ়বদ্ধ দেখা গেল, তখন তাড়াতাড়ি জাইবাত্‌সু-গোষ্ঠী এসব শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অংশ বেনামীতে হস্তান্তরিত করে দিল তাদেরই আশ্রিত ও সমর্থক আমলাদের মধ্যে। জাইবাত্‌সু-গোষ্ঠী অপসারিত হলেও জাইবাত্‌সু-কাঠামো ম্যাক-আর্থারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে জীবন্ত চ্যালেঞ্জ-এর মত দাঁড়িয়ে থাকল।

ম্যাক-আর্থারী অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে। বহির্বাণিজ্যে জাপান এগুতে শুরু করেছে। কোরিয়া মরশুম কিন্তু আর নেই। ধ্বংস-প্রাপ্ত কারখানা গুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে যে অর্থ বা মাল পাওয়া উচিত তা অনেকানেক কারণে সে পরিমাণে আসছে না। দাবী শোনা যাচ্ছে মুদ্রামূল্য হ্রাস-নীতি বলবৎ করবার জন্যে। যে বেকারী অবস্থা থেকে জাপান রক্ষা পেয়েছিল যুদ্ধ-পরাজয়ের পর কেবলমাত্র কোরিয়া মরশুমের জন্যে তা সমাজ-জীবনে আবার দেখা দিয়েছে। নতুন ও ছাঁটাই চাকুরী-অন্বেষীরা শহরে শহরে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করেছে। আওয়াজ উঠেছে জাইবাত্‌সু-গোষ্ঠীর বিলোপেই দেশের এই সর্বনাশ। জিম্মেদারেরা জোর করে জাপানের ঘাড়ে শ্রমিককে তার উপযুক্ত মজুরীর ও ছুটীর ব্যবস্থা করে দায় বাড়িয়েছে যাতে জাপান প্রতিযোগিতায় হটে যায়।

সুযোগ্য ও অভিজ্ঞ জাইবাত্‌সু-গোষ্ঠী অপসারণের ফলেই যে সেদিন জাপানে সাময়িক দুর্দশা দেখা গিয়েছিল একথা এসব বড় বড় প্রতিষ্ঠানের বর্তমান কর্তা-ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর মেনে নেওয়া কঠিন হয়েছিল আমাদের পক্ষে। জাপানে অন্যান্য বৈদেশিক সাংবাদিকেরাও স্বীকার করেননি যে নতুন কর্তৃপক্ষ পুরনো জাইবাত্‌সু অপেক্ষা অপরিপক্ক। সেদিন জাপানে যে অবস্থা এসে পড়েছিল তার মধ্যে ঝানু জাইবাত্‌সু-গোষ্ঠী পড়লেও শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনই তারতম্য দেখা যেত না বলেই তাঁদের ও আমাদের বিশ্বাস হয়েছিল।

জাপানের শিল্প বা বাণিজ্যের বিষয় আলোচনায় একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন। যা'কে বলা হয় শিল্প ঐতিহ্য (tradition) তা' মেইজী সংস্কার যুগ থেকেই সেখানে সুদৃঢ় ও ব্যাপক আকারে রচিত হয়ে গেছিল। সুদক্ষ শিল্পশ্রমিকের অভাব সেখানে নেই। এরূপ পত্তন হওয়াতে যেমন আশানুরূপ শ্রমিকের (skilled labour) যোগান হয়, তেমনি মেলে সুদক্ষ ম্যানেজার শ্রেণী। কোনটিরই অভাব সাধারণতঃ হয় না। অবশ্য কোনো বিশেষ-প্রকারের শিল্পের অপ্রত্যাশিত ভাবে মরশুম দেখা দিলে একটু আধটু বিশৃঙ্খলা সাময়িক ভাবে দেখা দিতে পারে, কিন্তু সে অবস্থা সাময়িক মাত্র। শ্রমিক ট্রেনিং ও ম্যানেজার ট্রেনিং-এর ধারা এমন ভাবে রচিত হয়েছে যে সহসা যোগানে টান পড়বে না। স্কুলে ছেলে মেয়ে যখন পড়তে যায় তখনি তার ভবিষ্যৎ জীবনে সে শ্রমিক অথবা আমলা হবে তার উপযোগী শিক্ষার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। আমাদের দেশের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা-বা বাণিজ্যের টেকনোলজীর উচ্চতম তখমা নেবার পরেও হাতে কলমে ট্রেনিং নেবার প্রয়োজন সেখানে হয় না।

জাইবাত্‌সু-শ্রেণীরও ট্রেনিং প্রায় অনুরূপ ছিল। যেটুকু বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে আছে, তা' একবারেই জাপানী বৈশিষ্ট্য। জাপানীরা আমাদের ও বোধহয় চীনেদের মত এখনও পরিবার-গত সামাজিক জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক। সেজন্যে বড় বড় জাইবাত্‌সু পারিবারিক গোষ্ঠীর একান্ত ইচ্ছে থাকে, যেন তাদের অবর্ত্তমানে পারিবারিক নামগুলো ব্যবসা ক্ষেত্রে অটুট থাকে। এ ইচ্ছে জাপানীদের মত আমাদের ব্যবসায়ী-শ্রেণীর মধ্যে ছিল ও এখনও আছে। জাপানে জাতভেদ নেই তাই সামাজিক আদান-প্রদান সেখানে সর্বস্তরের মধ্যে অনেকটা অব্যাহত আছে। তাই সেখানে মেইজী সংস্কার যুগ থেকে প্রতিটী জাইবাতস্যু পরিবারই স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নূতন প্রতিভার খোঁজ-খবর

রাখত। নিজে অপুত্রক বা মেয়ের পিতা হোলে সেই নূতন প্রতিভাটীকে কাছে টেনে ও আত্মীয়তার মধ্য দিয়ে পরিবারগত করতেন। কেবলমাত্র একটী সর্ত্ত নতুনকে মেনে নিতে হোত। সে সর্ত্ত হোল পরিণামে জাইবাত্‌সুর পারিবারিক নামটী সে গ্রহণ করবে। এ সর্ত্ত মেনে নিতে আপত্তি বড় একটা দেখা যায় নি, ফলে বংশানুক্রমে একই নামে জাপানী বাণিজ্য দেশ-বিদেশে অপ্রতিহত গতিতে চলে এসেছে। আমাদের দেশে দু'তিন পুরুষ পরে যদি কোনো পরিবারস্থ ব্যবসা লুপ্ত হয়ে যায় তার কারণ হোল যে আমাদের ব্যবসায়ী শ্রেণী ঠিক অনুরূপ-ধারায় সে সব ব্যবসায়ে নতুন-প্রতিভার যোগান রাখতে সক্ষম হন না।

ম্যাক-আর্থার যুগে জাইবাত্‌সু গোষ্ঠী লুপ্ত করে দেবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তা' সত্ত্বেও কাঠামোটী অক্ষুণ্ণ থেকে যায়। এ না হয়ে উপায়ও ছিল না। গোটা জাতীয় ব্যবসায়ে নিযুক্ত মূলধনের শতকরা ৬২ ভাগ ছিল বড় বড় চারটি জাইবাত্‌সু পরিবারের হাতে। তাঁরা হোলেন মিতসুই (Mitsui) মিতসুবিসি (Mitsubishi) সুমিতোমো (Sumitomo) ও যোশিদা (Yashida)। এদের প্রতিষ্ঠাতারা সকলেই ছিলেন মেইজী-যুগের হোমরা চোমরা। ভেঙে দিলে দেখা গেল যে বিরাট বিরাট প্রতিষ্ঠানগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল যাদের একটীর উৎপাদন-ধারার সংযোগ অন্যটীর সঙ্গে না থাকলে কেবল খরচাই বেড়ে যায়। পূর্বেকার জাইবাত্‌সু নীতিতে এ খরচা তেমন ধারায় বাড়তে পারত না। জাপানে শতকরা ৯৯টী শিল্প-প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র-শিল্পের পর্যায়ে পড়ে যার শ্রমিকের সংখ্যা ২০০ জনের বেশি হয় না। (employing less than 200 men) এদের মূলধনের যোগান সময়মত না থাকলে ভেঙে পড়ত। জাইবাত্‌সু-গোষ্ঠী জাতীয় মূলধনের দিকে লক্ষ্য রেখে গড়ে তুলেছিল এক নতুন ব্যবসা-নীতি যাতে মূলধনের অভাবে এসব শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো হঠাৎ

ভেঙে পড়তে দিত না। তাঁরা বড় শিল্পের সঙ্গে মাঝারি এবং মাঝারির সঙ্গে ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মূলধন ও মাল-উৎপাদনের যোগসূত্র গেঁথে দিয়েছিলেন। একটা উদাহরণ দিলেই এ ব্যবসা-নীতির বৈশিষ্ট্য ধরা যায়। আমাদের চিত্তরঞ্জনে ইঞ্জিন কারখানা আছে। এটা যদি জাপানী জাইবাত্সু ধারায় চালানো হোত তা' হোলে ইঞ্জিন তৈরীর সমস্ত কাজের শতকরা কেবল ৩০ ভাগ চিত্তরঞ্জনে করতে দেওয়া হোত ও বাকী ৭০ ভাগ চিত্তরঞ্জনের আশে পাশে মাঝারী ও ছোট ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠানে তৈরী করে এনে গোটা ইঞ্জিনটা বানান হোত।

ম্যাক-আর্থার চলে যাবার পর আইন বলবৎ থাকুক বা নাই থাকুক জাইবাত্সু কাঠামো আবার পুনর্জীবিত হয়ে উঠেছে অর্থনৈতিক চাপে। এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে দু' একজন খোদ জাইবাত্সু মালিকও এসে পড়েছেন। পূর্বে যেমন বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে ছোটদের সংযোগ ছিল আবার ধীরে ধীরে সে ধারা এসে পড়ছে। জাইবাত্সুদের কবল থেকে একমাত্র যা'কে বলা হয় কুটির বা গ্রামীণ শিল্প সেইটেই মুক্ত ছিল এবং বর্তমানেও এই প্রতিষ্ঠান গুলোই নতুন ও ক্রমবর্ধমান জাইবাত্সুদের লক্ষ্যের বাইরে আছে।

বর্তমান জাপানে খোলাখুলিভাবেই বলা হয়ে থাকে যে পৃথিবীর মুখ্য বাজারগুলো জাপানী-মালের কাছে ইচ্ছে করেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যদি না কোনো জরুরী সমস্যায় এ নীতি অচল হয়, যেমন হয়েছিল কোরিয়া-যুদ্ধের সময়, তবে জাপানী বহির্বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। জাপানের ভাগ্য সুপ্রসন্নই বল্‌তে হবে কারণ কোরিয়া-যুদ্ধের পরেও পৃথিবীর বাণিজ্য-সমস্যা রাজনৈতিক-সমস্যার মতই জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। এর সুযোগের সদ্ব্যবহার জাপান নিচ্ছে বৈকি। আজ তাঁর জাহাজ-শিল্প এমন সমৃদ্ধ যে সে আর অর্ডার অনুযায়ী যোগান দিতে পাচ্ছে না।

কিন্তু পৃথিবীর বাজারের অবস্থা তার চিত্তের অস্থিরতাই ডেকে

আনে। সে উদ্বেগ দূর করতে তার সোভিয়েটের সংগে চুক্তি। কিন্তু সোভিয়েটের চেয়েও জাঁপানের একান্ত প্রয়োজন চীনের বাজার। বারবার সে মহাচীনের বাজারের দিকে দৃষ্টি দেয় কিন্তু প্রতিবারই সমুদ্র-পারের বক্রচোখের চাউনিতে সে অগ্রসর হতে ভয় পায়। এ অবস্থা বেশিদিন চলতে পারে না অর্থনৈতিক কারণে। অবস্থার পরিবর্তন ইতিমধ্যে শুরুও হয়েছে। কিন্তু সে পরিবর্তনে যেমন বেড়েছে জাপানের অস্থিরতা তেমনি আমেরিকার বিড়ম্বনা। জাপানের প্রধানমন্ত্রী কিসির ও আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট আইসেন-হাওয়ারের যুক্ত বিবৃতি থেকে সে পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ রূপ ধরা যায়।

কোরিয়া যুদ্ধের গোড়ায় পশ্চিমী শক্তিগুলো প্যারীতে এক সম্মেলনে একজোট হয়ে ঠিক করে ফেলল যে অতঃপর তারা চীনের সঙ্গে বাণিজ্য যতটা সম্ভবপর গুটিয়ে ফেলবে। এক এক করে মোট দু'শ দ্রব্য-সংখ্যা চৈনিক বাণিজ্য তালিকায় নিষিদ্ধ করা হোল। ঠিক অনুরূপ ব্যবস্থাই ওরা পূর্বে নিয়েছিল সোভিয়েটের বেলাতেও। তবে সেক্ষেত্রে নিষিদ্ধ দ্রব্য-তালিকা ছিল ঢের কম।

সম্মেলনের সে সিদ্ধান্ত কিন্তু বহির্বাণিজ্যের উপর একান্ত নির্ভর-শীল ব্রিটেনের কাছে কেবল মনঃপূত হয়নি অযৌক্তিকও বলে মনে হয়েছিল। কারণ যে সব পণ্য-দ্রব্য চীনে নিষিদ্ধ হোল তার অনেকগুলোই থাকল অ-নিষিদ্ধ সোভিয়েট বাজারে। চীন ইচ্ছে করলেই সোভিয়েটের মারফৎ সেগুলো আমদানী করতে পারত। কিন্তু অযৌক্তিকই হোক অথবা সুযৌক্তিকই হোক আমেরিকার প্রতি তাকিয়ে ব্রিটেন তখন মেনে নিয়েছিল।

আজ ব্রিটেন হাইড্রোজেন বোমের অধিকারী। হয়ত তার অর্থনৈতিক কাঠামো আজ তত পরনির্ভরশীল নয় যেমন ছিল ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের প্যারী সম্মেলনের সময়। অথবা মধ্য প্রাচ্যে ব্রিটেনকে কোণঠেসা করবার যে চেষ্টা চলেছে তা' দেখে এবং বাণিজ্যে

ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করে ব্রিটেন আর চৈনিক বাজার অগ্রাহ্য করতে অনিচ্ছুক। সে বাজার চিরকালের জন্যে হাতছাড়া যাতে না হয় তাই ছিল ব্রিটেনের অন্যতম উদ্দেশ্য পিপল্‌স্‌ রিপাবলিক স্বীকার করতে।

কিন্তু বাণিজ্যের কোনো উন্নতি না হয়ে কেবল জটিলই হয়ে পড়ছে। অথচ পশ্চিমীদের বয়কট অগ্রাহ্য করে চীন আজ বহির্বাণিজ্যে পাঠাতে শুরু করেছে হালকা দ্রব্য-সম্ভার। হংকংএর বাজারে আজ ব্রিটিশ ও জাপানী বস্ত্র-শিল্পের সংগে প্রতিযোগিতা করে চৈনিক বস্ত্র-পণ্য। তবে কি হোল সে বয়কটের প্রতিফল?

ব্রিটেন সন্দেহমনা। আমেরিকার রাজনীতি ধার করে সে হারাতে রাজী হতে পারে না চৈনিক বাজার। তাই আবার যখন প্যারী সম্মেলন বসল এবং চীনা বাজারে পণ্য পাঠানর কথা উঠল তখন ব্রিটেন প্রস্তাব করল নিষিদ্ধ পণ্য-দ্রব্যের সংখ্যা কমিয়ে দেবার জন্যে। তিন সপ্তাহ ধরে আলোচনা চলল, আমেরিকা পূর্বের মত দৃঢ় চিত্ত দেখানতে এবার ব্রিটেন চুপ করে না থেকে একা একাই ঘোষণা করে দিল যে অতঃপর চীন-বাজারে সে রপ্তানী করবে সে সমস্ত পণ্যই যা' সে যোগান দিয়ে আসছে সোভিয়েট-বাজারে। আমেরিকা থমকে গেল সে ঘোষণায়। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল জাপান। প্রতিবাদ উঠল আমেরিকায়, কিন্তু ব্রিটেন অটল। ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা ধরে নিল যে বয়কট শিথিল করাতে তাদের চৈনিক বাণিজ্যের মূল্য উঠবে প্রায় ২৮,০০০,০০০ ডলারে।

ব্রিটেনের দেখাদেখি ফরাসী, জার্মেনী, ইতালি সকলেই ঠিক করে ফেল্‌ল যে তারাও ব্রিটেনের মত শিথিল করে ফেলবে চীন বয়কটনীতি। কিন্তু ব্রিটেনের থেকেও চীনা-বাজারের ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল জাপানের বুক ফেটে যায় তবুও মুখ ফোটে না। আমেরিকার দাক্ষিণ্য যেমন তার কাছে কাম্য ঠিক

তেমন ভাবেই তার কাম্য চৈনিক বাজার। অথচ সে বাজার সম্পর্কে ব্রিটেনের দেখাদেখি নিজের স্বার্থরক্ষার জন্যে যে ঘোষণা তার করা উচিত ছিল কেবল আমেরিকা কি মনে করবে এই ভয়ে তা' করতে পারে নি। যুদ্ধ-পূর্ব-কালে ব্রিটেনের মোট বহির্বাণিজ্যের শতকরা এক ভাগও হোত না চীনের সঙ্গে; আর সেখানে জাপানের মোট বহির্বাণিজ্যের প্রায় অর্ধেক যেত চীনে ও ফরমোজায়।

চীন-বাজার যে জাপানের কত প্রয়োজন তা' আমরা প্রতিটি শিল্পপতি বা রাষ্ট্রনেতার সংগে আলোচনায় ধারণা করতে পেরে-ছিলাম। যুদ্ধান্তে জিম্মেদারী থাকা অবস্থায় জাপান তাকিয়েছিল চীনের বাজারের দিকে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে তার চীনে যাওয়া-আসা শুরু হয়। কিন্তু ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমীদের পাল্লায় পড়ে সে হোল উদ্বিগ্ন। আমরা যখন জাপানে তখন জাপানী [illegible] কেমন করে চীনা বাজারের সাথে যোগসূত্র রাখা যায় তার খবরা-খবর নেবার জন্যে মূল ভূখণ্ডে প্রতিনিধি পাঠাতে আবার আরম্ভ করেছে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে এই সব বে-সরকারী জাপানী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রথম চীন-জাপান বেসরকারী বাণিজ্য চুক্তি হোল।

চীন-বাজার সম্পর্কে যে নতুন অবস্থার সৃষ্টি করল ব্রিটেন তার ফলাফল বিশেষ করে জাপানের উপর সুদূরপ্রসারী। আমেরিকা স্বেচ্ছায় জাপানকে হয়ত অনুমতি দেবে ব্রিটেনের মত চীনের ভূখণ্ডে বাণিজ্য করতে। কিন্তু তা' না দিলে জাপানের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী যাই ইচ্ছে করুন না কেন, চীন-বাজার তারই চোখের সামনে অপরের হাতে চলে যাবে এবং তার ভবিষ্যৎ বাণিজ্য-জীবন ক্ষুণ্ণ হবে এ অবস্থা জাপানের পক্ষে অসহনীয় হবে।

হয়ত চীন-বাজারকে সে অগ্রাহ্য করতে পারত যদি সে দেখত পৃথিবীর দরজা তার কাছে উন্মুক্ত। আমরা বার বার ক্যাবিনেট

মেম্বর ও শিল্পপতিদের নিকটে প্রশ্ন উত্থাপন করে এই মর্মার্থটুকু গ্রহণ করতে পেরেছিলাম যে চীন-বাজারের প্রতি জাপানের সমগ্র দৃষ্টি উন্মুখ হয়ে আছে। পৃথিবীর যেটুকু বাজার তার কাছে খোলা রাখা আছে তাও উচ্চ বাণিজ্য শুল্ক বা কমনওয়েলথ সৃষ্ট বাধা বশতঃ তা' জাপানের কাছে অতি সংকীর্ণ এবং জাপানের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ও পণ্যের পক্ষে একান্ত অপ্রচুর। জাপান কিছুতেই ঐ স্বল্প-পরিসরের মধ্যে আত্মবিকাশ করতে পারে না।

ওসাকায় শিল্পপতিদের সঙ্গে জাপান বাণিজ্যের কথা শুনে প্রশ্ন করেছিলাম এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। আজ অবশ্য অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, যেমন হয়েছে জাপানী জাহাজ-শিল্পে। ১৯৫২ সালের তুলনায় ১৯৫৬ সালে জাহাজী-শিল্প টনেজের ক্ষেত্রে বেড়ে গেছে প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ এবং দামে (value) বেড়েছে ৪৫ গুণ এবং ১৯৫৭ সালে এ শিল্পের আরও উন্নতি হবার নিশ্চিত সম্ভাবনা বর্তমান। জাপানী বিশেষজ্ঞদের মতে জাহাজী-শিল্পের মরশুম অন্ততঃ আরও তিন বৎসর চলবে।

কিন্তু তারপর? মরশুম থাকলেও আজ জাপানে ইস্পাতের অভাব দেখা দিয়েছে, দামও চড়ার দিকে। মরশুম বা মন্দা যেটাই আসুক না কেন জাপানী বাণিজ্য-চিত্তের অস্থিরতা—কোলোনিয়াল বা একচেটিয়া বাজারের অভাবে—ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

ওসাকায় একটা উত্তর যা' পেয়েছিলাম তা' মজার। তাকাহাতা বলেছিলেন যেন তেন প্রকারেন বাণিজ্য করতেই হবে। নীতিটাই বদলে ফেলে দেওয়া যায় কি না—সভয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তরে আর একজন শিল্পপতি বললেন—"সেটা কি?" পাল্টা প্রশ্নের সামনে পড়ে হাত গুটিয়ে প্রায় ইঙ্গিতেই বলেছিলাম—"বিনিময় (barter) পথটা কিরূপ?" তৎক্ষণাৎ উত্তর এল—"ওতে সাময়িক আরাম আসতে পারে, কিন্তু ওটা পথ নয়।"

হয়ত নয়। কিন্তু এই অনিত্য সংসারে ওরা কি চিরস্থায়ী সমাধানের কথা ভাবছে? তখনকার দিনে ব্যাঙ্ক অফ জাপানের সর্বময় কর্তা এইচ, ইচিমাদার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময়ও ঐ প্রশ্নটী পেড়েছিলাম। তিনি উত্তরে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা তুললেন। ন' কোটি জাপানীর ভবিষ্যত-স্থিতি যেমন জাপানের মাথা-ব্যথা তেমনি এশিয়ার অন্যান্যদেরও—বললেন তিনি। চমৎকার লেগেছিল ভদ্রলোকের কথাগুলো। জাপানী রাষ্ট্রনেতা, সাংবাদিক ও শিল্পপতিদের মধ্যে ইচিমাদাই নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গির কথা পাড়লেন এবং সে দৃষ্টি-ভঙ্গির সঙ্গে কার' অমিলও হতে পারে না। কিন্তু এখন যা' হোল জরুরী, তা' হচ্ছে বিলিতি, আমেরিকান, জার্মেনীর বাণিজ্য-চাপ ঠেলে ফেলে জাপানী শিল্পের পুনর্জীবনের প্রশ্ন। কি করে তা' সম্ভব? আলোচনার সুযোগ আবার এল। এবার খোলাখুলিভাবে ইচিমাদার মতামত জানতে চাইলাম। বললাম যে ব্রিটেনের মত জাপানী শিল্পও উপনিবেশের ভিত্তিতেই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে এসেছে। আজ যখন আগের মত জাপানী উপনিবেশ আর নেই তখন কি সেই আদি বাণিজ্য-ভিত্তিটাই বদলে দেওয়া উচিত হবেনা—জিজ্ঞেসা করলাম। প্রশ্নটীর সোজা উত্তর এল না। ইচিমাদা বললেন ভারত ও জাপানের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতার প্রয়োজনের কথা। পুনরায় প্রশ্ন করলাম কি করে জাপানী ও ভারতীয় শিল্প পাশা-পাশি টিকতে পারে—একে অপরকে ঠেলে না ফেলে? সঠিক তর্জমার অভাবে প্রশ্নটী ডুবে গেল।

একই প্রশ্ন করেছিলাম জাপানী কমিউনিষ্ট পার্টির মাতব্বরদের কাছে। জাপানী-শিল্প আগের গৌরব কি করে ফিরিয়ে আনতে পারে যখন তার উপনিবেশ নেই এবং যখন ভারতবর্ষের মত দেশও প্রতিযোগী হয়ে পড়ছে?

ওঁরা সোজা উত্তর দিলেন, "আমরা জাতীয়করণ চাই না।" আবার প্রশ্ন করলাম জাতীয়করণ হোক বা না হোক, বাইরের বাজারে

যখন চাহিদা সীমাবদ্ধ, প্রতিযোগিতা যখন তীব্র সেখানে স্বদেশীয় পণ্য কি করে চলবে? কম দামে ত' বিক্রি করা যাবে না ঘরের শ্রমিককে মেরে?

উত্তর এল "আজকের বাণিজ্য অসম-বাণিজ্য।" ঠিক কথা। ধনী দেশের সঙ্গে গরীব দেশের, শিল্প-সম্ভারে উন্নত দেশের সঙ্গে অনুন্নত বা সবে শিল্প-ক্ষেত্রে পা' বাড়িয়েছে যে সব দেশ তাদের মধ্যে সম-বাণিজ্য কি করে সম্ভব, কি করে পরস্পরকে ঠেলে না ফেলে তারা সকলে সহ-অবস্থিতি বজায় রাখতে পারে? এদের হয়ত অন্য উত্তর ছিল কিন্তু এ আলোচনায় তা' নেহাত্ কেতাবী হয়ে যাবে বলেই বোধ হয় উল্লেখ করলেন না। তাঁরা শুধু বললেন—"আমেরিকা-কে সরিয়ে দিন, সব ঠিক হয়ে যাবে"। বেশ সোজা উত্তর, হয়ত তাঁদের নিকট সন্তোষজনকও বটে। আমি কিন্তু সন্তুষ্ট হইনি। আমার মনে হয় শিল্প-যুগের কনিষ্ঠ সন্তান জাপান আধুনিক অর্থনীতির কানা-গলির শেষ প্রান্তে সবচেয়ে আগে এসে পৌঁছেছে। শান্তিপূর্ণ পৃথিবীতে বাণিজ্যের নতুন পথ বের করবার ভার তারই ঘাড়ে ইতিহাস ফেলেছে। যতই চিত্ত-অস্থিরতা দেখা দিক না কেন, যতই মরশুম বা মন্দা দেখা দিক না কেন—হয় তাকে আবার পাগলামি করতে হবে, নয় নতুন পথের সন্ধানী হতেই হবে।

টোকিওতে শেষ পার্টিতে বিখ্যাত জাইবাত্সু-গোষ্ঠীর প্রাক্তন এক কর্ম-কর্তার সঙ্গে আমাদের আলাপ করবার সুযোগ ঘটে। ইনি জাপানের বৃহত্তম বিদ্যুৎশিল্প-প্রতিষ্ঠান তোসিবা ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কসের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ম্যাক-আর্থারী আইনে বিতাড়িত হন। তাঁর সৌভাগ্যই বলতে হবে যে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়নি। বৃদ্ধ ভদ্রলোক বহুবার ইয়োরোপ ও চীন ঘুরে এসেছেন, ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁর কোনো প্রত্যক্ষ যোগ হয়নি। কথাবার্তায় জাপানের শিল্পের ভবিষ্যতের কথা উঠল। তাঁর মতামত জিজ্ঞেসা করলে ভদ্রলোক বললেন যে ভবিষ্যতে জাপানকে সুস্থ শিল্প-জীবন

পেতে হোলে তার প্রতিবেশী দেশ-সমূহের সহযোগিতার একান্ত আবশ্যক হবে, বিশেষতঃ সেই সব দেশগুলোর সহযোগিতা যারা জাতীয় উন্নতিতে মন দিয়েছে। বক্তব্য পেশ করে ভদ্রলোক জানিয়ে দিলেন সেই আদিযুগের কথা যখন ইলেকট্রিক যুগ সবে আরম্ভ হয়েছিল আমেরিকায়। জাপান সে দিকে পা' বাড়াতে গিয়ে আমেরিকান প্রতিষ্ঠানগুলির সংগে সহযোগিতার কথা পেশ করে। সেদিন সেই সব আমেরিকান প্রতিষ্ঠানগুলো জাপানকে সাহায্য করেছিল নানা উপায়ে এবং সাহায্য সেদিন পেয়েছিল বলেই তোসিবা প্রতিষ্ঠা করা জাপানের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। আজ ভদ্রলোকের মতে জাপানের দেবার পালা এসেছে, শুধু প্রতিবেশিকে সাহায্য করবার জন্যে নয়, তার নিজের শংকট থেকে বাঁচতেও।

ঠিক ঐরকম মনোভাব নিয়ে জাপানের আরও দু' একটি বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান আজ হয় সরাসরি ভারত-সরকার নয় ভারতীয় শিল্পপতিদের সঙ্গে চুক্তি করে বিদ্যুত-শিল্প বা কাঁচ-শিল্প গড়ে তুলছে। সম্প্রতি এমনি ধারা ভারতীয় ও জাপানী যুক্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ ভারতে খোলা হয়েছে। দুটো দেশের শিল্প-জীবনকে একায়ত্ব করবার প্রচেষ্টা অর্থনীতির দিক দিয়ে কতটা সহনশীল জানি না তবে এ নতুন ইঙ্গিত যে ভবিষ্যতের ইন্দো-জাপানী শিল্প সম্ভাবনাকে পত্র-পুষ্পে পল্লবিত করতে পারে তা' নিশ্চিত।

শিল্পের বৈশিষ্ট্য ও নতুন ইঙ্গিত

যাঁকে বলা হয় বৃহৎ বা ভারী শিল্প তার সংজ্ঞা নিয়ে ভারতবর্ষে বা জাপানে কোনো মতদ্বৈধ নেই ; লোহা-ইস্পাত, রেলওয়ে ইঞ্জিনের সাজসরঞ্জাম, মোটরকার, এরোপ্লেন, জাহাজ বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, কেমিক্যাল বা সিমেন্ট এ সব-কিছুই দু'দেশেই বৃহৎগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এসব শিল্পে আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে এবং মানুষের পেশী যতটা সম্ভব অল্প ব্যবহার করে অধিক পণ্য উৎপাদন (rationalisation) তা' উভয় দেশই চায়। ইয়াতার লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা দেখে এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় এ আমরা সহজেই বুঝতে পারলাম।

কিন্তু জাপানের ক্ষুদ্র-শিল্প-প্রতিষ্ঠান (smaller factories with less than 200 employees) দেখে মনে হয়েছিল যে ওদের ও আমাদের সংজ্ঞা নিয়ে দৃষ্টি-ভঙ্গির কিছু তারতম্য আছে। প্রধানতঃ এ বিভিন্নমুখী দৃষ্টি-ভঙ্গি এসেছে মেসিন ব্যবহার নিয়ে। আমাদের দেশে যা'কে বলা হয় কুটির বা গ্রামীন শিল্প তা' জাপানেও আছে কিন্তু সেগুলো সবই এসব ক্ষুদ্র-শিল্প প্রতিষ্ঠানের চৌহদ্দির মধ্যে আসে। সেখানেও মেসিন এসে পড়েছে ও মেসিনের পুরো সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। তাই বলে যে, জাপানে বিনা মেসিনে ও কেবল হাতের কাজের কোনো ক্ষুদ্র-শিল্প নেই তা' নয়। আছে এবং থাকবেও। কিন্তু সেগুলোকে ক্ষুদ্র-শিল্প গোষ্ঠী থেকে ওরা ভিন্ন করে দেখে না। মেসিনের উপর যে বিরুদ্ধ মনোভাব ভারতবর্ষে নানা আদর্শগত বা অবস্থাগত কারণে রূপ নিয়েছে, জাপানে সেটি নেই বললেও চলে।

সংজ্ঞার তারতম্য নিয়ে যতই মতভেদ থাকুক না কেন জাপান

যুদ্ধোত্তর কালে তার পুরনো হালকা শিল্প-পণ্য উৎপাদন ছেড়ে দিয়ে এবং ভারী শিল্প-উৎপাদনে সার্থকতা লাভ করেও কিন্তু আজ ঝুঁকে পড়েছে এই সব ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো আরও ব্যাপক ভাবে গড়ে তুলতে। কারণ হোল, বহির্বাণিজ্যে ভারী শিল্প-পণ্য যে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশসমূহ হয়ত আরও অনেক দিন সাদরে গ্রহণ করবে তা' জাপান জানে কিন্তু এতে দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা নিরসন হচ্ছেনা তাও সে বুঝতে পেরেছে। সে সমস্যা নিরসনে বৃহৎ অপেক্ষা ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানই বেশি কার্য্যকরী—এই হোল জাপানের অভিজ্ঞতা।

আমাদের কাছে যে পুস্তিকা দেওয়া হয়েছিল (The Smaller Industry in Japan 1954, published by the Society for Economic Co-operation in Asia) তা'তে দেখলাম এসব ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান, যেখানে অনধিক ২০০ মজুর কাজ করে, সেগুলোই সমগ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শতকরা নিরানব্বই ভাগ দখল করে বসে আছে। সমগ্র মজুর সংখ্যার শতকরা ছেষট্টি ভাগ এখানে কাজ করে এবং সমগ্র শিল্প পণ্যের শতকরা ছিয়াল্লিস ভাগ হোল এদের শ্রমের দান। বহির্বাণিজ্যে যে সব পণ্য রপ্তানী করা হয় তারও শতকরা ষাট ভাগ আসে এসব ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্য থেকে। (The percentage of smaller industrial goods is estimated at being 60 per cent of the total amount exported from Japan.)

সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠান যেখানে কেবল মাত্র চারজন মজুর কাজ করে তাদের মোট মজুর সংখ্যা ৬৮৮, ৬৫২ ; পাঁচ থেকে উনত্রিশ জনের প্রতিষ্ঠানে ১,৬৯৬,৪°৪ ; ত্রিশ থেকে নিরানব্বই জনের প্রতিষ্ঠানে ৯৬৯,২১৮ ; একশ থেকে একশ নিরানব্বই জনের প্রতিষ্ঠানে ৪০১,৯৭৬। মোট মজুর সংখ্যা হোল ৩,৭৬,১৪০ বা শতকরা ৬৮.২৪। এদের তুলনায় ভারী শিল্পে (২০০ জনের অধিক

যে সব প্রতিষ্ঠানে কাজ করে) মোট মজুরের সংখ্যা ১,৭৪৮,৪৬৭ অর্থাৎ শতকরা ৩১.৭৭ জন।

এসব প্রতিষ্ঠানে যে সব পণ্য উৎপন্ন হয় তারও তালিকা দীর্ঘ। মোটের উপর সব কিছু নিত্য আহার্য ও ব্যবহার্যের পণ্য থেকে ভাঁরী শিল্পের জন্যে তৈরী মাল-মসল্লা এরা যোগান দিয়ে থাকে। মোট মজুরের সংখ্যার শতকরা ছেষট্টি ভাগ এখানে কাজ করে বললে কিন্তু বক্তব্য পুরো বলা হোল না। এসব ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মজুরেরা তাদের আয় থেকে জাপানের এক কোটি পরিবারস্থ আত্মীয় স্বজনকে প্রতিপালন করে। (Japan's smaller industries afford employment to a large number of industrial workers and support nearly ten million of their family-members.)

এ সব ক্ষুদ্র-শিল্প-গোষ্ঠীর গোটা পাঁচ-ছয় আমরা দেখেছিলাম বিভিন্ন জায়গায়। এদের কর্মধারা অনেকটা মিশ্র। কোথায় বা দেখলাম একান্ত পরিবারস্থ প্রতিষ্ঠান; অন্যটী ছোট হোলেও পুরোপুরি কারখানা। কোনো কোনো শিল্প-পণ্য কেবল হাতে, কোনোটি মেসিনের, আবার অন্য কোনো পণ্য হাত ও মেসিন উভয়েরই সাহায্যে তৈরী হচ্ছে।

এরা বাজার নিয়ে মাথা ঘামায় খুব কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কমিসনে কাজ করে। বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা বণিক-প্রতিষ্ঠান এদের অর্ডার দেয় নমুনা মাফিক পণ্য তৈরী করতে, এরা তা' করে দিয়ে খালাস। ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে এ ভাবে পণ্যের যোগান পাওয়া যায় বলে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে সর্বপ্রকারে প্রস্তুতি করতে হয় না। এ ব্যবস্থার ভাল-মন্দ দু'দিকই আছে। প্রথমতঃ— যা সাধারণতঃ ভারতবর্ষে দেখা যায়—বড়গুলো রাঘব বোয়ালের মত ছোটগুলোকে খেয়ে ফেলে না, কারণ ছোটগুলোর উপর তাদের নির্ভরশীলতা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। দ্বিতীয়তঃ ছোটগুলো আছে বলেই

বড়গুলোকে সমস্ত-রকমে যান্ত্রিক প্রস্তুতির জন্যে অর্থ ব্যয় করতে হয় না। তৃতীয়তঃ বাজার মন্দা হোলে তার ধাক্কা কেবল মাত্র বড়-গুলোরই সহ্য করতে হয় না। চতুর্থতঃ ইয়োরোপীয় ধারায় মালিক মজুর সম্বন্ধ গড়ে ওঠেনি বলে মজুর যেমন অবসর মত কাজ করবার সুযোগ পায় তেমনি স্বল্প পারিশ্রমিকে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

মোটরকার ফ্যাক্টরীতে গিয়ে দেখলাম যে তাদের সাজ-সরঞ্জামের ষাট ভাগই আসছে মোটর-কারখানার আসে পাশে অবস্থিত এসব ক্ষুদ্র-প্রতিষ্ঠান থেকে। জাপানে তিনটা মোটরকার ফ্যাক্টরী আছে তাদের সকলকেই নির্ভর করতে হয় প্রায় ৪০০টী ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের যোগানের উপর। জাপানের জাতীয় শিল্প-জীবনে এ সব ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলো জুড়ে আছে একটা বিশিষ্ট ও বিরাট জায়গা নিয়ে। বৃহৎ শিল্প বা বণিক প্রতিষ্ঠানগুলো কাঁচা মাল তা' আকরিক লৌহই (iron ore) হোক অথবা তুলোই হোক বাইরে থেকে আনে। দেশের বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে ঐ সব কাঁচা মাল নানা পণ্যের উপযোগী করে যোগান দেয় এ সব ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে। এরা আবার অর্ডার মাফিক নতুন পণ্য সৃষ্টি করে। সেগুলো একসঙ্গে যুক্ত করে বাজারে বা বাইরে পাঠায় বৃহৎ শিল্প বা বণিক প্রতিষ্ঠানেরা। এমনি ভাবে যে পিরামিড গড়ে ওঠে তার শীর্ষদেশে থাকত পুরনো জায়বাত্‌সু হোল্‌ডিং কোম্পানী বা এখন্‌ থাকে তাদের বর্তমানের নতুন সংস্করণ।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে পরাজিত হবার পর যখন যুদ্ধের সাহায্য করবার অভিযোগে জাপানী ভারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোর দরজা বন্ধ করে দিল জিম্মেদারেরা, তখন শিল্প-জীবন পুনরুদ্ধারে প্রথম এগিয়ে আসল এ সব ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো এবং দেশের অবস্থা ফিরাতে তারাই সাহায্য করেছিল সবচেয়ে বেশি।

জাপানের শিল্প-জীবনের আর একটী বৈশিষ্ট্য হোল শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকেন্দ্রীকরণ। গোটা দেশটা জুড়ে শিল্প-সম্ভার

তৈরী হচ্ছে। বিরাট-বিরাট শিল্প-প্রতিষ্ঠান আর তাদের আশ্রিত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলো টোকিও, ওসাকা, ইয়োকোহমা, কোবে প্রভৃতি নামজাদা শহরে যেমন গড়ে উঠেছে তেমনি অখ্যাত জায়গায়তেও। এ ধারা কিন্তু বরাবর ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে, পূর্বেই বলেছি, জাপান পেয়েছিল অভূতপূর্ব সুযোগ তার শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে। সে সুযোগে জাপান যেমন ছোট-ছোট মোটর ও ইঞ্জিন বাজারে ছাড়তে আরম্ভ করেছিল তেমনি ঐ সব যন্ত্র বানাবার জন্যে শক্তির প্রয়োজন মেটাল ছোট বড় ড্যাম বেন্ধে। জাপানের আকাশে দিনের বেলায় প্লেনে চড়বার সুযোগ পেলে যে কেউই দেখতে পাবেন দিকে দিকে পাহাড়ের মাথায় কেমন করে জল ড্যাম-বেন্ধে ধরে রাখা হয়েছে জল-বিদ্যুত-শক্তি বানাবার জন্যে। দৃশ্যটা অনেকটা আমাদের দামোদর উপত্যকার মত। যন্ত্র, শক্তি আর তার সুদক্ষ চালক যখন মিল্‌ল তখন থেকে শুরু হোল ঠিক ঠিক শিল্প-জীবন এবং সে জীবন রাজধানী বা বড় বড় শহরে আর সীমাবদ্ধ থাকল না।

জাপানে কিছু কয়লা আছে। এবং সে কয়লা খুড়ে বের করবার জন্যে এমন কি সমুদ্রের তল-দেশে শ্রমিককে যেতে হয়। প্রকৃতি কিন্তু জাপানকে দিয়েছে অফুরন্ত জল-শক্তি। জাপান তা' কাজেও লাগিয়ে আসছে সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অন্যান্য শিল্পের মত এই জল-বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠানগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোরিয়া যুদ্ধের মরশুমের সময় শক্তির অপ্রাচুর্যতা জাপান ভাল ভাবেই বোধ করেছিল তাই সে এদিকে অকাতরে অর্থ ব্যয় করে আসছে। আজ পুনরায় জাপানী শিল্প-পণ্য চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। জাপানের এই শিল্প জাগরণের সঙ্গে কেবলমাত্র পশ্চিম জার্মেনীর শিল্পোন্নতিরই তুলনা করা চলে। কিন্তু জাপান যদি তার উন্নতি ভবিষ্যতে বজায় না রাখতে পারে তার প্রধান কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে এই শক্তির অসঙ্গতির মধ্যে। আজ জাপানের বিদ্যুৎ

শক্তি জাপানের শিল্পোন্নতির সঙ্গে তাল রাখতে পাচ্ছে না। বৃষ্টিপাত কম হোলেই জাপানের উদ্বেগ আরম্ভ হয়। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে শক্তি ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করতে হয়েছে বৃষ্টির স্বল্পতার জন্যে। এবার নাকি আরও অধিকতর সীমাবদ্ধ করতে হবে। জাপানের শিল্পোন্নতির জন্যে নতুন কোনো শক্তির আকর প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

জাপানে বিদ্যুৎশক্তি কিরূপ ব্যবহার করা হয় তারও তালিকা আমাদের দেওয়া হয়েছিল। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে মোট এক কোটি ৫০ লক্ষ বাড়িতে ইলেকট্রিক লাইট জ্বলত, অর্থাৎ শতকরা ৯৮ বাড়িতে ইলেকট্রিক সংযোগ আছে। দেশের মাটিতে কতটা জল-বিদ্যুৎ সম্ভাবনা আছে তার পুরোপুরি অনুসন্ধানও হয়েছে। অভিজ্ঞেরা হিসেব করেছেন যে ২১,৮৩০,০০০ কিলোওয়াট জল-বিদ্যুতের সম্ভাবনা গোটা জাপানে আছে। জাপানের প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী প্লানে (১৯৫৬-৬০) ১১,০০০,০০০ কিলোওয়াট শক্তি আহরণ করবার সংকল্প আছে অর্থাৎ মোট সম্ভাবনার প্রায় অর্ধেক আয়ত্বে আনা হবে।

ইলেকট্রিক শক্তি, যন্ত্র ও মানুষ আজ শিল্প-পণ্য উৎপন্নে নিযুক্ত। এদের হাতে এমন কোনো শিল্প নেই যা' তৈরী না হচ্ছে। চাষীর লাঙ্গল থেকে মন্দিরের লণ্ঠন, কুমোরের হাড়ি থেকে কারখানার বয়লার, বাঁশের ও কাঠের কাজ থেকে নিখুঁত ক্যামেরা শিল্প আজ জাপানী শিল্পের একতেয়ার ভুক্ত। পূর্বেই বলেছি যে মেইজী যুগ থেকে জাপানী শিল্প-জীবনের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। হয়ত গোড়ায় সে ঐতিহ্যে অনেক ভুল-চুক ছিল, অনেক ফাঁকি ও ঠকানর কৌশল ছিল। কিন্তু আজ সাম্রাজ্য হারিয়ে, বাজার হাত থেকে চলে যাবার পর জাপানের কোয়ালিটি শিল্প এমন অগ্রগতিতে চলেছে যে যদি শক্তির অপ্রাচুর্য না হয় বা বাজার ওঠা-পড়ায় অর্থের অসঙ্গতি না আসে তবে সে শিল্পের গতিরোধ কে করে?

নিশ্চয়ই জাপানী মানুষ কর্মঠ ও সুদক্ষ বলে এ অবস্থা এসেছে। কিন্তু তাতেই সবটা বক্তব্য বলা হোল না। পূর্বেই বলেছি ১৯৪৫-

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও এক আমেরিকা জাপানকে দিয়েছে বা জাপানে ব্যয় করেছে ২,৩৫০ কোটি টাকা দশ বছরের মধ্যে (Special Procurement Fund)। এ অর্থের পরিমানটা সহজবোধ্য করবার জন্যে একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বর্তমান জাপানের আয়তন ভারতবর্ষের ন' ভাগের একভাগ, আর তার লোক-সংখ্যা (মোট ন' কোটি) ভারতবর্ষের মোট লোক-সংখ্যার চার ভাগের এক ভাগ। এ হেন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেশে এক আমেরিকাই দাক্ষিণ্য দেখাল সেই পরিমাণ অর্থ দিয়ে যার তুলনায় বিরাট ভারতবর্ষ তার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৪,৮০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করবার সংকল্প করে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। এর উপরে জাপানে এসেছে বৈদেশিক ঋণ, বিশেষতঃ আমেরিকা থেকে এবং যা' ঢালা হয়েছে বৃহৎ শিল্পের আধুনিকীকরণে (rationalisation)। এ অর্থের পরিমাণ এক বছরেই (১৯৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে) প্রায় ১৪৪ কোটী টাকা উঠেছিল এবং এ অর্থ ব্যয় হচ্ছে ও হবে লোহা-ইস্পাত, পেট্রোল, ইলেকট্রিক ও ফার্মাসেউটিক্যাল শিল্পের আধুনিকীকরণে। (Economic Survey of Asia and the Far East, U. N. O., 1957)। জাপানের বিরাট শিল্প ঐতিহ্য ভারতবর্ষের তুলনায় উন্নত, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্যও বেশি, সঙ্গে সঙ্গে সেকেলে রাজনৈতিক আবহাওয়া বর্তমান থাকাতে শিল্পের উন্নতি বিনাবাধায় ও অযথা হৈ চৈ না করেই এসে পড়ছে। রাজনৈতিক আবহাওয়া কিরূপ তার ইঙ্গিত একাধিক স্থানে করেছি। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্যের প্রমাণ পাওয়া যায় জাপানের জাতীয় আয় থেকে। মাথা পিছু প্রতি বছর জাপান আয় করে (১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের হিসেব) প্রায় ১,০২৫ টাকা। আমেরিকা অথবা ব্রিটেনের কাছে এ অংক এমন কিছু নয় বটে, কিন্তু ভুললে চলবে না যে বর্তমানে ভারতবর্ষের মাথাপিছু বছরের আয়ের তুলনায় ওটা হোল তিনগুণেরও বেশি।

গোড়ায় গোড়ায় আমেরিকার দাক্ষিণ্য অপব্যয়—অপব্যয় বলা চলে কি ?—হয়ত হয়েছিল, কিন্তু আমরা যখন জাপানে তখন একদিকে যেমন ফেটে পড়তে দেখেছি মানুষের দুর্দশা আর অন্যদিকে দেখলাম শিল্পোন্নতির পরিকল্পনার মারফতে সে দুর্দশা মোচনের প্রচেষ্টা। সে বিরাট প্রচেষ্টা আজ সার্থকতার পথে চলেছে বলা যেতে পারে। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে পরিকল্পনা গ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত নেয় জাপানী সরকার আর তার বাস্তব রূপ আসল পর বছর। এ পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য হোল আত্মবশ হয়ে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ এবং সঙ্গে সঙ্গে বেকার সমস্যার নিরাকরণ (attainment of economic self-support without foreign aid, and provision of sufficient employment for the increasing labour force—ECO. Survey of Asia)। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ থেকে শুরু করে এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিসমাপ্তি হবে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের অন্তে, যখন জাপান আশা করে তাকে আমেরিকার দাক্ষিণ্যের উপর আর নির্ভর করতে হবে না।

জাপানের শিল্প-জীবনের পুনরুদ্ধারের পথে যে অনেক বাধা বিঘ্ন আছে এমন কি ভারতবর্ষের মত অনুন্নত দেশের তুলনায়—তার ইঙ্গিত অনেক জায়গায় করেছি। কিন্তু কোন্ পত্তনের উপর ভিত্তি করে জাপান এ পরিকল্পনায় এগুতে সাহসী হোল তা' আমাদের অতি জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল। জাপানী সরকার ও শিল্পপতিরা এ পরিকল্পনা গ্রহণ করবার পূর্বে আগামী পাঁচ বছরে পৃথিবীটার কি হালত্ হবে তার একটা অবস্থা কল্পনা করেছিলেন। সে কল্পনা মতে এ পাঁচ বছরে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বড় ধরণের ওলোট পালট আসবেনা; পৃথিবীর শিল্প-পণ্য-দ্রব্যের পরিমাণ বেড়েই যাবে; ব্যবসা-বাণিজ্যের পথের অন্তরায়গুলো ক্রমে আলগা হয়েই পড়বে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য প্রতিযোগিতা তীব্র হবে। ঘরোয়া ব্যাপারে ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দাবী অনেকটা মিটমাটের

পথে যাবে—ফিলিপাইনের সঙ্গে ২০ বছরের মেয়াদে মোট ৫৫০ মিলিয়ান ডলারে মিটমাট ইতিমধ্যে হয়ে গেছে,—এবং সোভিয়েট ও চীনের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের পথ খানিকটা খুলে যাবে ও সহজ হবে। পরিকল্পনা গ্রহণের দু'বছরের মধ্যেই তাদের ধারণা অনেকটা বাস্তবে পরিণত হোল।

বেকার সমস্যা নিরাকরণে জাপানী পরিকল্পনা দীর্ঘমাত্রা দিয়েছে, পূর্বেই বলেছি, ব্যাপক ক্ষুদ্র-শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর। কিন্তু এক্ষেত্রেও ক্রমাগত উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে গেলে পাছে আমদানী বেড়ে আর রপ্তানী কমে গিয়ে পরিকল্পনা বানচাল না হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এবং এজন্যেই বেকার সমস্যার সমাধান কিছুই এখনও হয়নি। বেকার সমস্যা নিরাকরণে জাপানী পরিকল্পনা কতদূর কার্যকরী তা' পঞ্চবার্ষিকীর দ্বিতীয়ার্ধে বুঝতে পারা যাবে বলে জাপানী প্ল্যানার্স'রা আশা করেন।

জাপানের মোট বেকার সংখ্যা কত তা' নিরুপণ করা সহজ নয়। ক্ষুদ্র এবং একান্ত পরিবারগত শিল্প প্রতিষ্ঠান অনেক থাকাতে এবং মজুর ক্ষেতের কাজের সঙ্গে কারখানার কাজও করে থাকে বলে ইয়োরোপীয় ধরণে বেকার নিরুপণ করা অসাধ্য। এ ধরণের সঙ্গে আমাদের দেশের খানিকটা মিল দেখতে পাওয়া যায়। তাঁতি পরিবারে হয়ত সকলেই কিছু না কিছু কাজের যোগান দেয়, আবার তারা হয়ত অন্য সময়ে ক্ষেতখামারের কাজে বা বাজারে শিল্প বা কৃষিজাত পণ্য বিক্রি করতে গিয়ে থাকে। জাপানেও এ ধরণের ব্যবস্থা এখনও আছে। তাই জাপানের বেকার সমস্যা কেবল কল-কারখানায় নিযুক্ত মজুরকে নিয়ে দেখালে সঠিক ভাবে দেখানো হবে না। বিশেষজ্ঞরা সব সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করে এ ধারণাই করেন যে ১৪ বছরের উপরের বয়স্ক চোরা (latent) বেকার সংখ্যা প্রায় ৬৫ লক্ষ। পুরো বেকার (১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে) সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ৪০ হাজার এবং প্রতি বছর নতুন কর্মপ্রার্থীর

সংখ্যা হোল ৪ লক্ষ। শিল্পে এখন পর্যন্ত যা' উন্নতি হয়েছে তা'তে প্রতি বছর ৩ লক্ষ ২০ হাজার নতুন কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা হবে। অতএব বেকার সমস্যার নিরশন হয়ই নি বরং বছরে বছরে বেড়েই যাচ্ছে। জাপানী পরিকল্পনা কিন্তু আশা রাখে যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যখন ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে শেষ হবে তখন বেকার সমস্যার গুরুত্ব অনেকটা উপসম হবে এসব ক্ষুদ্র-শিল্প প্রতিষ্ঠানের ও সরকারী কাজের এবং অন্যান্য সমাজ উন্নতিকর বিধি-ব্যবস্থার মারফৎ।

আমরা বড়, মাঝারি ও ছোট ধরণের রেশম ও সুতী বা বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান ইচ্ছে করেই দেখলাম। জাপানের শিল্প জীবনের গোড়ার কথা লেখা আছে এই শিল্পে। যে পর্যন্ত জাপান মাঞ্চুরিয়া অভিযানে (১৯৩০ খৃষ্টাব্দে) ঝাপিয়ে না পড়েছে সে পর্যন্ত তার শিল্প-সম্ভার সীমাবদ্ধ ছিল কেবল মাত্র এরূপ হালকা শিল্প ক্ষেত্রেই। যুদ্ধের প্রয়োজনীয় রসদ তৈরীর জন্যে যেটুকু ভারী শিল্পের দরকার হোত তা'ছাড়া জাপানী শিল্প বলতেই বুঝাত রেশম আর বস্ত্রশিল্প। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ থেকে যুদ্ধের তাগিদে তার দৃষ্টি পড়ল নানাপ্রকারের ভারী শিল্পের দিকে।

বস্ত্রশিল্প যেমন আমাদের দেশে তেমনি জাপানেও আদিতে ছিল তাঁতি পরিবারের একচেটে কাজ। হাতে তৈরী হোত রেশম আর সুতী বস্ত্র, এবং সে কাজে যোগান দিত তাঁতি পরিবারের প্রতিটি লোক। অন্যান্য শিল্পের মত মেইজী-যুগে (১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে) ইংলাণ্ড থেকে সুতোর একটা গোটা কারখানা তৈরী করে নিয়ে বসান হয় কয়সু দ্বীপে (Kyushu); তখনও হাতে চালান তাঁতে কাপড় হোত। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এ ধরণের কুটিরজাত তাঁতশিল্প ছড়িয়ে পড়তে লাগল জাপানের নানা জায়গায়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে, বাংলায় বয়কট যুগের পূর্ব মুহূর্তে, জাপানে পাওয়ারলুম চালু হোল। রেশম ও সুতী-বস্ত্র জন্ম থেকে পেল আশাতীত ভাবে ভারতবর্ষের বাজার।

সুতো আর বস্ত্রের কল-কারখানা ছড়িয়ে পড়ল জাপানের সর্বত্র। এমন কি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেও ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে গোটা জাপানে ছিল প্রায় সাড়ে ন' হাজার ছোট বড় বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান যেখানে মোট ১,৭০,০০০ জন মজুর কাজ করত।

এ শিল্পেও অন্যান্যদের মত মজুর বরাবর বা অবসর মত কাজ করে থাকে। হালকা শিল্প বলে এবং প্রতিষ্ঠানগুলো বাড়ির কাছে অবস্থিত বলে সেই আদি কাল থেকে এখানে মেয়ে-মজুর এসে পড়েছে সমধিক। এবং মেয়ে পুরুষ উভয়েই বরাবর বা অবসর মত কাজ করবার সুবিধা পেয়ে থাকে। বিরাট কারখানা যেখানে হয়ত হাজার জন মজুর দৈনিক কাজ করে তারই পাশে বহু ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়ে আছে যাদের কোনোটিতেও মজুরের সংখ্যা হয়ত ২০।২৫ জনের বেশি নেই। প্রতিযোগিতায় টিকবার জন্যে আধুনিকতম অটোমেটিক মেসিন যত আসছে ততই ছোট বড় উভয় কারখানাতেই মজুরের সংখ্যা কমে আসছে—আলোচনায় বুঝলাম।

প্রতিযোগিতা শেষে মানুষে আর মেসিনে সীমাবদ্ধ থাকছে না। আইন ও ঐতিহ্যের বাধা-নিষেধ অগ্রাহ্য করে সে প্রতিযোগিতা—অন্ততঃ এ শিল্পে—আমরা দেখলাম এসে পড়েছে বড় ও ছোট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। জাপানী রাঘব বোয়ালেরা এ শিল্পের চুনোপুটি গ্রাস করতে আরম্ভ করেছে। কিয়োটো শহরের একটা ছোট তাঁত-প্রতিষ্ঠান আমরা দেখতে গেলাম। ছোট হলটি তার মধ্যে বসান আছে ৮।১০ খানা তাঁত। শীতের দেশ বলেই এতগুলো লোক সে ঘরে বসে কাজ করতে পারে। প্রায় সকলেরই চোখে চশমা, যদিও বয়েস তাদের এমন বেশি নয় অনুমান করলাম। মজুরের মত মালিককেও বিষণ্ণ দেখলাম। আলোচনায় বুঝলাম পূর্বের মত আর অর্ডার আসছেনা, ফলে বেশি উৎপাদন করবার ক্ষমতা থাকলেও তা' কাজে লাগান যাচ্ছে না। পূর্বে দেশের বড় বড় দোকানদারেরা

যা বণিক প্রতিষ্ঠানগুলো মালের অর্ডার হামেশাই দিত এসব ছোট প্রতিষ্ঠানে এখন আর দেয় না। দৈনিক রোজে মজুর কাজ করে; এখনও করতে ইচ্ছুক কিন্তু কাজ আর পাচ্ছে না। শহরে কিন্তু বেপরোয়া ভাবে রেশম, সুতী ও কেমিক্যাল বস্ত্র কাটতি হচ্ছে দিনরাত। মালিক ছুটোছুটি করেন তার প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে অর্ডার যোগাড় করবার জন্যে কিন্তু তাও আসছেনা।

যে অবস্থায় মালিককে দেখলাম তা'তে আর জেরা করবার ইচ্ছে থাকল না। কিন্তু এ বিষয়ে জানবার সুযোগ পেলাম হিরোশিমায়। সেখানকার গভরনরের নিমন্ত্রণে আমরা মিলেছি একই টেবিলে। ভদ্রলোকের দৃষ্টি বহুমুখী, অনেক কথাবার্তা হোল—এ্যাটম বোমা থেকে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধ পর্যন্ত। এর মধ্যে কথা উঠল জাপানের ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ নিয়ে। ভদ্রলোক বিশেষ করে বুঝালেন এসব ক্ষুদ্র বস্ত্রশিল্প-প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ। বস্ত্রশিল্পে হিরোশিমার বেশ নাম-ডাক আছে গোটা জাপানে এবং হিরোশিমা প্রিফেকচারে—জাপান ৪৫টি প্রিফেকচারে বিভক্ত—মাঝারি ও ক্ষুদ্র বস্ত্র-শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে অনেক। পূর্বে যেমন বড় বড় বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো মূলতঃ বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকত তেমনি এসব ক্ষুদ্র বস্ত্র-শিল্প প্রতিষ্ঠান মেটাত দেশের চাহিদা।

আজ বস্ত্র-শিল্পের বাইরের বাজার মন্দা। অন্যে পরে কা কথা এমন যে ধনী আমেরিকা সেও নিজের দেশের বস্ত্র-শিল্প পাছে জাপানের সস্তা রেশম ও সুতী বস্ত্রের আমদানীতে ভেঙে না পড়ে তার জন্যে ঘোরতর আপত্তি উঠিয়েছে। বাড়ির কাছে হংকং-এ জাপানী বস্ত্র চীন থেকে আটপৌরে আর ইংলাণ্ড এবং ভারতবর্ষ থেকে আগত মিহি থানের সঙ্গে দামের প্রতিযোগিতায় টেকা কঠিন হয়েছে। যে ভারতবর্ষে সেই স্বদেশী যুগ থেকে আরম্ভ করে জাপান কাপড় যোগান দিয়ে এসেছে, আজ সেই ভারতবর্ষই হয়ে পড়েছে প্রতিযোগী।

বস্ত্র-শিল্প উৎপাদন তাই জাপানকে সীমাবদ্ধ করতে হয়েছে। বড় আর ছোট সব বস্ত্র-শিল্প কারখানাতেই আজ তাদের ক্ষমতানুযায়ী উৎপাদন করতে দেওয়া হয় না। দেশের চাহিদা এতদিন বেশির ভাগই মেটাত ক্ষুদ্র বস্ত্র-শিল্প প্রতিষ্ঠানেরা। কিন্তু বড়রা বাইরে যাবার সুযোগ হারিয়ে আজ ভীড় করতে শুরু করেছে স্বদেশী বাজারে। বড় বড় ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোরগুলো সহজেই এসব বড় বস্ত্র-শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কন্‌ট্রাক্ট করে থাকে মালের যোগান পাবার জন্যে। নতুন আইন হয়েছে যাতে বড়রা ছোটদের পিষে না মারতে পারে, তা'ছাড়া পুরনো ব্যবসা ঐতিহ্য তো আছেই। কিন্তু বেঁচে থাকবার তাগিদে বড়রা নানা ফন্দীতে অর্ডার যোগাড় করবার ফলে ছোটরা আর টিকতে পাচ্ছে না। এ অ-জাপানী শিল্প নীতি, ভদ্রলোক আরও জানালেন, কেবল বড় ছোট বস্ত্র-শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। পূর্বে প্রতি শহরে শহরে ছিল হাজার হাজার দোকানদারেরা। এখনও অবশ্য এরা আছে কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎও যেন ক্রমেই অন্ধকারময় হয়ে আসছে। আমেরিকান কায়দায় বড় বড় ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোর শহরে এসে পড়েছে, এদের কাছে ছোট ছোট দোকানদারেরা, যারা তাদের তৈরী মালের যোগান পেত দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্র-শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে, আর টিকতে পারে না। সাধারণ জাপানীর অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্য পূর্ব থেকে আজ অনেক বেশি, আজ প্রতিটি জাপানীর নিত্য ব্যবহার্য বস্ত্র পণ্যের চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে, কিন্তু তা' সত্ত্বেও একমাত্র অর্থনৈতিক ও আধুনিকীকরণের জন্যে বড়রা ছোটদের পিষে মারছে। আইন করে তাদের ঠেকাবার চেষ্টা করা হচ্ছে বটে, কিন্তু বাজারের স্বাভাবিক আইনে তারা আর টিকতে পারবে কিনা সন্দেহ।

জাপানের শিল্প-জীবনে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। যায়বাত্‌সু ব্যবস্থায় ছোটরা পুরনো আমলে যে কারণে টিকে থাকতে পারত আজকার নতুন জাপানে সে ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ছে।

বস্ত্র-শিল্পের এ পরিণতি অনুধাবনের বিষয়। পৃথিবীর সর্বত্রই বহির্বাণিজ্যে আজ বস্ত্র-শিল্পের মন্দা বাজার দেখা দিয়েছে। আধুনিকীকরণে (rationalisation) উন্নত দেশ আরও নিরংকুশ প্রতিযোগিতায় হয়ত কিছুদিন টিকে থাকতে পারে, কিন্তু বেশি দিন আর পারবেনা। কারণ আধুনিকতম বস্ত্র-শিল্পের মেশিন অনুন্নত দেশগুলো যোগাড় করলেই উন্নতদের সে সুযোগ নষ্ট হয়ে যাবেই। এর উপর রয়েছে জাপানের . সর্বাপেক্ষা বড় বাধা। তাকে কাঁচামাল যেমন কিনতে হয় বাইরে থেকে আবার সে মাল বস্ত্রে পরিণত করে বাইরে বিক্রি করে কিনতে হয় দেশের লোকের খাদ্য বা অন্য শিল্পের কাঁচামাল। বাইরের বাজার ছাড়া তার একদণ্ডও বেচে থাকবার অধিকার নেই আজকের পৃথিবীতে।

কিন্তু এ অবস্থা কেবল বস্ত্র-শিল্পেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। যে কারণে মেইজী যুগে জাপান শিল্প-জীবন শুরু করতে গিয়ে প্রথম নিয়েছিল বস্ত্র-শিল্প সে একই কারণে প্রতিটি অনুন্নত দেশ গোড়ায় নিচ্ছে বস্ত্র-শিল্প দেশের শিল্প-উন্নতি করবার জন্যে। বস্ত্র-শিল্পে তাই এসে পড়েছে—অন্ততঃ বর্হিবাণিজ্যে—সন্তুষ্টি (saturation)। এ অবস্থা যে অল্পদিনের মধ্যেই এসে পড়বে অন্য শিল্পে সে বিষয়ে কে সন্দেহ করতে পারে? পশ্চিমী দেশে শিল্প-জীবন পত্তন হতে লেগেছিল সত্তর থেকে একশ' বছর, আর শিল্প-জীবন জাপানে পত্তন হোল মাত্র ২০ বছরে। বর্তমানে যারা অনুন্নত তাদের ক্ষেত্রে এ পত্তন আরও দ্রুততর হবার সম্ভাবনাই বেশি।

যুদ্ধোত্তর কালে জাপানের শিল্পোন্নতি দেখলে চমকে উঠতে হয় সত্যি। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে কেউ ধারণা করতে পারেনি এ শিল্প সম্ভাবনা। আধুনিকীকরণে উৎপাদন বেড়ে গেছে কল্পনাতীত ভাবে। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে বর্হিবাণিজ্যে মোট রপ্তানী হয়েছিল ৬০০ কোটি টাকা (১২০০ মিলিয়ান ডলার) আর ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ১২৫০ কোটি টাকা (২৫০০ মিলিয়ান ডলার)। নিত্য নতুন আহার্যে আর ব্যবহার্যে দেশটা

যুদ্ধের পূর্বে যে অবস্থায় ছিল আজকের অবস্থা তার চেয়ে অনেক ভাল। জাপানী জাহাজ-শিল্পের কথা উল্লেখ করেছি। তিন বছর পূর্বে জাহাজ কারখানাগুলো কাজই পেতনা আর আজ আগামী তিনবছরের অর্ডার নিয়ে সেগুলো দিনরাত কর্মব্যস্ত। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম ট্যানকার (৮৪,০০০ টন)—ইউনিভারস লিডার—সেদিন বেরিয়েছে জাপানী ডকইয়ার্ড থেকে এবং একলক্ষ টনের আর একখানি ট্যানকার জাহাজ প্রস্তুতির পথে। মেসিন ও অন্যান্য ভারীশিল্পের এত অর্ডার পৃথিবীর বাজার থেকে আসছে যে তার চাহিদা মেটাতে হোলে জাপানকে বেশি দামে কাঁচামাল কিনতে হয় বাইরে থেকে। অতএব অর্ডারই না কি ছেড়ে দিচ্ছে জাপান। জাহাজ তৈরীর দামের তারতম্য অবশ্য এরই মধ্যে দেখা দিয়েছে।

এ শিল্পোন্নতির আর্থিক সাহায্য এসেছে প্রশান্ত মহাসাগরের অপর পার থেকে। জাপানের বর্তমান সরকার চায় জাপানী রাষ্ট্র-নৌকা সে বড় গাছের গুড়িতে বেন্ধে রাখতে, কিন্তু এর জন্যে কোনো ঝড় ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে অনিচ্ছুক। প্রধানমন্ত্রী কিসি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জন্যে যে পরিকল্পনা পেষ করেছেন তার পেছনে রয়েছে আগামী সাইবেরিয়ান অর্থ নৈতিক ঝড় থেকে পরিত্রাণ পাবার আশা। জাপান মনে করে আমেরিকা অর্থ সাহায্যে এ পরিকল্পনা রূপায়ণ করে তার হাতে তুলে দেবে। এর পরিবর্তে জাপানের রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতি হয়ত বন্দী থাকবে আমেরিকার ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে, কিন্তু জাপানের আশা যে সে তার শিল্প ও অর্থনীতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে জুড়ে দিলে সে ভবিষ্যতের ঝটিকা বিক্ষুব্ধ দরিয়ায় হয়ত কোনো আশ্রয় পেলেও পেতে পারে। প্রধানমন্ত্রী আমেরিকা যাত্রার পূর্বে যখন এদেশগুলো দেখতে এসেছিলেন তখন জাপানের আদি-বন্ধু ইংরেজের তরফ থেকে মন্তব্য উঠেছিল যে প্রধান মন্ত্রী কিসি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া সফরে বেরিয়েছেন কারণ এ সফর আমেরিকা অনুমোদন করেছে। আবার যখন

ওয়াশিংটনে পৌঁছলেন তখন সেখানে মন্তব্য উঠল যে কিসির পরিকল্পনাকে ভারতবর্ষ নাকি বর্ণনা করেছে এই বলে যে ওটা হোল আমেরিকারই দান যদিও আসবে বক্র পথে : (American aid in disguise)

জাপান যে কি চায় তা' এশিয়া আজ জানে। জাপান শিল্পে পশ্চিমীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জয়লাভ করেছে তা' আজ কাউকে নতুন করে বলতে হয়না। কিন্তু আত্মবশ না হয়ে জাপান যদি পূর্ব বা পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে তার রাজনীতি বা শিল্পনীতি চালাতে চায় তবে তার বা এশিয়ার মঙ্গল কোথায় ?

কৃষক আর কুটির শিল্প

কাল যখন স্মৃতির পট থেকে ছোটখাট অনেক ছবিই মুছে দিতে থাকে তখন তাদের শূন্য জায়গা পূরণ করতে মনের তুলিকা অলক্ষ্যে অতি সঙ্গোপনে কাজ শুরু করে দেয়—যেন এক অশরীরী যাদুকর তার ইন্দ্রজাল বিছিয়ে অতীতের অনুভূতিগুলোকে নতুন রূপে, রসে আর রঙে সাজিয়ে গুছিয়ে কালজয়ী করে রাখতে চায়। যে ছিল মনের নিভৃতে একান্তই ছোট সে হয়ে ওঠে বড় আর যে ছিল বড় সে হয়ত একেবারে মিলিয়ে যায়। জাপান থেকে স্বদেশে ফিরবার পর কলকাতার চির পুরাতন পরিবেশের মাঝে এই অভিজ্ঞতাই লাভ করলাম।

দিন থেকে মাস কেটে গেল। কিন্তু এখনও জাপানে অতিবাহিত দিনগুলি যে ক'টি বর্ণাঢ্য ছবি কেবল ক্ষণিকের জন্য চোখে এনে ধরা দিয়েছিল সেগুলো মাঝে মাঝে ভীড় জমায় নিরালায়, অবকাশে। যত্নে লেখা পুঁথির পাতা একে একে উল্টে গেলে ভেসে ওঠে সেদিনকার অনাদৃত, তুচ্ছ আর নিছক ব্যক্তিগত কাহিনী যাদের উপস্থাপনা চিরন্তনের খাতার পাতায় কল্পনা করতেও পারিনি সেদিন।

এমনি এক ছবি মনের পর্দায় এঁকে গেছে এক জাপানী যুবক-চাষী আর তার মা। এদের সঙ্গে আমাদের দেখা হোল কিয়োটো শহর থেকে ওসাকা বিমান ঘাঁটি যাবার পথে। মাঠের ফসল কাটা সবে শেষ হয়েছে, দু'ধারে বাঁশের দাঁড়ের উপর গোছা গোছা সদ্য কাটা সোনালী ধানের শীষ খোলা রোদে ছড়িয়ে গোড়া শুকোতে দিয়েছে জাপানী চাষী, ঠিক যেমন করে আমাদের দেশ-গাঁয়ে পাটের গাছ থেকে পাট ছাড়িয়ে নেবার পর সেগুলো শুকিয়ে নেয় বাঙালী চাষী। দেখতে পেলাম কোথায়ও বা কোনো চাষীর বাড়ির

উঠানে চলেছে আবার ধান মাড়াইয়ের কাজ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ কাজের জন্যে ব্যবহৃত হচ্ছে পেট্রোলে চালিত ছোট ছোট মাড়াইয়ের মেসিন। আবার কোথায়ও বা চলেছে সেই চিরাচরিত ব্যবস্থা, মানুষ ও পশুর মিলিত শক্তির ব্যবহার ঐ একই কাজের জন্যে। মাঠ থেকে ধান ও খড় ঘরে আনবার ব্যবস্থাও অনুরূপ। একটু অবস্থাপন্ন হোলে চাষী ব্যবহার করে যন্ত্রশক্তি, আর যারা দরিদ্র তারা নিজেরাই অথবা বলদ বা ঘোড়া-টানা গাড়িতে ফসল নিয়ে আসছে বাড়িতে। জমির ফালিও দেখতে বড় নয়, অনেক জায়গায় ক্ষেতে জল দেবার নালি চলেছে ক্ষেতের পাশ দিয়ে। প্রায় সব ক'টি জায়গাতেই দেখলাম গ্রামের কিনারেই ধানের মাঠ বিস্তৃত রয়েছে। ক্ষেত তদারক করতে, ফসল বোনা বা কাটতে জাপানী চাষীকে নিশ্চয়ই দূরের রাস্তা চলার কষ্ট ভুগতে হয় না। মনে হয় দিগন্ত বিস্তৃত বিরাট মাঠের কল্পনা জাপানে অসম্ভব।

পায়ে হেঁটে, চলন্ত ট্রেন আর মোটর গাড়ীর জানালা থেকে বহুবার চেষ্টা করেছি চাষীর কুটিরের ভিতর উঁকি দিয়ে দেখবার জন্যে। বাঙলা দেশের বিত্তবান কৃষক যদি তার ঘরের আসবাবপত্র জাপানী চাষীর সঙ্গে বিনিময় করে তবে সে যে জিতবে তা'তো মনে হোল না। তবুও জাপানী চাষীর কুটিরের বিশেষত্ব আছে বৈকি, সেটা ধরা দেয় এর গোছগাছে আর পরিচ্ছন্নতায়। যে ছবি মনে গেঁথে আছে তা' হচ্ছে যে ঘরদোরের প্রতি থাকে ওদের ঐকান্তিক দরদী মনোভাব। এই বোধ এসেছে হয়ত শিক্ষা দীক্ষা থেকে যা এখনও আমাদের দেশে অপ্রাপ্য। বাড়ি তৈরির মাল-মশল্লার দিক থেকে অবশ্য নতুন কিছুই নেই—সেই খড়, কাঠ আর মাটি। কতকগুলো ঘর দেখলাম হুবহু বাঙলা দেশের আটচালা।

কিন্তু এ সবে উনিশ বিশ না হোলেও এক দিক দিয়ে জাপানী চাষী ভারতীয় চাষীর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এটা প্রকাশ পায় তার বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার থেকে। সহজদাহ্য কাঠ খড়ের কুটিরে

বাস করে ওরা কী সাহসে বিদ্যুতের এত বড় ভক্ত হয়ে পড়ল। আবার যখন শুনলাম যে বিদ্যুৎ ব্যবহারের দরুণ তাদের ক্ষতিপূরণও নেহাৎ কম দিতে হয় না তখন বিস্মিতও হোলাম। খাণ্ডব-দাহনের মত বৈদ্যুতিক-হুতাশনের আকস্মিক রোষ কটাক্ষে বারবার এবং প্রতিবৎসর ভস্মস্তূপে পরিণত হয় ওদের কত শত পল্লীগৃহ। তা'তে কিন্তু বিদ্যুতের বিনিয়োগ সম্পর্কে ওদের ধারণা একচুলও হ্রাস হয়নি। আগুনের প্রতাপ খর্ব করবার জন্যে ওরা সৃষ্টি করেছে ছোট-খাট দমকল বাহিনী। গ্রামাঞ্চলে আমাদের চোখে পড়েছে এখানে সেখানে পল্লী দমকল বাহিনীর ছাউনি ও আগুন দমন করবার সুউচ্চ মঞ্চ।

পল্লী-জাপানের পথে চলেছি। দু'ধারে রয়েছে গ্রাম্য কুটির। আড়ম্বরের ছাপ এতে বড় একটা নেই। খুব সহজ সাধারণত্বের চেহারা এর যত্রতত্র এবং তা' থেকে ফুটে উঠেছে একটা মার্জিত রুচি ও সংস্কৃতির পরিবেশ। যখন জাপান বিজয়ীর প্রমত্ততায় ছুটেছিল এশিয়া ভূখণ্ডে, সেদিন থেকে সে আশা পোষণ করেছিল যে মাঞ্চুরিয়াকে সে বানাবে তার ফ্যাক্টরী আর স্বদেশকে একটা সাজানো বাগান। চেষ্টাও যে সে করেছিল সে পরিচয় এসব পল্লী কুটিরের মার্জিত রুচি ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা থেকে ধরা যায়। ওদের পল্লীতে চলাচল ব্যবস্থাও ভারতবর্ষ থেকে উন্নত। রাস্তাগুলোর অবস্থা অবশ্য বর্তমানের ভারতবর্ষের মতই ভালোয়-মন্দে মেশানো। কিন্তু সে রাস্তা দিয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে, এমন কি সমুদ্রের নীচে দিয়েও, যাতায়াত করবার সুবিধে আছে। কতকগুলো রাস্তা সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকা দিয়ে চলেছে মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কেন্দ্রগুলো উন্মোচিত করে। যেমন ভূমিকম্প তেমনি টাইফুনের দেশ হোল জাপান। প্রায়ই উত্তাল জলোচ্ছ্বাসে এই রাস্তাগুলো বিধ্বস্ত হয়ে লীন হয় সমুদ্রের জলে। কিন্তু সেগুলো ব্যবহারযোগ্য করে রাখার

বিষয়ে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে চলে এক বিরামহীন দ্বন্দ্ব, যেমন চলে আমাদের দেশে প্রতি বর্ষারই শেষে।

এই পল্লী-অঞ্চল ও শহরগুলোর সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থাও ভারতবর্ষ থেকে অনেক উন্নত। রেলপথ, বৈদ্যুতিক ট্রেন, ট্রামওয়ে, মোটর বাস, রেলওয়ে, পাহাড়ে-চড়া ট্রাম ত আছেই তা' ছাড়া আছে, ষ্টীমার, মোটর বোট, ট্রাক, মোটর সাইকেল প্রভৃতি। ক্ষুদ্রায়তন দেশ জাপান। তার পক্ষে এ যান-বাহনের পরিমাণ যথেষ্ট মনে হোল। এ-সবের আনাগোনায় মানুষ হয়ে উঠেছে আরো গতিময়, আর তার শিল্প-পণ্য চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বার সুবিধা পেয়েছে বিস্তর। পল্লীর রেল, বাস, ট্রাম ও ষ্টীমার স্টেশনে শহরের মতই ভীড় লেগেই আছে। কিন্তু সেই নির্বাক জন-সমুদ্রের শৃঙ্খলাই পথের কষ্ট অনেকখানি লাঘব করে দেয়। জাপানী চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে এত সুখদ অভিজ্ঞতা, যে বারে বারে তার উল্লেখ না করে থাকতে পারা যায় না।

একটা ছোট ঘটনার উল্লেখ করি, এতে আমরাই প্রায় জড়িয়ে পড়েছিলাম। আমরা চলেছি জাপানের শ্রেষ্ঠ তিনটি দ্রষ্টব্যের অন্যতম মিয়াজামার দ্বীপময় মন্দির দেখতে। ট্রেনে এসে নামলাম মিয়াজামা-ঘাট-স্টেশনে। স্টেশন থেকেই দেখতে পেলাম সমুদ্রের বীচিভঙ্গের সঙ্গে ক্রীড়ারত ইৎসুকুরা-সিনা মন্দির ও তার অনতিদূরে সমুদ্রের মধ্যেই নির্মিত লাল তোরণ। সবুজ, নীল ও রক্তিম আভা মিলেছে একই বিন্দুতে।

ট্রেন থেকে প্লাটফর্মে নেমে দেখলাম ঘাটে যাবার সড়কটি ঠিক আমাদের উল্টো দিকে। যেই দেখা অমনি কাজ। ওভারব্রিজে না উঠে সরাসরি লাইন পেরিয়ে আমরা যাব ঠিক করে ফেললাম, কিন্তু একজন সে দিকে পা বাড়িয়েছেন কি সঙ্গে সঙ্গে জাপানী বন্ধু চীৎকার করে সাবধান করে দিলেন যেন ও কর্মটি না করি। বুঝতে একটুও দেরী হোল না যে ঐ ভাবে রেল লাইন পার হওয়া জাপানী

চোখে একটা বড় রকমের অপরাধ। আমরা তিনজন ছাড়া ও পথের পথিকও আর কেউ ছিলেন না। স্টেশন মাষ্টার দাঁড়িয়ে দেখছিলেন আমাদের কাণ্ড-কারখানা। বিদেশী বলে বুঝতেও পেরেছিলেন এবং একটু মৃদু হেসে লাইন পার হয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে হাতের লাল নিশানটি তুলে ধরে ইসারা করলেন আমাদের ইচ্ছেমত লাইন পার হতে। যা' লজ্জা পাবার কথা তা'তো পেয়েই গেছি, অতএব স্বদেশীয় প্রথায় অন্য পারের প্লাটফর্মে পৌঁছলাম। সঙ্গের জাপানী বন্ধুকে ডেকে স্টেশন মাষ্টার বলে পাঠালেন আমরা বিদেশী বলেই বিনা দণ্ডে আইন অমান্য করতে দেওয়া হোল। মনে মনে পুলকিত ও লজ্জিত হয়ে আমরা স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

ঘটনাটি আমাদের কাছে অতি তুচ্ছ, কারণ রেলের লাইন পার হওয়া তো সামান্য কথা, ট্রেনের পাদানীতে এমন কি ছাতে বসেও দীর্ঘ পথ যেতে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু আইন মেনে চলাটা জাপানী জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এবং এমনি ধারায় চলতে অভ্যস্ত বলেই হিরোশিমা ও নাগাসাকির তাণ্ডবে বা টোকিও এবং ওসাকা ও অন্যান্য শহরে বোমা-বিধ্বস্ত ভগ্নস্তূপের মাঝেও জাপান সামাজিক জীবন-যাত্রা অব্যাহত রাখতে পেরেছিল।

যুদ্ধোত্তর জাপানে অবশ্য অনেক শিথিলতা দেখা দিয়েছে কিন্তু মেইজী যুগ থেকে যে শিক্ষাদীক্ষা জাপান পেয়ে এসেছে তার সবই অবলুপ্ত হয়নি।

গোড়াতেই বলেছি জাপানের কতকগুলো দৃশ্য সেখানে থাকবার সময় ততটা মুগ্ধ করতে পারেনি যতটা করেছে দেশে ফিরবার পর। এদের মাঝে যে-ছবিটা সবচেয়ে বর্ণাঢ্য তার উল্লেখও করেছি। ওসাকার নির্জন মাঠে দেখলাম মা ও তাঁর ছেলে ক্ষেতের কাজে ব্যস্ত। হু হু করে শীতল হাওয়া সাইবেরিয়া থেকে ছুটে চলেছে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে। আর কিছুদিন পরেই

এই ঠাণ্ডা হাওয়াই জাপানকে বরফের রাজত্বে পরিণত করবে।

আমরা গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম এই চাষী মা ও ছেলের সঙ্গে ক্ষেতখামারের কাজ নিয়ে একটু আলোচনা করতে। স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলাম তাঁরা তেমন সম্পদী চাষী নয়। কথাতে পুর্ব ধারণা কেবল দৃঢ়ই হোল। যুবক ছেলেটী পুরোদস্তুর চাষীও নয়। বাড়ির কাছে ফ্যাক্টরীতে কাজ করে এবং অবসর পেলে নতুন ভূমি-আইন অনুসারে সে নিজস্ব যে জমিটুকু পেয়েছে তা' দেখাশুনা করে। এ কাজে তাঁর পরিবারস্থ সকলেই যোগদান করে। ধান সবে সে কেটে নিয়ে;বাড়িতে তুলেছে এখন আবার মাটি উল্‌টে দিচ্ছে শীতের ফসলের জন্যে। বলদ বা ঘোড়ার লাঙ্গল জোগাড় করবার সঙ্গতি নেই তাঁর, তাই সেই সনাতন কোদাল দিয়ে বাহুর শক্তিতে উল্‌টে দিচ্ছে মাটি আর তাঁর বৃদ্ধা মা সঙ্গে সঙ্গে মুগুর দিয়ে ঢেলাগুলো ভেঙ্গে চলেছেন। পরণে হু'জনেরই ইয়োরোপীয় পোষাক এমন কি গাম-বুট পর্যন্ত। কিন্তু এসব সত্বেও দারিদ্রের সুস্পষ্ট পরিচয় ফুটে উঠেছিল তাঁদের রিপু করা প্যাণ্ট আর তালি-মারা কোট ও গাউনে।

যে জমির ফালি সে চাষ কচ্ছে তা অবশ্য তারই। কিন্তু চারটি মানুষের সংসার যে তাঁর, এতে কি কুলোয়? অনেক চাষীরই ঐ এক অবস্থা। তাই তাঁকে কাজ নিতে হয়েছে ফ্যাক্টরীতে, আরও কিছু রোজগারের তাগিদে। কারখানার কাজের পর যে সময়টা হাতে থাকে সেটা দেয় সে জমির চাষবাসের জন্য। কতটুকুই বা জমি—পরিশ্রমী চাষীর পক্ষে কিবা সময় লাগে তা' চাষ করতে! সে ভালভাবেই জানত যে জমির এই টুকরোটি থেকে তাঁর পরিবারের সারা বছরের আহার জুটবেনা বা অনটনও মিটবেনা। কিন্তু তাই বলে হাত পা' ছেড়ে সে জমিটুক যে অবহেলা করবে সে পাত্র সে নয়। প্রাণপাত করে সে আর তাঁর ছোট পরিবার মাটি থেকে যতটা সম্ভব বেশি ফসল আদায় করতে। তাঁদের

কাজের বিরাম নেই, তাঁদের জীবনে ছুটী নেই। কেবল নববর্ষের বা পল্লীর কোনো সামাজিক উৎসবের দিন কঠোর দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমীতে সাময়িক ছেদ আসে, নইলে প্রতিটি দিন এবং পরিবারের সবাইকে বেরিয়ে পড়তে হয় মাঠের কাজে। কিভাবে পরিবারস্থ ছেলে বুড়ো চাষের কাজ করে তারও পরিচয় পেয়েছিলাম অন্যত্র আর একটি দৃশ্য দেখে। বাবা আর তাঁর কিশোর ছেলে ও শিশু মেয়েটিকে দেখলাম চাষের কাজে ব্যস্ত। নীরবে আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি রাস্তা থেকে তাদের কাজের ধরণ। বাবা ঘোড়ার লাঙ্গলে জমি ফালি করে চলেছেন আর তার পেছনে চলেছে ছেলে মুগুর হাতে বড় বড় ঢেলাগুলো ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে। এদের পেছনে চলেছে বাচ্চা মেয়েটি চারার গোছা হাতে করে। ঠিক তার অনুমান মত সমান দূরত্ব রেখে সে ফেলে যাচ্ছে এক একটি করে চারা, যা পরে জমি চাষ হবার পর তার বাবা ও দাদা পুঁতে দেবেন। কাজে তারা এতই ডুবে ছিল যে তিনজন বিদেশী যে তাদের ক্ষেতখামারের কাজ লক্ষ্য করছে সে দিকে খেয়াল দেবার যেন বিন্দুমাত্র ফুরসৎ নেই।

চাষের কাজে কিন্তু সব কিছু দায়িত্ব জাপানী কৃষকের একলা বইতে হয় না। কাজে প্রেরণা দেবার জন্যে জাপানী রাষ্ট্র সর্বদাই কৃষকের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। ধানের চারা লাগাবার সময় জলসেচের যে প্রয়োজন তারও বন্দোবস্ত রয়েছে দেখতে পেলাম। চাষীর শুধু জল কিনে নিতে হয়। ভাল বীজ ও যন্ত্রপাতি কেনার ব্যবস্থা, উৎপন্ন ফসল রাখবার গুদাম এবং এসবের খরচের জন্যে ব্যাংকের সুযোগ সুবিধা গড়ে তুলেছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের ঐকান্তিক ইচ্ছে যে প্রতি চাষী যেন জমি থেকে যথাসম্ভব বেশি ফসল উৎপন্ন করবার সুযোগ পায়।

জাপানের প্রয়োজনীয় খাদ্যের শতকরা ৮০ ভাগই জাপানী কৃষকের দান। এটা তার পক্ষে করা সম্ভব হয়েছে কেবল রাষ্ট্রের

সহায়তা থাকার জন্যেই। ক্রমবর্ধমান জন-সংখ্যার চাহিদা মেটাবার জন্যে পুরোপুরি যান্ত্রিক চাষ জাপানে চালু করা সম্ভব হয়নি, কারণ দেশটা ছোটো এবং গরজের তাগিদে চাষ এমন কি পাহাড়ের চূড়া পর্য্যন্ত ঠেলে নিতে হয়েছে। চাষের জমি আর নেই, তাই বাধ্য হয়ে জাপানকে মনোযোগ দিতে হয়েছে দিগন্ত-বিস্তৃত-মাঠ চাষের বদলে ছোট ক্ষেতে কেবল ব্যাপক চাষের দিকে।

ধান চাষের জাপানী উপায়কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছি আমরা। কিন্তু আশংকা হয় এ ব্যাপারে চাষীকে প্রাধান্য না দিয়ে আমরা কেবলমাত্র জাপানী অনুসৃত উপায়কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছি। আসলে কিন্তু উপায়ের সাফল্য প্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে কৃষকের উপর। আমাদের কৃষকও নিঃসন্দেহে জাপানী কৃষকের মতই কঠোর পরিশ্রমী। বীজ বা চারা বপন থেকে ফসল ঘরে আনার মরশুমে তুজনাই তুনিয়ার সব কিছু ভুলে যায়। ঠিক সময়ে বর্ষা না হোলে তুজনাই সমান মুস্কিলে পড়ে। কিন্তু ভারতীয় কৃষক জাপানী কৃষকের কাছে এক জায়গায় দাঁড়াতে পারে না। সে হচ্ছে জাপানী কৃষকের অক্ষর-জ্ঞান। এই অক্ষর-জ্ঞান যে কত ভাবে জাপানী কৃষককে সংস্কার থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করেছে তা' আমাদের অনুধাবনের বিষয়।

জাপানের পুরনো সামাজিক ভিত্তিটা মেইজী-সংস্কারের পরে এমন কি শতাব্দীর গোড়াতে যে রূপ নিয়েছিল তার কোনো সম্যক পরিচয় আমাদের নেই বলেই বর্তমান জাপানের সংস্কার মুক্ত জীবন ধারায় যে পরিবর্তনগুলো এসেছে তা' ধরতে পারি না। জাপানের সেই সামুরাই-যুগের আদিম সমাজ-ব্যবস্থা ও মেইজী যুগের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নতুন বিধি প্রবর্তন—তু'টি বিষয়ই কিন্তু জাপানের ইতিহাসের বিশিষ্ট অধ্যায়। জাপানের সমাজ কাঠামো একদিন ছিল অনেকটা ভারতবর্ষের মতই অনেক ছোট বড় নিষেধের গণ্ডীতে আবদ্ধ। মেইজী-যুগে যেমন সোগান-মন্ত্রী-প্রথা উঠে গেল তেমনি অবলুপ্ত হোল

সামুরাই-ক্ষাত্র জীবন এবং সে জায়গায় এল বণিক জায়বাত্তম্ন-শ্রেণী। পল্লী-সমাজ তখনও থাকল জমিদার শ্রেণীর কবলিত। সিণ্টো ও বৌদ্ধ পুরোহিত ও ভিক্ষুদের প্রতাপ সে সমাজে ছিল অক্ষুণ্ণ। একমাত্র অস্পৃশ্য হয়ে রইল পশুপালক এতা শ্রেণী। আমাদের মত খাদ্য-বিচারেও বিধিনিষেধ ছিল সে সমাজের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ। ভারতীয় হিন্দুদের মত গোরু শূকরের মাংস সেদিন সাধারণ জাপানীদের কাছে ছিল নিষিদ্ধ। এ অবস্থা অপ্রতিহত গতিতে চলল এমন কি প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পরেও। যুদ্ধের পর যখন বিদেশীরা জাপানে আসতে লাগল দেশটা দেখতে, সমাজটাকে বুঝতে, তাঁরা নিজেদের আহার্য হিসেবে চালাতে চাইল পশু-মাংস আর তার বিক্রয় ব্যবস্থা। এ বিষয়ে প্রথম ও বিশেষ উদ্যোগী ছিল প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের এক জার্মেন-বন্দী। এ ভদ্রলোক নৌ-সেনা রূপে তখন চীনে ছিলেন জাপানীদের হাতে বন্দী হয়ে, যুদ্ধের শেষে স্বদেশে না ফিরে জাপানেই থেকে গেলেন। তিনি জাপানের শহরে শহরে গোরু আর শূকরের মাংস আহার্য হিসেবে চালানর জন্যে চালালেন প্রপাগ্যাণ্ডা। এতা-শ্রেণীর লোকেদের একাজে হাত করলেন। কিন্তু বৌদ্ধ-শ্রমণ দত্ত নিষেধাজ্ঞা তখনও এত প্রবল ছিল যে কিছুতেই জাপানী জনসাধারণ তা ভাঙতে রাজী হোল না। কিছুদিন পরেই ঘটল (১৯২৩ খৃষ্টাব্দে) জাপানের সেই চিরস্মরণীয় ভূমিকম্প ও জল-প্লাবন। সেদিনের সেই দৈব-দুর্বিপাকের মাঝে পড়ে আহারের বিরুদ্ধে জমা নিষেধাজ্ঞা আপনা থেকেই শিথিল হয়ে পড়ল। জাপানীরা হোল খাদ্য-বিষয়ে সংস্কার মুক্ত। আজ আহার বিষয়ে জাপানীরা এত উদার যে অ-সিদ্ধ মাছও অপ্রিয় নয়। শিক্ষার আলোকে, নিয়মানুবর্তিতার গুণে এই পুরনো বিধি-নিষেধ শিথিল হবার ফলে জাপানী সামাজিক জীবন প্রাক-যুদ্ধকালে হয়েছিল সহজ ও অনেকাংশে সরল। যুদ্ধোত্তর যুগে প্রথমেই এল আমেরিকানদের কাছ থেকে নতুন সামাজিক

বিধ-ব্যবস্থা। পল্লী সমাজে আমেরিকান নীতি কার্যকরী হোল জমিদারী প্রথা উৎসাদনে। হুকুম এল জমি চাষীদের হাতে ছেড়ে দিতে। চাষী পরিবার পেল গড় পড়তা সাত বিঘে করে চাষের জমি। ক্ষতিপূরণ অবশ্যই মালিকদের দেওয়া হয়েছিল। সেই ক্ষতিপূরণের হার কিন্তু ধার্য হয়েছিল সেদিনকার (১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের) খাজনার হারের ওপর।

ম্যাকআর্থারী হুকুম জায়বাতস্থু-প্রথার বিরুদ্ধে তেমন কার্যকরী হয়নি যেমন হয়েছে জমিদারী উৎসাদনে ও চাষীর হাতে জমি প্রত্যর্পণে। গোটা দেশটার জমিদারগুলো তাঁদের পল্লীস্থিত ঘর-বাড়ি বিক্রয় করে আর জমিদারী ছেড়ে ছুটলেন শহরে। ইয়াতা লোহার ও আসাহী কাচের কারখানা দেখে পূর্বে উল্লিখিত জমিদারের প্রাসাদে আমরা যে রাত্রি কাটিয়ে-ছিলাম তখন লক্ষ্য করেছিলাম কি ধরণের জীবন যাপন করতেন জাপানী জমিদার। জমিদারটি শুনেছিলাম ওসাকা ও টোকিওতে বিরাট রেস্তোরাঁ খুলেছেন। এমনি উল্‌টো-পাল্‌টা ব্যবস্থা এমন কি সম্রাট-পরিবারের নিকট আত্মীয়দেরও ভাগ্যে এসেছে। সকল জমিদারই যে নতুন জীবনে সাফল্য লাভ করতে পেরেছেন তা' নয়, কিন্তু অনেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থ নিয়োগ করে দাঁড়াতে চেষ্টা করছেন। পূর্বে বলেছি ভারতবর্ষীয় চাষী জাপানী চাষীর সগোত্র নয়, ঠিক তেমনিভাবে বলা যেতে পারে যে ভারতবর্ষীয় জমিদারও জাপানী জমিদারের সগোত্র নয়। প্রাসাদের দেওয়ালে টাঙান ছবি, পাষাণের মূর্তি, ঘরের আসবাব, গৃহসজ্জার ধরণ-ধারণ ও আশে-পাশে সযত্নে গোছান বাগান, সবার উপরে প্রাসাদের চারিদিককার লক্ষ্মীশ্রী দেখলে অতি সহজেই ধরা পড়ে যে জাপানী জমিদার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেও জাপানীই ছিলেন। বাহুল্য দেখিয়ে, ইয়োরোপের সুযোগ-সুবিধাগুলো প্রজার অর্থে কিনে নিয়েও আত্মসংস্কারে অসমর্থ বা ক্লান্ত হয়ে পড়েননি

কিংবা তাঁদের প্রাসাদগুলোকে ছোট ছোট জু-গার্ডেনে বা যাত্নঘরে পরিণত হতে দেননি।

বর্তমান জাপানী শাসক-সমাজের প্রধান সহায়ক হোলেন এই পুরনো জমিদার-শ্রেণী। আজ রুজি রোজগারের তাগিদে এঁরা বিপন্ন। অধিকারচ্যুত হয়ে আবার অনেকের জীবন বিড়ম্বনায় পর্যবসিত। এঁরাই একদিন ছিলেন জাপানের বিষয় বৈভবের হর্তাকর্তা বিধাতা এবং যুদ্ধোত্তর জাপানের শাসক-গোষ্ঠীর সমর্থক। জমিদারী ছেড়ে দেবার বাবদ খেসারত পেয়েও অনেকে নিজেদের রক্ষা করতে অক্ষম। বলা হয় যুদ্ধোত্তর কালের মুদ্রাস্ফীতির দরুণ তাঁদের প্রাপ্য খেসারত মূল্য মাটি হয়ে পড়ল, আর তাঁদের মুখোমুখি হতে হোল এমন প্রতিযোগিতার সঙ্গে যার কোনো পূর্ব পরিচয় তাঁদের ছিল না। তাঁদের হাত থেকে কেড়ে-নেওয়া জমিদারীর জন্যে নতুন খেসারত আদায় করবার জন্যে আজ আবার জোট বেঁধে এঁরা দরবার করছেন। তাঁদের বর্তমান অর্থনৈতিক হাল-চাল জানবার জন্যে জাপানী সরকার ইউনিভারসিটিগুলির অর্থ-নীতিজ্ঞ অধ্যাপকদের নিয়ে একটী তদন্ত কমিটিও বসিয়েছেন। কিন্তু যেমন শ্রমিকদের ব্যাপারে তেমনি জমিদারদের বেলায়ও সমাজতান্ত্রিক দলগুলো এবিষয়ে একেবারে মারমুখো। জমিদারদের প্রতিষ্ঠান দাবী করেছে প্রতি ০.২৪৫ একর জমির জন্যে এক লক্ষ ইয়েন (প্রায় সাড়ে তের'শ টাকা)। এ পড়তায় যদি জাপানকে খেসারত দিতে হয় তবে জমিদারেরা পাবেন মোট ২,০০০,০০০ মিলিয়ন ইয়েন। বর্তমান সরকার খেসারত আবার দেবেন কিনা জানান নি, তবে এটা ঠিক এসব জমিদারদের খেসারত দিতে তাঁরা পক্ষপাতী। লিবারেল ডিমোক্রাটিক পার্টির জমিদারদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কথা উল্লেখ করে সমাজতান্ত্রিকেরা মন্তব্য করেছেন যে আগামী নির্বাচনে জিতবার ব্যবস্থার জন্যেই জমিদার শ্রেণীকে আবার ঘুস দেবার চেষ্টা চলছে।

জমিদার শ্রেণীকে আবার সাহায্য দেওয়া হোক বা না হোক,

জমিদারী প্রথা অপসারণ কোরে ও চাষীদের হাতে জমি ছেড়ে দিয়ে জাপানের সামাজিক মঙ্গলই হয়েছে। জমির মালিকানা পেয়ে ফসল উৎপাদন কাজে পরিশ্রমী চাষীর আগ্রহ বেড়ে গেছে। পূর্বেই বলেছি ক্রম-বর্ধমান জনসংখ্যার খাবার যোগানের জন্যে মোট খাদ্যের বেশির ভাগই জাপানী চাষী দিয়ে আসছে। ঘাটতিটুকু জাপানকে মেটাতে হয় বাইরে থেকে কিনে এনে। ঘাটতির আশংকা সর্বদা বিদ্যমান থাকায় দেশে উৎপন্ন খাদ্যের চাহিদা মোটামুটি স্থিতিশীল এবং এর সাক্ষাৎ ফলস্বরূপ দেশের খাদ্যের দাম খুব বেশি পড়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। ভারতবর্ষে ভাল ফসলের বছর চাষী যেমন মন্দা বাজার আশংকা করে জাপানে তা' হয়ত দেখা দেবে না। দাম পড়ে যাবার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে জাপানী চাষী অনন্যমনা হয়ে চাষের কাজে নিযুক্ত থাকবার ভরসা রাখে।

জাপানী চাষী কেবল পরিশ্রমীই নয়, নতুন বৈজ্ঞানিক উপায়-পদ্ধতি সম্বন্ধেও তার দৃষ্টি সর্বদা সজাগ। নিরক্ষর নয় বলেই বিজ্ঞান সম্মত পথে চাষবাস চালাতে সে দ্বিধাহীন। অকুণ্ঠভাবে সে মানুষ বা পশুর বিষ্ঠা বা মল ব্যবহার করতে পারে জমির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে। জাপানের গ্রামের মাঝ দিয়ে যাবার সময় লক্ষ্য করেছি গ্রামের প্রান্তভাগে কংক্রিটে বাঁধানো খাদ যেখানে সংরক্ষিত থাকে ঐ কমপোষ্ট সার। এ সার ব্যবহারে জাপানী চাষী কোনো প্রকারই কুণ্ঠাবোধ করেনা, যেমন আমরা করি না গোবর সার ব্যবহার করতে। এইসব সার ব্যবহারে সংস্কারমুক্ত বলেই জাপানে মানুষকে জন্ম-জন্ম ধরে মেথর করে রাখা হয়নি।

জাপানী চাষের সফলতার অন্যতম কারণ হচ্ছে কৃষি সমবায় প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে চাষীদের সুস্পষ্ট বোধ। এই প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রামীণ এলাকার সর্বত্র চাষীদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। এগুলো যে শুধু নির্ঝঞ্ঝাটে সময়মত বীজ ও যন্ত্রপাতির সঙ্গে নতুন ভাবধারা তাকে যোগায় তাই নয়, বীজবপন থেকে ফসল গুদামে রেখে বাজারে ছাড়া পর্যন্ত চাষীকে

নানা উপায়ে এমনকি টাকার যোগান দিয়েও সহায়তা করে থাকে। উদ্দেশ্য হোল যাতে চাষীরা তাদের বাড়ির যথাসম্ভব কাছে এবং বিনা অসুবিধায় প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি সময়মত পায়। যখন চাষের মরশুম আসে তখন আমাদের চাষীদেরই মত জাপানী চাষীর একদণ্ড সময় অপচয় করবার থাকে না। ঠিক সেই মুহূর্তে যদি বাড়ি থেকে দূরে শহরে গিয়ে সরকারী কর্মচারীর দর্শনপ্রার্থী হয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট, অথবা টাউট ধরে দরবার করতে হয় তবে পরিণামে সমাজ ও রাষ্ট্রই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ অবস্থা যাতে না ঘটে সেজন্যে জাপান গড়ে তুলেছে এই সুসঙ্গত ব্যবস্থা। সরকারী হুজুরেরাই এই ব্যবস্থানুযায়ী ঠিক সময়ে উপস্থিত হয় চাষীর দরজায়। সময় একটুও নষ্ট না কোরে যেন সে পায় সরকারী ও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্যক সাহায্য। জাপানী চাষের নিয়ম কানুন ভারতবর্ষে প্রবর্তন করা সম্পূর্ণ অর্থহীন হবে যদি এই দিকটাও সঙ্গে সঙ্গে এখানকার মাটিতে আমদানী করা না হয়।

প্রাক-যুদ্ধকালে আমাদের দেশের মত জাপানেরও এই ধারণা পেয়ে বসেছিল যে বিদেশ থেকে যখন সস্তায় চাল আমদানী করা যায় তখন ধান-চাষের দিকে নজর দিয়ে লাভ কি? এই জাতিগত নিষ্ক্রিয়তার মূলে আঘাত হানল' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। বর্তমানে জাপানে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চলেছে কি ভাবে জমি থেকে উৎপাদন বাড়ান যায়। আজ সেখানে আওয়াজ উঠেছে—জাতীয় খাদ্য-উৎপাদন বাড়াও। জন-সাধারণকে এ বিষয়ে যথাসাধ্য প্রেরণা দিচ্ছে শুধু সরকারী কৃষি-বিভাগ বা সমবায় প্রতিষ্ঠান নয়, দেশের সংবাদপত্রগুলোও। জাপানী সংবাদপত্রের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে অতুলনীয়। 'আসাহি সিমবুন'এর মত বিরাট সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান চাষের উন্নতির জন্যে প্রত্যক্ষভাবে বছরের পর বছর অকাতরে পরিকল্পনা ও অর্থব্যয় করে চলেছে, আর এ কাজে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন রাষ্ট্র তথা স্বয়ং সম্রাট।

কিন্তু এ সব প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবার প্রধান কারণ পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সে হোল জাপানী কৃষকের অক্ষর জ্ঞান। চাষের জন্যে কোথায় কি নতুন উপায় উদ্ভাবন হোল সে সম্বন্ধে তার জ্ঞান পরমুখাপেক্ষী নয়। আমরা জাপানে থাকতে সে-বছর সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষি-পুরস্কার পেলেন যে কৃষক তাঁর বাড়ি ছিল জাপানের অনুর্বর দক্ষিণ অঞ্চলে। তিনি কম্পোষ্ট সারের যোগাড় কি ভাবে করেছেন, মাটী কতটা গভীর ভাবে লাঙ্গল দিয়েছেন, কতটা সার দিয়েছেন, অঙ্কুরে গাছের স্বাস্থ্য কেমন ছিল, হাওয়ায় আর্দ্রতা কেমন কাজ করেছে, কতটা ফাঁক-ফাঁক করে গাছগুলো লাগানো হয়েছে, কীট পতঙ্গের উৎপাত্ থেকে গাছ বাঁচাবার জন্যে প্রতিরোধক কি লেগেছে এবং এসব করতে কি খরচ পড়েছে—খুঁটিনাটি তথ্য লিখে রেখেছিলেন অন্য সব চাষীদের জানবার জন্যে। কৃষি-প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পেলেন পুরস্কার, প্রশংসাপত্র পেলেন সম্রাটের হাত থেকে। আর পেলেন 'আসাহি সিম্বুন' থেকে নগদ ৫০,০০০ ইয়েন (প্রায় সাত'শ টাকা) ও ব্যাপক পাবলিসিটি।

ভারতবর্ষের তুলনায় জাপান ক্ষুদ্রায়তন হোলেও এবং অনেকানেক শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও জাপানী শ্রমিক বা চাষীর জীবনে যে খুব বড় ধরণের একটা স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে তা' মনে করবার কারণ দেখলাম না। গ্রামীণ জীবন-যাত্রা যে কি ধরণের তার একটা নিখুঁত সরল ছবি দিয়েছিল একটি চাষীমেয়ে "আসাহি" পত্রের সম্পাদককে একখানা চিঠির মারফত। আলোচনা উঠেছিল মেয়েদের ভারী-মোট বওয়া নিয়ে। বেশী বোঝা বইলে মেয়েদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে এই প্রচলিত ধারণাকে মেয়েটি অস্বীকার করে সম্পাদককে জানিয়েছিল তার মনের কথা। মেয়েটি লিখেছে "আমি যে কৃষিক্ষেত্রে কাজ করি সেখানে প্রায়ই আমরা ১০০ পাউণ্ডের (এক মণ সাত সের) বেশি ভার বয়ে থাকি। কিন্তু এত কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও টোকিওর লোকদের মত আমরা আরামে থাকতে পারি না। রাতের

আহারই আমাদের সারাদিনের মধ্যে ভুরিভোজ। তবুও কেবল মাঝে মাঝেই সেই ভোজে আমরা মাছ খেতে পাই। একবারের বেশি তো কখনও মাছ জোটে না। সে মাছও আবার সবথেকে সস্তা ম্যাকরেল মাছ। বাচ্চাদের যে একটু করে মাছ দেওয়া হয় তা' তারা সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে শেষ করে না; মাছ দুষ্প্রাপ্য বলে দু-তিন দিন ধরে একটু একটু করে খায়। মাঠে চাষের কাজে বেরুলে দুপুরের আহারের জন্যে আমরা সঙ্গে নেই বার্লি-র-জল, মুলোর আচার আর গেঁজিয়ে ওঠা সয়াবীন আর থাকে জারভর্ত্তি জল। আমরা চাষীরা এত পরিশ্রম করি তবুও টোকিওর লোকদের মত খাবার কেনার সঙ্গতি আমাদের হয় না কেন? চাষের কাজে ফিরে যে যাই সে ইচ্ছে বিন্দুমাত্র আর আমার নেই। কিন্তু সব চাষীরই আমার মত মনোভাব হোলে কি হবে তাই ভাবি।"

ওসাকার মাঠে চাষী যুবককে প্রশ্ন করেছিলাম চাষের কাজের ফাঁকে ফাঁকে তো সময় পাওয়া যায়, সে-সময়টুকু নিশ্চয়ই বাড়ির মেয়েরা ছোটখাট রোজগারের কাজে ব্যয় করে থাকেন? জমির কাজ ছাড়া চাষী মেয়েদের আর কোনো কাজই জোটে না—জবাবে বল্‌ল সে। অবাক হয়েছিলাম তার জবাব শুনে। বাইরে থেকে ধারণা নিয়ে গিয়েছিলাম যে জাপানে কুটির ও মাঝারি ধরণের শিল্পের বিরাট প্রসারের মূলে প্রধান অবদান ছিল এইসব চাষী কারিগরদের কুটিরে কুটিরে চাষের অবসর সময়ে কাজের সংস্থান। চাষীরা মাঠের ফসল কাটা শেষ হোলে তাদের অবকাশ সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারত নানা রকম শিল্প-সম্ভারের যোগান দিয়ে। জাপানী সস্তা শিল্প দ্রব্য যে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল তার প্রধান কারণ ছিল যে জাপানী চাষী পরিবারগুলো নামমাত্র খরচায় তার একাংশ তৈরী করে দিত এই চাষের অবসর মুহূর্তগুলি কাজে লাগিয়ে। কেবল শিল্পদ্রব্য নয় মুরগী পালন, মাছের চাষ, মৌমাছির চাষ প্রভৃতি ছিল এদের

অবকাশ বিনিয়োগের অন্তর্গত। গৃহের শান্ত পরিবেশের মাঝে ধীরে সুস্থে সুনিপুণ সূচীশিল্পকাজও ছিল একদিন জাপানী চাষী মেয়েদেরও একতেয়ার।

ওসাকার শিল্পপতি তাকাহাতি আমাদের বলেছিলেন যে জাপানে অনেক কুটির শিল্প ছিল—এখনও আছে। সেখানে চাষী কারিগরেরা চাষের কাজের অবসরে এসে কাজ করে থাকে। তাঁর মতে এই উপরি কাজের সুযোগ সুবিধা না থাকলে চাষীর পারিবারিক জীবন হয়ে পড়ত বিড়ম্বনা মাত্র। তিনি চাষীদের এইসব কাজগুলোর একটা লিষ্টও আমাদের দিয়েছিলেন। এর মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল কাপড় আর সিল্কের জমির উপর নিপুণ হাতে নক্সা কাটার কাজ তা' ছাড়া পুতুল শিল্প, বাঁশের চিক, পাটি প্রভৃতি হাল্কা জড়োয়া দ্রব্য সম্ভারের কাজ। জাপানের যেমন লোকসংখ্যা তেমনি গ্রামাঞ্চলে আছে প্রচুর পরিশ্রমী আর সুনিপুণ চাষী কারিগর। এর ফলে কুটির শিল্পের যোগান এবং সমাদর কোন দিনই হ্রাস পায়নি। এ বিষয়েও জাপানী নেতৃত্ব চাষী কারিগরকে কেমন ভাবে সাহায্য করেছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। আপামর ধনী-নির্ধন জাপানী গৃহের মেঝে পাটি দিয়ে মোড়া। কিন্তু সে সব পাটিই জাপানের যে অঞ্চলেই তৈরী হোক না কেন তার বিস্তার ও পরিধি একই স্টানডার্ড মাপের। পাটির অনুরূপে সম-পরিধি এবং বিস্তার-বিশিষ্ট হয়ে পড়েছে জাপানী ঘরগুলো।

কিন্তু যুদ্ধোত্তর জাপানে এসেছে ওলট-পালট। সরকারী একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকায় জেনেছিলাম যে দেশে ৪২ ভাগই মানুষ চাষবাস সংক্রান্ত কাজ করে। জাপানে পূর্বে এত লোক কেবল কৃষিকাজেই ঝুঁকে পড়েনি। যুদ্ধের আগে চাষীগোষ্ঠীর যা' সংখ্যা ছিল ১৯৫০ সালে সে সংখ্যা শতকরা ১২ ভাগ বেড়ে গেল এবং সঙ্গে-সঙ্গে আবার মাথাপিছু চাষের জমির পরিমাণও কমে গেল। ফলে কৃষির উন্নতি সত্ত্বেও কৃষিকাজ আজ সমস্যায় পর্য্যবসিত। এই

সংকটের মাঝে এমন কি অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন চাষীও ঠিকা কাজের খোঁজে চলতে আরম্ভ করেছে ঘর ছেড়ে দূর-দূরান্তরে। চাষবাসের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই এমন সব কাজেও জাপানী চাষী কারিগরের যোগদান করতে আজ আর দ্বিধা নেই। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে চাষী-মেয়েদের কর্ম-সংস্থানের সমস্যা।

জাপানের কয়েকটি কুটির ও ছোট-শিল্প প্রতিষ্ঠান দেখবারও আমাদের সুযোগ হয়েছিল। এরা পুতুলের, পাখার, খেলনা ফুলের (artificial flower), বাঁশের, কাঠের, সূচের, ছাপানো সিল্কের কাজ করে থাকে। বাঁশের কাজের প্রতিষ্ঠানটি তো ছিল সুদূর পল্লী অঞ্চলে। নিকটস্থ পল্লী থেকে আসছে বাঁশ আর অপর দিক থেকে বেরুচ্ছে অতি মিহি ও সুদর্শন পর্দা আর নানাবিধ আভরণ, বাঁশের খেলনা, ট্রে, বাক্স, বোতোল, কাপ, বোতাম, এমন কি চুলের কাঁটা। কারখানাটি দেখলাম কর্মমুখর, সকলেই নীরবে কাজ করে যাচ্ছে। কোনো হৈ চৈ কোথাও নেই। মেসিনে অথবা নিছক হাতেই তৈরী হচ্ছে বিচিত্র সব দ্রব্যগুলো। হাতের নকসা কাটা কাজগুলো, মেসিনে তৈরী দ্রব্যগুলো অপেক্ষা, দেখতে মনোরম এবং দামে সমধিক। এমনি হাতের তৈরী বাঁশের পর্দার দাম ৮০৲ টাকার কম নেই। পৃথিবীতে এই পর্দার চাহিদা রয়েছে বিস্তর। খোদ জাপানে এইসব বাঁশের পর্দা বড় বড় মন্দির ও ধনী-গৃহের সৌন্দর্য বাড়াতে বিশেষ ভাবে কাজে লাগে। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম এই ধরণের বাঁশের শিল্প দ্রব্যের কারখানা-পল্লী-জাপানের বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে রয়েছে।

ঘরে ঘরে এই ধরণের স্বদেশী সৌখীন জিনিষ সমাদর পায় জাপানে। বাইরেও এসব দ্রব্যের সমাদর কম নয়। কারখানাটিতে জনা পঞ্চাশেক মজুরকে কাজ করতে দেখলাম। একদিকে বাঁশ ফেঁড়ে মেসিনের সাহায্যে পর্দা বুননের কাজ চলছে, অন্যদিকে কেবল হাতে। হাতের তৈরী পর্দাগুলো দেখতে এত সুশ্রী! মেয়ে পুরুষ

উভয়েই ছুদিকেই কাজ করছে, তবে হাতে যারা পর্দা বুনছে তারা বয়স্ক। অনায়াসেই বুঝতে পারা যায় এরা হোল কারিগর এবং তাদের দক্ষতার জন্যেই হাতের পর্দাগুলো হয়ে পড়ে সুদর্শন। এরা সকলেই গ্রামের লোক, ঠিকে প্রথায় (piece rate) এবং অবসর সময়ে কাজ করতে আসে কারখানায়। ছু'দিকেই একটা বুঝাপড়া আছে, ফলে কাজে কোনো বিঘ্ন আসে না। বাঁশের নানা-বিধ দ্রব্যের মধ্যে, খোজ করে জানলাম, পর্দা-বিভাগটি ক্রমশঃই বড় হয়ে পড়েছে এবং স্ব-প্রতিষ্ঠ শিল্পে রূপান্তর হচ্ছে।

পাখা ও পুতুল শিল্প দেখলাম এখনও অনেকটা মেসিন-বিবর্জিত। এর কারণ হোল চাহিদার বৈচিত্র্য। প্রতি বছরেই নিত্য নতুন ধরণের পছন্দের দাবী ওঠে যার জন্যে ঢালাই প্রস্তুতি ব্যবস্থা এক্ষেত্রে অচল। অবশ্য টিনের, রবারের, কাঁচের বা সেলুলয়েডের পুতুলগুলো মেসিনে প্রস্তুত হয় এবং সেজন্যেই সেগুলোর দাম সস্তা। আমাদের দেশে যেমন রথ-যাত্রায় খেলনার রথ প্রস্তুত করে কারিগরেরা নিজস্ব-ভঙ্গী দিয়ে, জাপানে তা' আজ অসম্ভব। যা' কারিগরের হাতের ও মনের সৃষ্টি তা' জাপানে দেখতে পাওয়া যায় বাঁশের অলংকারের বৈশিষ্ট্যে অথবা চীনে-মাটির পুতুলের চোখ-জুড়ানো পোষাক-পরিচ্ছদ বা দৃষ্টি অথবা অঙ্গ-ভঙ্গী থেকে। এসব হাতের কাজ সমান সমাদর পায় স্বদেশে ও বিদেশে, যদিও সর্বক্ষেত্রেই তাদের দাম মেসিনে-প্রস্তুত পুতুল, পর্দা, পোষাক বা অলংকার থেকে অনেক বেশি।

একটি মাঝারি ধরণের ফ্যাক্টরীতে গেলাম। এখানে ধান-ভানার কল তৈরী হয়। সে কলের চাহিদাও যেমন জাপানে আছে, তেমনি আছে বাইরে। দেখলাম পাকিস্তানের জন্যে অনেকগুলো কল তৈরী হচ্ছে। পল্লীগ্রামের পরিবেশে ফ্যাক্টরী অবস্থিত। কলের কাজ দেখে শুনে নিতে গ্রামের লোকের কোনো অসুবিধে নেই। যদি একটু আধটু পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় তা'ও সহজ-সাধ্য। কলকাতা থেকে মেসিন কিনে আবার তা' মেরামত করবার জন্যে

কলকাতাতে সে কল ফেরৎ আনতে হয়না জাপানী ধান-ভানার কলের মালিককে।

প্রশ্ন করলাম চাষের কাজে যেসব যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয় কোন্ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে সেগুলো বানানো হয়ে থাকে? ফ্যাক্টরীর মালিক উত্তরে জানালেন যে আজকাল চাষের অনেক যন্ত্রপাতিই ফ্যাক্টরীতে তৈরী হয়ে থাকে তবে কতকগুলো যন্ত্রপাতি আছে যা' এখনও গ্রামের কামারের পরিবারস্থ লোকেরা চাষীদের যোগান দেয় বা দরকার হোলে মেরামত করে থাকে। হিসেব করে বললেন যে বছরে প্রায় পঞ্চাশ ষাট লক্ষ কাস্তে ও লাঙ্গলের ফলক (হল) গ্রাম্য কামার প্রতিষ্ঠান মারফৎ তৈরী হয়। এসবগুলো কেন এখনও ফ্যাক্টরীর আওতায় আসছে না প্রশ্ন করাতে ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন যে চাষের কাজ জাপানে শিল্প-পর্যায়ে ওঠার সম্ভাবনা কম বলেই ও যন্ত্রগুলো গ্রাম্য কামারদের হাতেই আছে এবং হয়তো ভবিষ্যতেও থাকবে।

পূর্বে বলেছি এসব মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো হোল জাপানের বৈশিষ্ট্য। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে জাপানের শিল্প জীবনে এ বৈশিষ্ট্য এসে পড়েছে। আজকের আধুনিকী-করণের যুগে (rationalisation) দেশটা ভারী শিল্পের দিকে ঝুঁকে পড়ে নতুন কোনো সমস্যার সৃষ্টি না করে ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে বেকার সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ না করে সেজন্যেই এসব প্রতিষ্ঠানের দিকে বিশেষ সরকারী লক্ষ্য রাখা হয়েছে। নানা উপায়ে এগুলো যাতে সুস্থ ও সবল থাকতে পারে তারও চেষ্টা চলছে। এসব উপায়ের মধ্যে যেটা সব চেয়ে কার্যকরী বোধ হয়েছিল আমাদের কাছে সেটা হোল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট। জাপানের অনেক শহরে বিশেষ বিশেষ মাঝারী ও ক্ষুদ্র শিল্পকে সাহায্য করবার জন্যে এসব ইনষ্টিটিউট স্থাপনা করা হয়েছে। আমরা এমনি একটি ইনষ্টিটিউটটে কিয়োটো শহরে দেখেছিলাম। যখনই যে কোনো

টেকনিক্যাল বা কোয়ালিটি বিষয়ে উৎপাদন-সমস্যা প্রতিষ্ঠানের সামনে এসে পড়ে তখনই এই সব ইনষ্টিটিউট সে সমস্যা সমাধান কোরে দিয়ে থাকে।

ভারী শিল্পের তুলনায় এসব মাঝারী ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো শ্রমিককে মজুরী দেয় কম। লৌহ-ইস্পাতের বা ইঞ্জিনিয়ারিং বা সেরূপ ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিককে ২০,০০০ থেকে ২৮,০০০ ইয়েন (২৬৬-৩৭০ টাকা) মজুরী দেয়। কিন্তু হাল্‌কা সুতা বা রেশমের প্রতিষ্ঠানের মজুরী প্রায় অর্ধেক। কিন্তু তাই বলে এসব ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানে বা চাষীর কাজে জাপানে মজুরের যোগানে ভাটি পড়বে না। আমাদেরই চাষীদের মত অথবা ছোট ছোট কারখানার মজুরদের মত অবস্থা হোল তাদের। বিরাট বেকার সমস্যার সামনে পড়ে যে কোনো কর্ম সংস্থানই হয় কাম্য, মজুরীর রেট তার কাছে গৌণ। জাপানে বেকার কে তা' অনুসন্ধান করা হয় সার্ভে-সপ্ত'হে যে শ্রমিক অন্ততঃ এক ঘণ্টাও কাজ করেছিল বা সে সুযোগও পাইনি এই মূল অনুসন্ধান করে। (Labour Force Survey of Japan by Bureau of Statistics, 1956) এ সার্ভে দেখা গেল ১৭,৭০,০০০ শ্রমিক যে কাজে নিযুক্ত তারা তা' ছেড়ে দিয়ে উন্নততর কাজ পেতে চায়। আর ন' লক্ষ শ্রমিক যারা সপ্তাহে মোট ৩৫ ঘণ্টার বেশি কাজ করবার সুবিধে পায় না, তারা আরও কাজ চায়।

দু' দেশেরই গোড়াকার সমস্যা প্রায় একরূপ। এত লোকের অন্নের ব্যবস্থা ও কর্ম-সংস্থানের পূর্ণ সুযোগ কেমন করে আসবে? জাপানে যেখানে শিল্প এতদূর এগিয়েছে সেখানে কেন এ মূল সমস্যা নিরাকরণ হতে পারছে না তার অনেকগুলো কারণ দেখিয়েছি—বাইরের বাজার, কাঁচামালের অভাব প্রভৃতি। কিন্তু সে কারণে তো শ্রমিক সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। অথচ জাপানী শ্রমিকের অসন্তোষ তেমন ভাবে ফেটে পড়ে না যেমন ভাবে তা এমন কি ভারতবর্ষেও দেখা দেয়। গত বছর জাপানী মজুরেরা শ্রমিক নেতা সোহুর

(Sohyo) নেতৃত্বে মাসিক ছু পাউণ্ড (প্রায় ছাব্বিশ টাকা) মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলন শুরু করে। দাবী ছিল জাতীয় শ্রমিক মজুর রেট হবে আট পাউণ্ড (প্রায় একশ' টাকা)। পরিণামে কিন্তু ন' শিলিংএ (প্রায় সাত টাকা) মিটমাট হয়। শ্রমিক-মালিক সম্বন্ধটা ইয়োরোপীয় অথবা আমাদের দেশের মত গড়ে ওঠেনি বলে শ্রমিক অসন্তোষও এদেশের মত দেখা দেয়নি।

ভারতবর্ষের মত জাপানেও যৌথ পরিবার-প্রথা গড়ে উঠেছিল। এখানকারই মত আজ সেখানে সেই প্রথায় ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সেই ভাঙ্গন আরও ব্যাপক ও বহুমুখী করে তুলেছে। কিন্তু ফকির না থাকলেও যেমন তার দরগা সিন্নী পেয়ে আসে ঠিক অনুরূপ কারণেই যৌথ-পরিবার ধ্বংসোন্মুখ হোলেও গ্রামের যুবক যুবতী শহরে কর্ম-সন্ধানে বিফল হয়ে ফিরে এসে এখনও আশ্রয় নেয় পল্লীর সেই যৌথ-পরিবারের মধ্যে। জাপানে বেকার সমস্যার প্রায় সমস্ত চাপটাই, ভারতবর্ষের মত, পড়ে আছে গ্রামীন কৃষক-জীবনের ওপর। যেমন আমাদের দেশে তেমনি জাপানেও আরও দ্রুততালে শিল্পোন্নতির মারফৎ অতিরিক্ত মানুষ গুলোকে কাজে লাগানো একটা প্রকাণ্ড সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে।

দু' দেশের সমস্যা বাইরে থেকে দেখলে মুলতঃ একই মনে হয়। কিন্তু ইতিহাসের দৃষ্টিতে তা' নয়। একদা এই রকমের দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানে উগ্র সামরিক চিন্তাধারা দানা বেঁধে উঠেছিল। সে খুব বেশিদিনের কথাও নয়। অসহনীয় অবস্থায় পড়ে সেদিন পল্লী জাপানের জমিদার আর কৃষিকাজে বিফল মনোরথ হয়ে চাষীরাই দেশে এক সমরলিপ্সু দানবকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল জনসাধারণের বাঁচার দাবীকে রূপায়িত করে তুলবার জন্যে। ১৯২৮ সালে এই নতুন চিন্তাধারার অভ্যুত্থানে জাপানের সামাজিক আর রাষ্ট্রীয় জীবনের অসংখ্য খানা-খন্দর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল সেই পুরনো স্লোগান আর সামুরাইদের প্রেতাত্মা

গোটা গ্রামীন জাপানকে তারা জাগিয়ে তুলেছিল এক দেশজোড়া সবল ধ্বনিতে—সম্রাটকে সর্বশক্তিমান করো। হাজার হাজার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও সিণ্টো মন্দির থেকে আবালবৃদ্ধবনিতার মনকে ক্ষাত্র শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করতে চাইল তারা। অগণিত কণ্ঠে ধ্বনিত হোতে লাগল—জাপানী সাম্রাজ্যের নয়া সীমানা নির্ধারণ করবার দাবী। মুখে মুখে গোটা দেশটায় ছড়িয়ে পড়ল যে সাইবেরিয়ার আমুর নদের তীর পর্যন্ত এলাকা হোল জাপানের। ব্লাক ড্রাগন সোসাইটি, আমুর সোসাইটি, তানাকা মেমোরিয়াল মারফৎ সে-সব দাবী দৃঢ় হোল।

শহরে প্রথম-মহাযুদ্ধের আশীর্বাদে পুষ্ট বণিক সভ্যতার কাঁচের ঘরে লালিত জাপানী রাজনীতিজ্ঞেরা আর কর্মক্ষম প্রবীনেরা হকচাকয়ে উঠলেন পল্লীঅঞ্চলের এই নবাগতদের দ্বারা পুষ্ঠ বালষ্ঠ উন্মাদনায়। “দাই নিপ্পন” সামরিক মতবাদে দীক্ষিত হতে বিলম্ব হোল না তাদের। নবীন সামরিক অফিসারদের অধি-কাংশই এলেন গ্রামের ছোটখাট জমিদার ও চাষী পরিবার থেকে। বৈচিত্র্যহীন একঘেঁয়ে সমস্যা সংকুল চাষবাসের জীবন আর জাপানী বর্ণাশ্রম সমাজের নিগড় মুক্ত হয়ে তারা চেয়েছিল নতুন সামরিক জীবনের রূপ, রস, গন্ধ ও রোমাঞ্চ। একঘেয়ে পল্লীজীবন তৃপ্তি পেতে চাইল সামরিক জীবনের উন্মাদনাময় অধিকার প্রতিষ্ঠায়।

সর্বাত্মক ক্ষমতা হরণের সংগ্রাম শুরু হোল। বণিক আর শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্নেহে পুষ্ট ডিমোক্রাটিক পার্টির যে কোয়ালিসন সম্রাট মুৎস্যোহিতের (মেইজী) আমল থেকে সরকারী কাজ চালিয়ে আসছিলেন অকস্মাৎ একদিন স্থল এবং নৌ-সেনা-বাহিনীর এইসব যুদ্ধবাজদের উগ্র ক্ষাত্রবাদের সামনে দাঁড়াতে পারল না। ১৯৩০ সালের অর্থ-নৈতিক সংকট, ইঙ্গ-আমেরিকার জাপান-বিরুদ্ধ বিধি-ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি অতিরিক্ত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ সেদিনকার পার্লামেণ্টরী শাসনকে কোনঠাসা করে দিল। মন্ত্রীসভাকে প্রকাশ্যভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে তানাকা-মেমোরিয়ালে প্রদর্শিত সমরাভিযানের পথে এগুতে

লাগল পল্লী-জাপান থেকে আগত নবাগত যুদ্ধবাজ অফিসারেরা আর তাদের পেছনে থাকল অক্লান্ত কর্মী ও নতুন অধিকার প্রাপ্ত জাপানী চাষা-ফৌজ। মেইজী আমল থেকে যে শাসন যন্ত্র চলে আসছিল তা' হয়ে গেল অচল। প্রধানমন্ত্রী ইনুকাই (Inukai) জীবন দিলেন এদের হাতে, কেননা তিনি সমরাভিযান সমর্থন করতে পারেন নি। ১৯৩৬ সালের ইলেকসনে দেখা গেল দেশের লোক তখনও পার্লামেণ্টারী প্রথায় দেশ-শাসন চায়। দেশের লোকের প্রতিনিধি হোল জাপানের উদারনীতিক দলের লোকেরা। যুদ্ধবাজদের চোখে ওঁরা ছিল ঘৃণ্য জাব। তাই তারা বৃথা সময় নষ্ট না করে এমন আঘাত মারল যা'র নজার মেইজী যুগের জাপানে নেই। ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের এক প্রত্যুষে ২৬ জন নবীন আর্মি অফিসারেরা তাদের সৈন্যদল নিয়ে আক্রমণ করল সেই সব পার্লামেণ্টারী দলপতি ও মন্ত্রাদের। এদের হাতে নিহত হলো নামকরা অনেক ধুরন্ধরেরা। প্রধান মন্ত্রী অকাদা (Okada) এবং প্রিন্স সায়নজি (Prince Saionji) কোনো প্রকারে প্রাণ বাঁচাতে পারলেন কিন্তু জেনারেল ওয়াটনবে (General Watanbe) এবং সর্বমান্য অর্থমন্ত্রী তাকাহাসি (Takahashi) এবং সম্রাটের প্রিয় বান্ধব ও প্রিভি-কাউনসিলর এ্যাডমিরাল সায়তো (Admiral Saito) এদের হাতে নিহত হোলেন। ১৯৩২ সালে প্রধান মন্ত্রা ইনুকায়কে যখন এরা খুন করেছিল তখন সায়তো এই সব যুদ্ধবাজদের সমর্থনে হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু ১৯৩৬ সালের এই বিদ্রোহীদের কাছে তিনিও হয়ে পড়লেন অপদার্থ ও অক্ষম এবং খেসারৎ স্বরূপ প্রাণ হারালেন এদের হাতে। এ বিদ্রোহীরা চেয়েছিল জাপানের মাটি থেকে পার্লামেণ্টারী প্রথার চিরবিদায় দিয়ে সেই পুরনো সামুরাই ক্ষাত্র সরকার প্রতিষ্ঠা করতে। ভাগ্যিস জাপানে সম্রাটকে দেবতা জ্ঞানে পূজা দেবার রীতি অক্ষুন্ন ছিল সেদিনও, তাই যখন সম্রাট নিজে এসে দাঁড়ালেন উদ্যত অস্ত্রের নীচে সে অস্ত্র

অনায়াসেই সেদিন নিরস্ত হয়ে গেল। হত্যাকারী অফিসারদের অবশ্যই শাস্তি পেতে হোল কিন্তু শাসন-যন্ত্র করায়ত্ত হয়ে পড়ল এই সব সমরলিপ্সুদের হাতে। তারপর ধাপে ধাপে, একের পর আর এক সমরাভিজানের পথে চলতে শুরু করল জাপান এবং তার সীমা-রেখা টেনে দিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিপর্যয়।

আজ জাপানের অবস্থা সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরের দিনের অনুরূপ। জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে, ব্যবসা বাণিজ্যের যতই সাময়িক সাফল্য আজ তার প্রাপ্য হোক না কেন, জাপান জানে অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে আর কোনোদিনই তার বাণিজ্য-সম্ভার পৃথিবীর বাজারে বেপরোয়া ভাবে চলতে পারে না, সর্বোপরি পরাজয়ের আঘাত ও জাতীয় অপমানের গ্লানি সর্বক্ষেত্রেই তাকে অনুভব করতে হচ্ছে ও হবে। এই নতুন পরিস্থিতিতে যদি সনাতন কৃষি সমস্যা এসে পড়ে তবে কি জাপান পুনরায় যুদ্ধাভিযানের পথে পা আর না বাড়িয়ে থাকতে পারবে? এই সর্বনাশা পুরনো পথ এড়িয়ে নতুন পথে এগিয়ে যাবার মত সুনির্দিষ্ট কোনো নীতির সন্ধান তার জানা আছে বলে তো মনে হয় না।

জাপানী মেয়ে

জাপান যাত্রার পূর্বে মনে মনে একটা সংকল্প করেছিলাম যে ও দেশের মেয়েদের বিষয়ে কোনো কিছু শুনবনা, আলোচনা করবনা বা ভবিষ্যতে লিখবও না। স্ব-বিচারে এটুকু দৃঢ়মত পোষণ করি যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কোনোও নতুন দেশের সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে, বিশেষ করে মেয়েদের বিষয়ে কোনো অকাট্য সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যেমন অসাধ্য তেমনি দুঃসাহসিকও বটে। এতে মারাত্মক ধরণের ভুল বুঝবার অবকাশ তো আছেই উপরন্তু পাঠকের মনেও অযথা অনেক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টিও হোতে পারে।

কিন্তু এখন খোলাখুলি ভাবে কবুল করতে বাধা নেই যে স্বকৃত সংকল্প নিজেই রক্ষা করতে পারিনি। টোকিও বিমানঘাঁটিতে নেমেই কিমোনো-পরা প্রজাপতির মত জাপানী মেয়ের দর্শন লাভে সে সংকল্প উবু উবু হোয়েছিল। এবং যেদিন টোকিওর ভারতীয় দূতাবাসের কে, এন, গিয়েন্দর বাড়ীতে আমরা রাত্রের ডিনারে উপস্থিত হোলাম সেদিন সংকল্পের দৃঢ়তা আপনা থেকেই আল্‌গা হয়ে পড়ল।

ডিনারে আমাদেরই মত উপস্থিত ছিলেন গিয়েন্দ ও গিয়েন্দ-গৃহিনীর জাপানী বান্ধব ও বান্ধবীরা। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন মহিলা, ওদেশের ইন্দো-জাপানীজ কালচারাল্ এসোসিয়েসনের সদস্য। একজন তো ছিলেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র ডাইরেক্টরের স্ত্রী এবং নিজে একজন নাম করা সোস্যালিষ্ট নেত্রী।

এঁদের সঙ্গে আলাপটা জমে উঠল একটা হাল্‌কা বিষয়ের আলোচনার মাধ্যমে। গিয়েন্দ-গৃহিনী পরিসেবিত ভারতীয় ধরণের ভূরিভোজে মেজাজ হ'য়েছে তখন দিলখোস—আর আলোচ্য
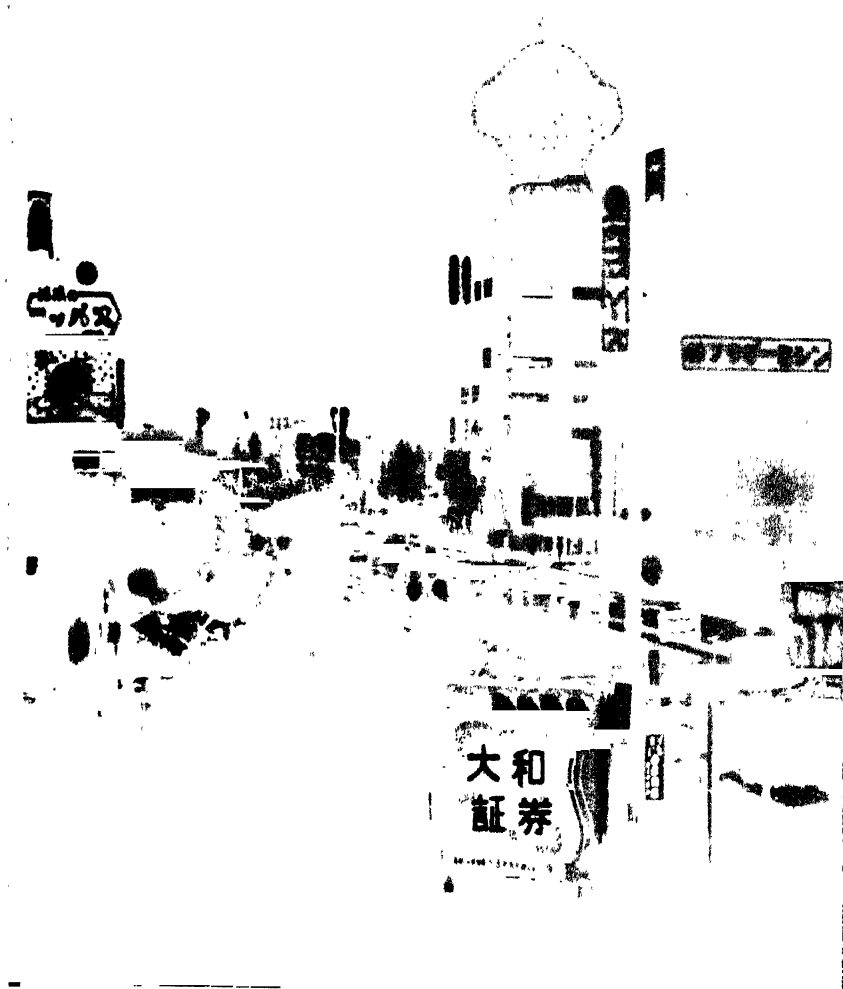
আলোকমালায় সজ্জিত নতুন জাপান

(টোকিও দৃশ্য)

জাপানী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তার শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে প্রকাশিত। রাস্তাঘাটে, দোকানে, বাজারে, ট্রামে-বাসে সবত্র যে সুশৃঙ্খল পথচারীদের ভীড় চোখে পড়ে তা থেকেই প্রমাণিত হয় জাপানীরা কত সমবায়-ভাবাপন্ন।

টোকিও প্রাসাদে নেহরু। সম্রাট হিরোহিটো, সম্রাজ্ঞী নাগাকো ও যুবরাজ আকিহিটোর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন সকন্যা নেহরু।

শ্চম-বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়
৯৫৬ সালে জাপান-ভ্রমণে গেলে জাপানের
দানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মিঃ ইচিরো হাতোয়ামা
ীয় ভবনে তাকে সাদর আমন্ত্রণ করেন।

কয়োটার হিয়ান মন্দিরে ভারতীয়
ংবাদিকেরা। মন্দিরটির স্থাপত্য উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষের বর্তমান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন চীন-যাত্রার পথে আকস্মিক ভাবে টোকিওতে উপনীত হলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন জাপানের তদানীন্তন বৈদেশিক মন্ত্রী মিঃ মামোরু সিগেমেৎসু।

জাপানের অর্থমন্ত্রী ও ভারত-জাপান এ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ হিসাতো ইচি-মাদার সঙ্গে ভারতের দূত শ্রীচন্দ্রশেখর ঝা।

ভারতীয় দূতাবাসের অভ্যর্থনায় নেহরু সাক্ষাৎ পেলেন
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস-লেখক,
৮৩ বছরের বৃদ্ধ কিমানি তেনাকোর।

জাপানের বর্তমান প্রধান-মন্ত্রী মিঃ নবস্থকে কিসি (বাঁয়ে),
সোসালিস্ট পার্টি-নেতা মিঃ মোসাবুরো স্তজুকী (মাঝে)
এবং সেক্রেটারী-জেনারেল মিঃ ইনাজিরো আসানুমা।

কাটস্থরা-বাগের চন্দ্রালোক প্রাঙ্গণে লেখক দাঁড়িয়ে আছেন।

নিক্কো হল জাপানের এক নম্বর দর্শনীয় স্থান। এই তীর্থ-ধামের অতি-আধুনিক হোটেল-উদ্যানে ভারতীয় সাংবাদিকেরা জাপানের বৈদেশিক দপ্তরের জনৈক বন্ধুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন।
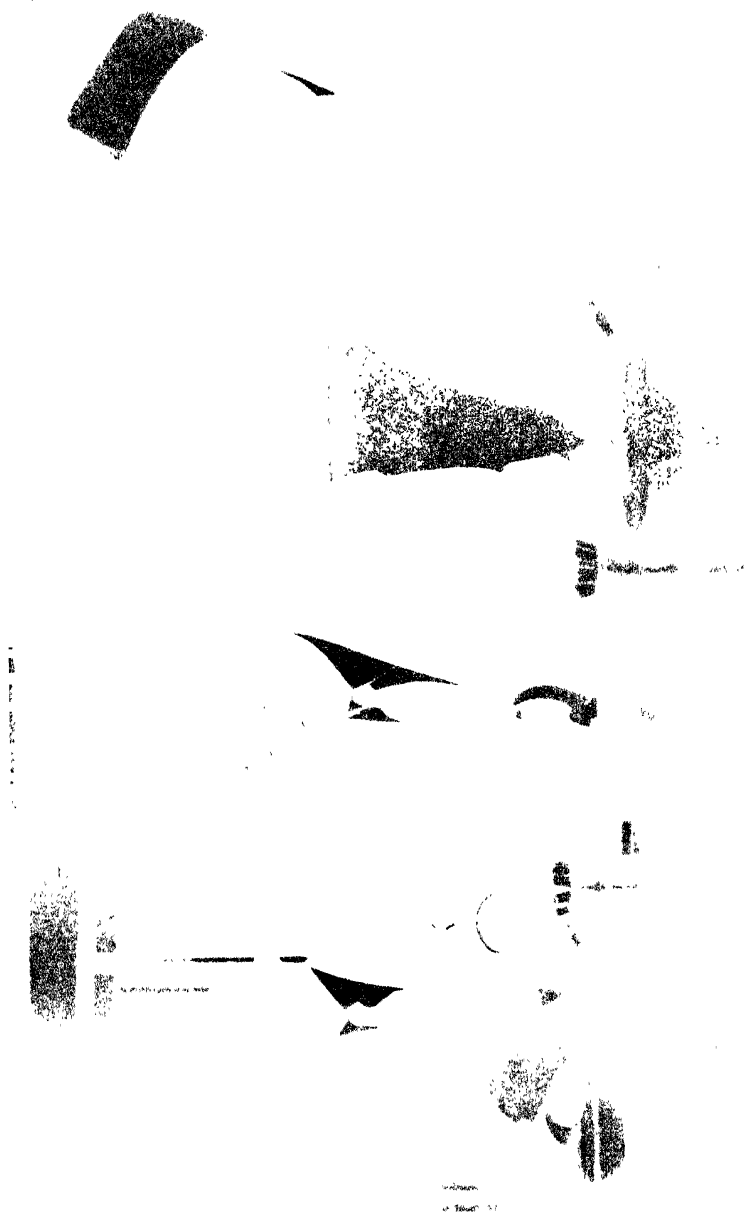
জাপানের সর্বাধিক প্রচারিত "আসাহী সিমবুন" পত্রের বন্ধুরা আমাদের আমন্ত্রণ করলেন। চিত্রে (ডান দিক থেকে) ওয়াগ লে. মোরেন ও লেখককে দেখা যাচ্ছে।

বিখ্যাত আমেরিকান সংবাদপত্র "ক্রিশ্চিয়ান
সায়েন্স মনিটর"এর ফরেন করেস্পণ্ডেণ্ট
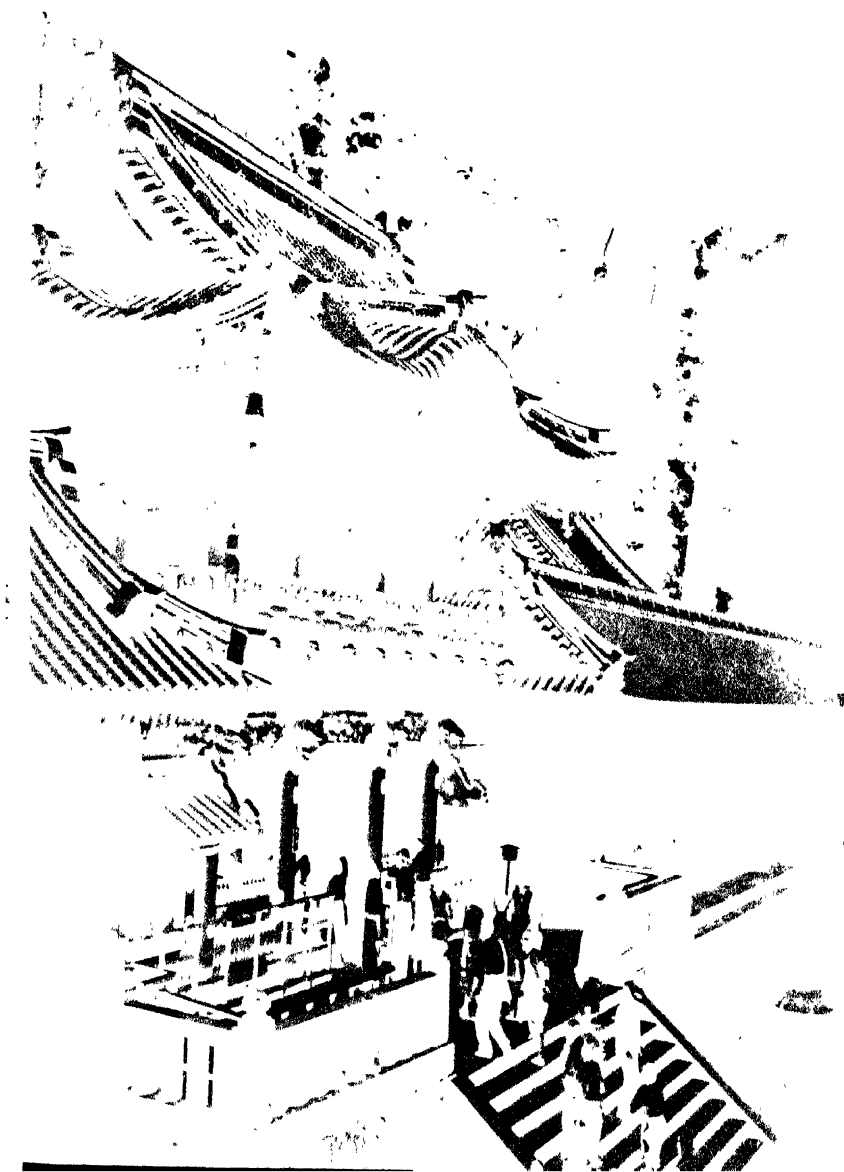
নিক্কো দেখে মনে হয় কোনো ঋষির আশ্রম।
মন্দির-দ্বারটি রঙে, অলংকারে মনোমুগ্ধকর।
প্রতিটি পদে চিত্র ও ভাস্কর্যের পরিচয়।
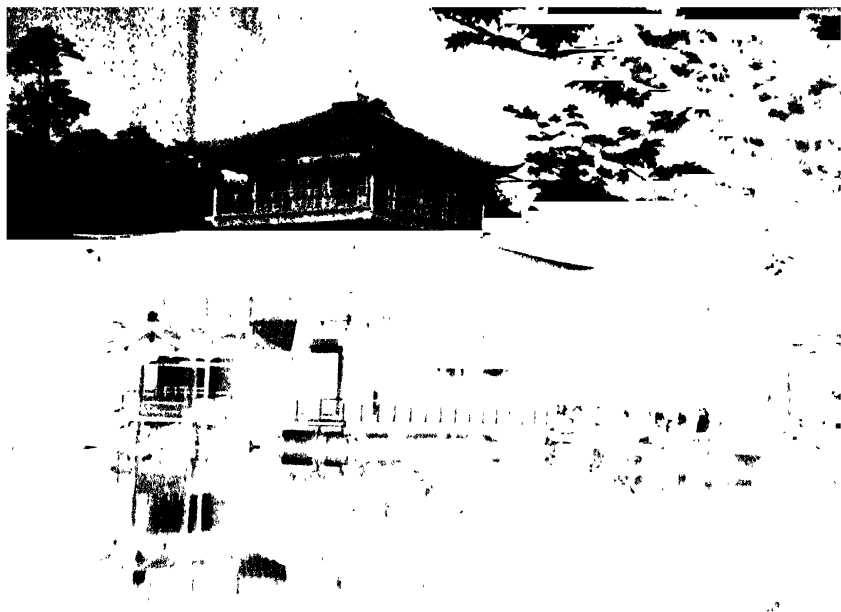
৬০০ বছর আগেকার কিয়োটোর কিংকানজী (স্বর্ণ) বৌদ্ধ-মন্দির।

মিয়াজিমার দ্বীপময় ইত্‌সুকুরা মন্দির ও তারই অনতিদূরে সমুদ্রের মধ্যে গড়ে তোলা লাল তোরণ।
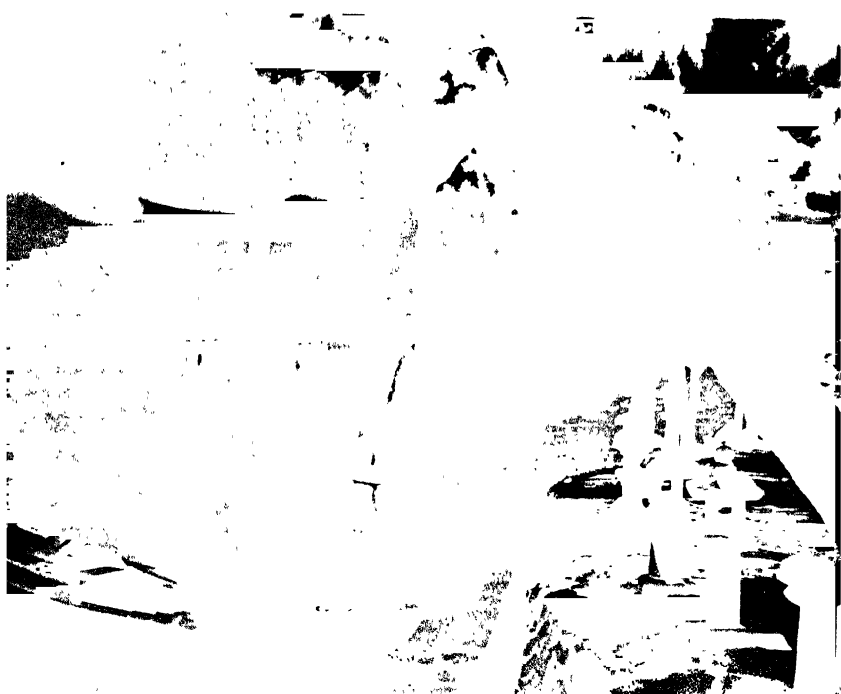
বসন্তে চেরী ফুটলে সমস্ত জাতটা পাগল হয়ে ওঠে।
গায়শা-নর্তকীরা চেরী ফুলগাছের নীচে এসে শুরু করে
নাচ আর তা দেখতে বেরিয়ে পড়ে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা

ডাইনে বিরাট সমুদ্রের প্রশস্ত ঘাট। কতো ক্ষুদ্র দেখাচ্ছে
কামাকুরার মানুষগুলোকে সেই প্রশান্ত মহাসাগরের কিনারে।

বনেদী কিয়োটোর বনেদী গায়শা-গৃহ যেন পুরানো জাপানের জীবন্ত উডকাট ছবি। গৃহে অভ্যর্থনার বিরতি-মুহূর্তে মাইকো (গায়শা-নবিস) মেয়েদের আলাপ সম্ভাষণ।

কিয়োটোর গায়শ। দাঁড়িয়ে আছেন প্রাচীন হিয়ান্
মন্দির প্রাঙ্গণে। সংস্কৃতির দিক দিয়ে হাজার
হাজার বৌদ্ধ ও শিণ্টো মন্দিরে শোভিত এই
কিয়োটো-ধাম জাপানে একমেবাদ্বিতীয়ম।

হরেক রকমের কিমোনো-পরা গায়শা নারীদের
পরিচ্ছদ-প্রদর্শনী ব্যবস্থা করে থাকে শহরের
ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরের মালিকেরা।

টোকিওর শহরতলী। মেয়ে পুরুষ কতটা স্বদেশী
বেশ-ভূষণ ছেড়েছে তার পরিচয় মেলে ছবিতে।

জাপান চারুকলার দেশ। তাই গাইশা-প্রথা বিস্তৃতির সঙ্গে এসেছে বিবিধ সাজ সজ্জা, আদব কায়দা আর শিল্পের চটক।
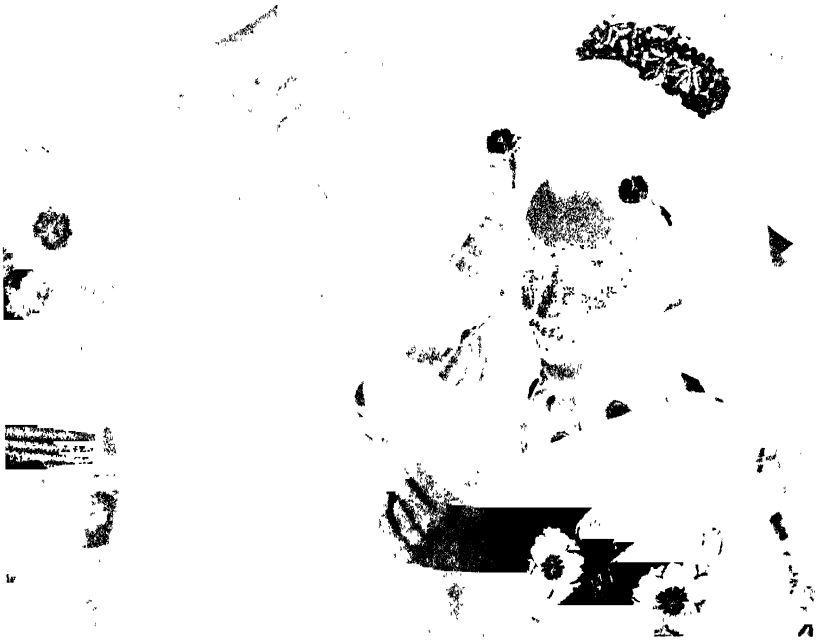
অভিনয়ের পূর্বে গায়শা-নটীর বেশবিন্যাস। সামসেন একতারার
তালে তালে গায়শা-দেহলতা ক্ষণপরেই ছন্দোময় হয়ে উঠবে।

বল রুমের নাচ, 'ট্যাকসি গার্ল' নাচ, গায়শা নাচ, নাইট
ক্লাবের হুল্লোড়ের দৃশ্য ও হাস্য-পরিহাস টেলিভিসন যোগে
জাপানের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থাও হয়েছে।
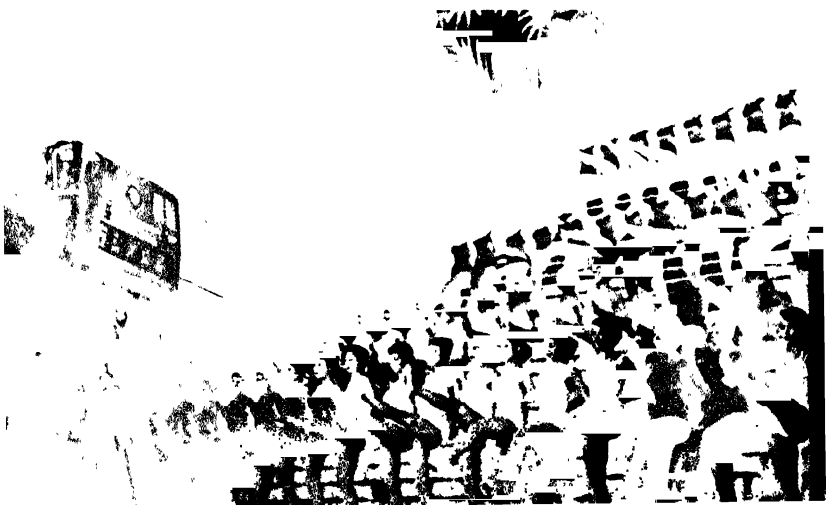
ফিল্মে যে-সব কাহিনী সবচেয়ে জনপ্রিয় তা হল অতীত জাপানের সামরিক গৌরব কাহিনী।

সম্রাটকে পুনরায় দেবতারূপে পেতে চান এঁরা। এঁদের বিশ্বাস সম্রাট সর্বশক্তিমান হলে জাপানের কল্যাণই হবে।
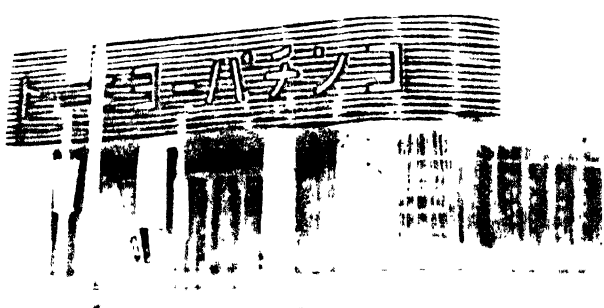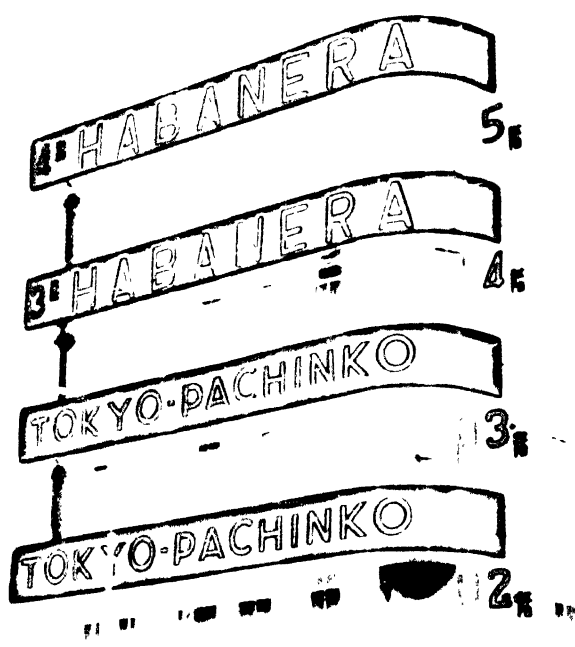
রাতে পাঞ্চিকোর আড্ডা যে রূপসজ্জায় আলোকিত হয়, তা চোখে দেখবার মতো। আর দিবারাত্র উদ্দেশ্যহীন মেয়ে-পুরুষ সেখানে আড্ডায় আসে গলায় বেঁধা সময় কাটাবার জন্যে। শুধু টোকিওতেই ৩৫৩০টি পাঞ্চিকোর আড্ডা আছে।

টেলিভিশনে ছবি দেখতে শহরের লোক ভেঙে
পড়ে রাস্তায় আর পার্কের মোড়ে মোড়ে।

গামবুট পরা জাপানী চাষী তাঁর স্ত্রী কন্যার সঙ্গে
জমিতে লাইন ধরে ধান-চারা পুতে চলেছে।

পাহাড়ের গায়ে গায়ে জাপানী চাষীরা
করে চলেছে সারি সারি (টেরাস) চাষের
ব্যবস্থা। প্রাণপাত করে তারা মাটি থেকে
যতটা সম্ভব বেশী ফসল আদায় করতে।
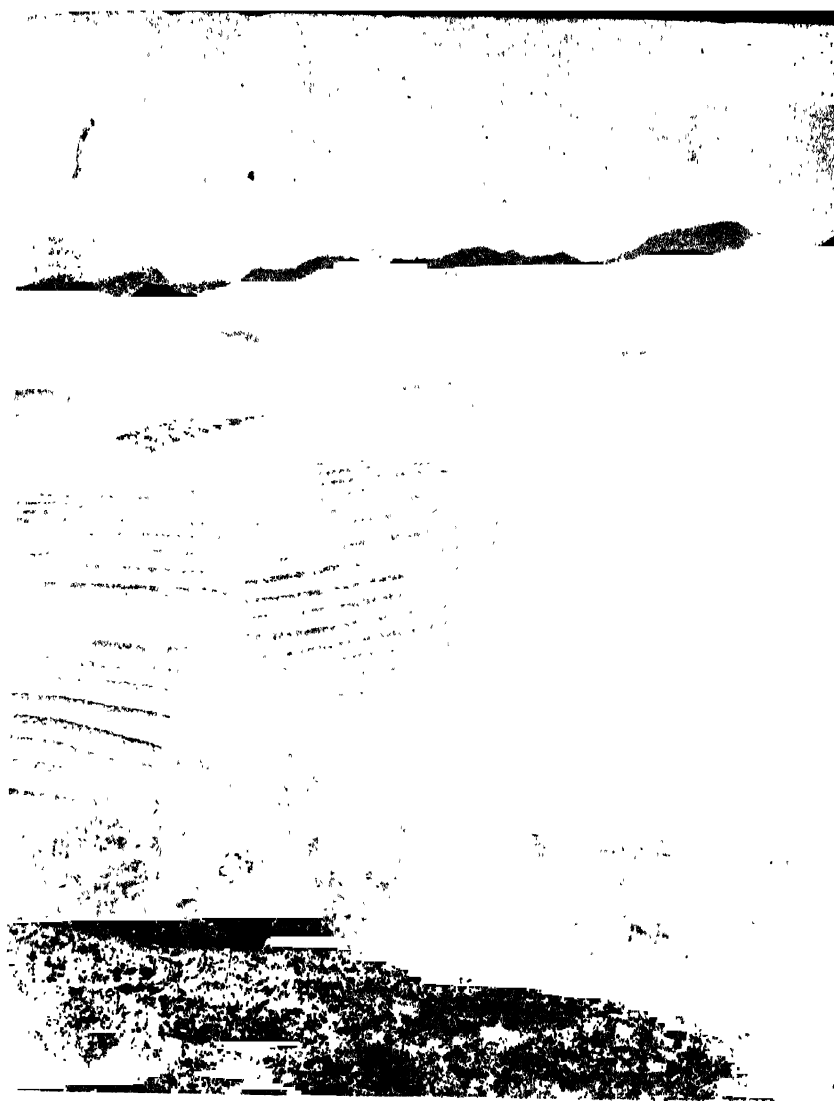
গরজের তাগিদে চাষ এমন কি পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত ঠেলে নিতে হয়েছে। চাষের জমি আর নেই, তাই বাধ্য হয়ে জাপানকে মনোযোগ দিতে হয়েছে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ-চাষের বদলে ছোট ক্ষেতে ব্যাপক চাষের দিকে।
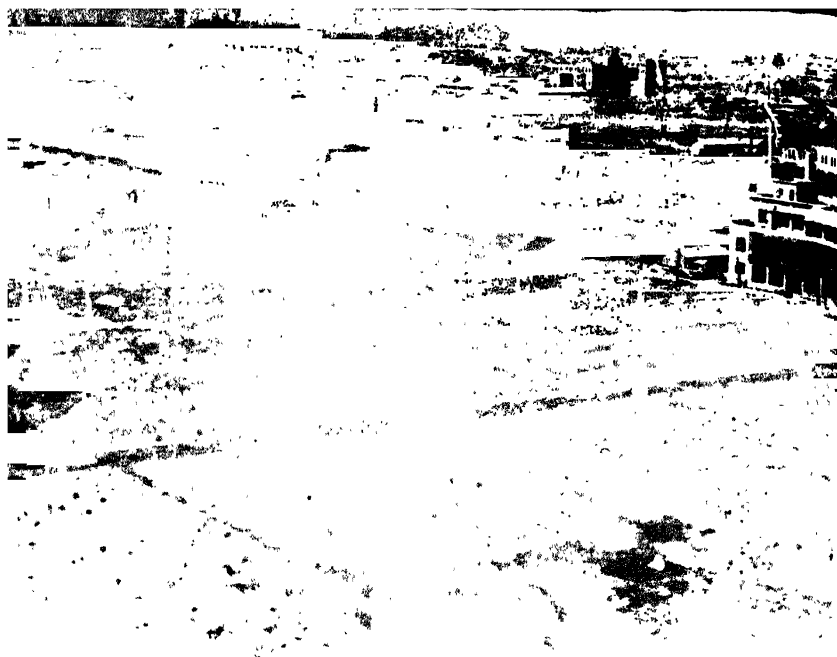
আণবিক বোমা পড়বার পর হিরোশিমার রূপ। গোটা শহরের পাঁচ মাইল পরিধির মাঝে কেবল সতেরোখানা কংক্রীটের বাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আমরা এলাম হিরোশিমার স্মৃতি-বিজড়িত পার্কে। দেখলাম হিরোশিমা-কাহিনীর স্মৃতিসৌধ।

আণবিক তেজোদুষ্ট রোগী ওসিকাওয়া হিরো
শিমার মহাপ্রলয়ে সব-হারানো এক মহিলাকে
সান্ত্বনা দিচ্ছেন। পেছনে দাঁড়িয়ে আছে
ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়মের ভাঙা বাড়িখানা।
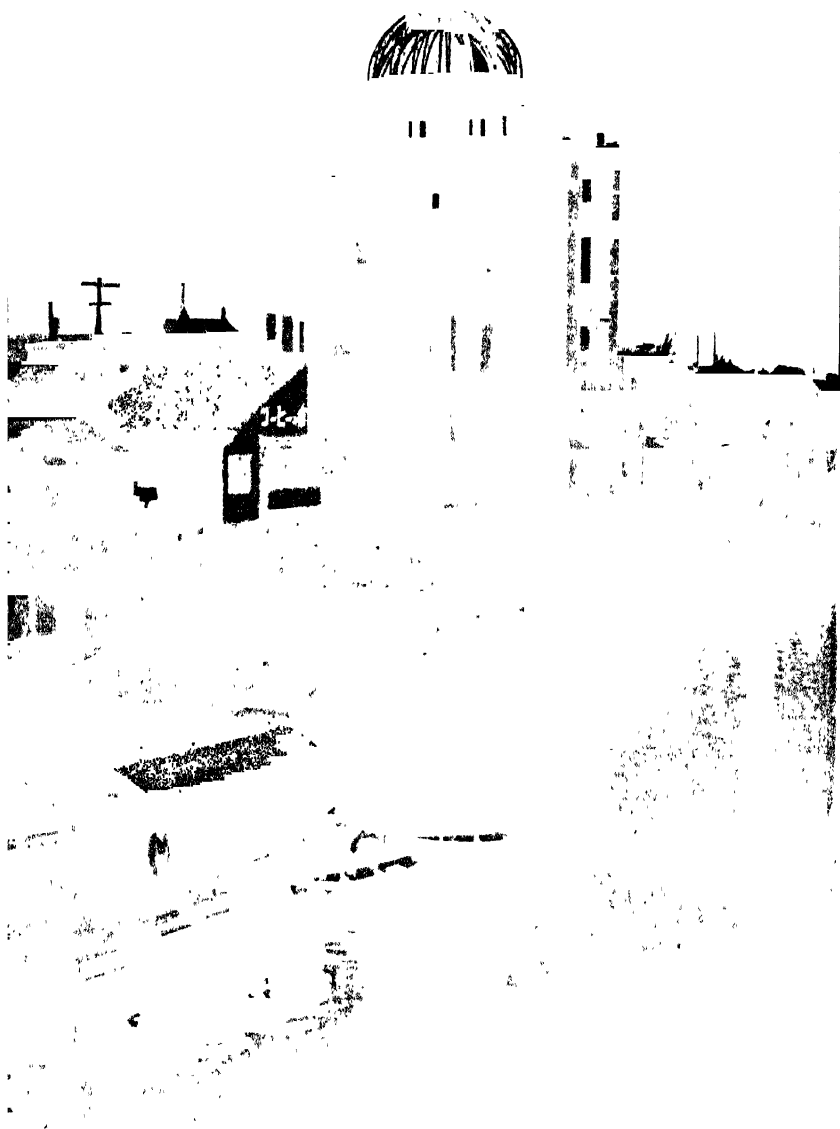
অতা (Ota) নদী-তীরে দেখা যাচ্ছে হিরোশিমার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়মের বাড়িখানা। হিরোশিমার দগ্ধ মানুষগুলো সেদিন অতা-জলে পায় নি কোনো নিরাময়। অতা-স্রোত তাঁদের নিয়ে গেল সাগর-সঙ্গমে জলজন্তুর আহার্য করে।
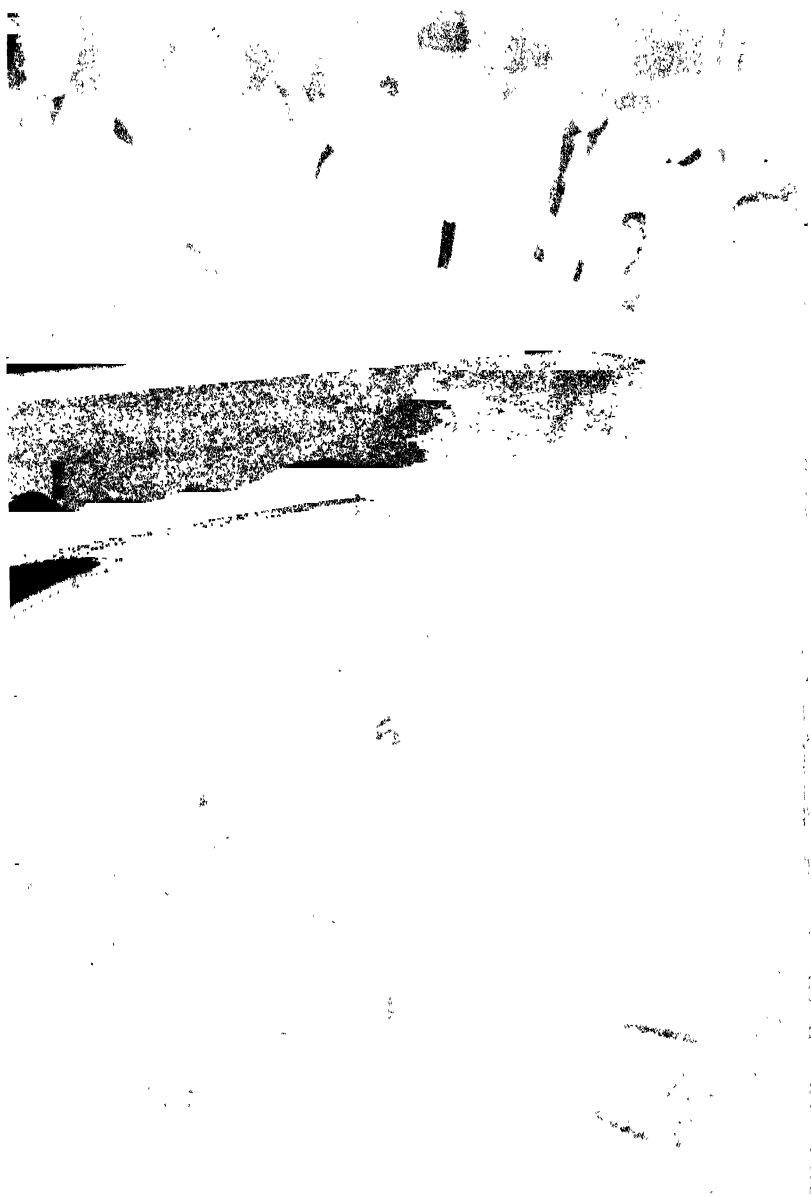
হিরোশিমার এ্যাটমিক মিউজিয়মে রক্ষিত প্রাকৃতিক ম্যাপখানা সকন্যা নেহরু হতবাক অবস্থায় দেখছেন। তাঁর আশেপাশে দাঁড়িয়ে আছে হিরোশিমার ছাত্রের দল যাদের কেউ কেউ হয়তো সেদিন সেই আণবিক যুগের জন্ম-মুহূর্ত দেখেছিল।

"প্যান প্যান" মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রতীক্ষায়। অদূরে জানালা দিয়ে ছিটকে পড়ছে বিদেশী সৈন্যদের ব্যারাক-বাড়ির আলো। যে দেওয়ালে ভর করে সে দাঁড়িয়ে আছে তাতে লাগানো আছে সে-দিনকার পোস্টারগুলো যা জাপানী মেয়েকে স্বৈরিণী হতে উৎসাহ দিত।

অনিবার্য-কারণেই পিতৃনামহীন শিশুদের আবির্ভাব হল।
এ হতভাগ্যদের নিয়েও নাকি ব্ল্যাক মার্কেট হয়ে থাকে।

যুদ্ধের পর জাপান পরের দখলে গেলে সাধারণ মানুষের সমস্যার অন্ত ছিল না। রাতে স্টেশন প্লাটফরমে কিউ করে শুয়ে থাকতে হত যাত্রীদের ভোরের গাড়ির টিকেট কেনার প্রত্যাশায়।
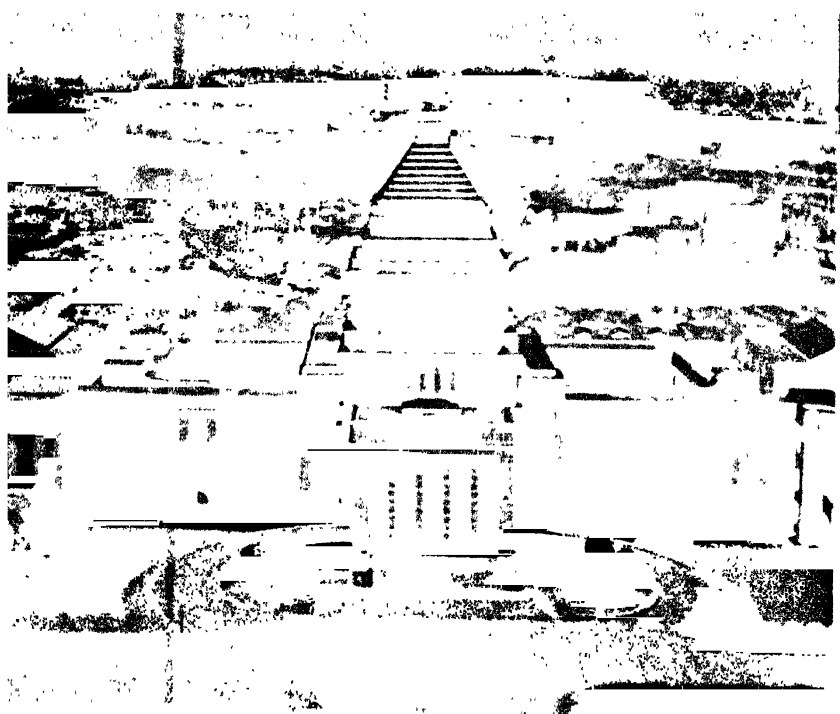
ডায়েট-পার্লামেন্টের বিরাট প্রাসাদ ক্যামাফ্লেজ করে যুদ্ধের সময় রক্ষা করা হয়েছিল আগুনে বোমার হাত থেকে। আজ তার স্বরূপ প্রকাশিত। ভবনের আশেপাশে গড়ে উঠেছে আধুনিক ধরনের বাড়িঘর, রাস্তাঘাট।
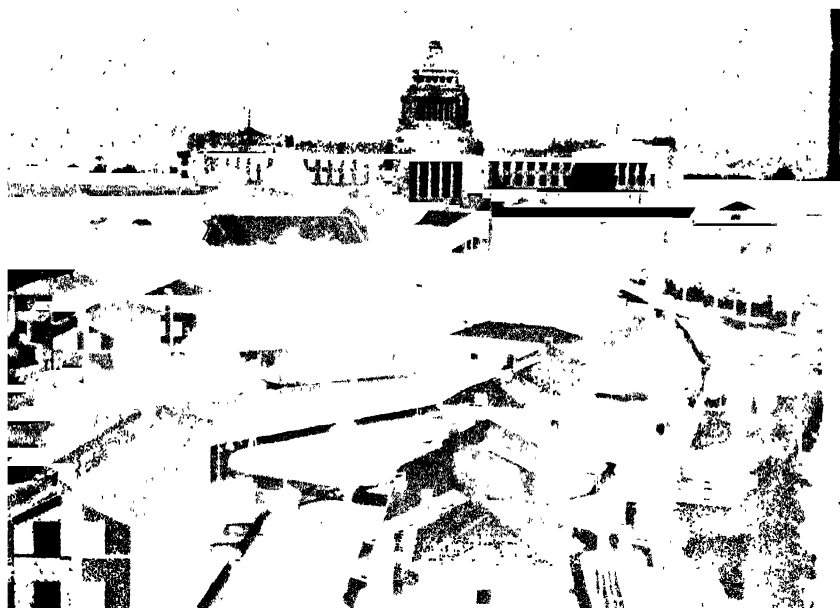
ব্রিটিশ উপনিবেশ-দপ্তরের সেক্রেটারী সস্ত্রীক দাঁড়িয়ে আছেন চীন হংকং সীমান্তে সামচুন নদীর রেলওয়ে ব্রীজের ওপর।

চীন: রিফিউজিদের জন্যে হংকং কর্তৃপক্ষ বানিয়েছেন বিরাট বিরাট সুউচ্চ ব্যারাক-বাড়ি।
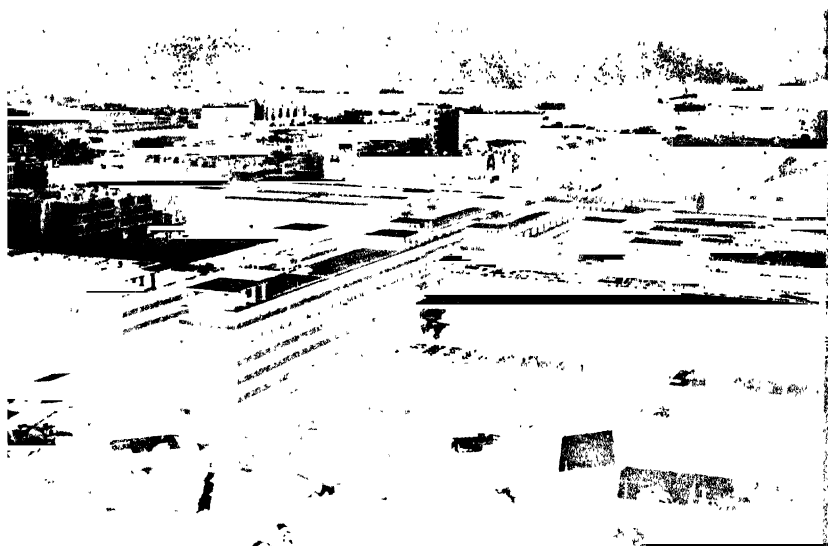
বস্তু হোল ফুল। সত্যি বলতে কি ফুলের সম্পর্কে জাপানী মেয়েদের মত আর কেই বা আলোচনার অধিকার রাখে?

ওঁদের কাছ থেকে অনুরোধ এল ইংরেজী "লোটাস" শব্দের ভারতীয় প্রতিশব্দ দেবার জন্যে। পদ্ম, কমল, পঙ্কজ ইত্যাদি কয়েকটী জানা প্রতিশব্দ আমরা আউড়ে গেলাম। কিন্তু এত অল্পে তাঁরা সন্তুষ্ট হোলেন না। মনে মনে চিন্তা করছি আর কি প্রতিশব্দ থাকতে পারে। চাইলেই অমর-কোষ হাতের কাছে পাওয়া যাবে না তা' জানতাম। তাই আর কি বলা যায় চিন্তা করছি এমন সময় ধাঁ' করে একজন বলে বসলেন, পদ্মের জাপানী প্রতিশব্দ "হেনা"র অনুরূপ কোনোও শব্দ ভারতীয় ভাষায় আছে কি? হাসনু-হেনা ফুলটী কি গোত্রের?

এবার ধরতে পারলাম ওঁদের প্রশ্নটীর ধারা। নিবেদনে জানালাম পদ্মকে ভারতবর্ষে হেনা বলা হয় না, তবে ঐ নামে খুবই আদৃত ও সুগন্ধ ফুল দেখতে পাওয়া যায়, বিশেষ করে উত্তর ভারতে। নামটীর গঠন-পরিচয় থেকে মনে হয়, ফুলটি পুরোপুরি ভারতীয় জাতের নয়। বোধহয় ইরান থেকে মোঘল বাদশাহদের অনুকম্পায় ভারতবর্ষে এসে থাকবে। পদ্মের ও হেনার সৌন্দর্য এবং সৌরভ, আকার ও প্রকৃতি ভিন্ন ধরণের।

আলাপ জমে উঠল। এবার প্রশ্ন এল ভারতের ধর্মানুষ্ঠানে বা সামাজিক গৃহানুষ্ঠানে মেয়েরা প্রতিষ্ঠা পায় কি? প্রশ্নটী যে বিপদ-সূচক তা' অনুমান করতে পারলেও উত্তর না দিয়ে গত্যন্তর ছিল না। তাই সোজা ভাবেই জবাব দিলাম এই বলে যে, সেই আদি যুগ থেকে ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে যে অনুষ্ঠানই হোক না কেন তা' মূলতঃ মেয়েলী ব্যাপার। পুরুষ এসব অনুষ্ঠানে কোনো অংশ না নিলেও হয়ত চলে কিন্তু মেয়েরা ছাড়া এসব একেবারে অচল।

জবাবটী যে ওঁদের বেশ মুখরোচক হোল তা' বেশ ধরতে

পারলাম। এবার কিন্তু সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে আলোচনার মোড় ঘুরল। জাপানী বান্ধবীরা এতক্ষণ আলোচনা করছিলেন ইংরেজীর মাধ্যমে। এখন ইংরেজী ছেড়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন নিজেদের মধ্যে স্বকীয় সাবলীল অনুস্বার অধ্যুষিত জাপানী ভাষায়। সে ভাষা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য, তবে মুখ চোখের ভাব দেখে বুঝতে দেরী হোল না যে তাঁদের মধ্যে এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা চলেছে যা ইংরেজীর মাধ্যমে রূপ দিতে তাঁরা কুণ্ঠিত। ওখানে তখন একমাত্র মাধবন নায়ার ছিলেন জাপানী-জানা ভারতীয়। বান্ধবীদের আলোচনার গোটা ধাক্কা দেখলাম সামলাতে হোল তাঁকে।

নায়ারের পরিচয় এর আগে আমরা বেশ ভাল ভাবেই পেয়েছিলাম। তাঁকে এক কথায় জাপানে ভারতের বে-সরকারী দূত বলা যায়। বেশ অনেকদিন জাপান-প্রবাসী হয়ে নায়ার এখন ওখানে সংসার পেতেছেন। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসুর দক্ষিণ-হস্ত-রূপে তাঁকে অনেক কাজে যুক্ত থাকতে হয়েছিল। পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নায়ার নেতাজী সুভাষের সংস্পর্শে এসেছিলেন। বর্তমানে টোকিওর বিখ্যাত গিন্‌জা অঞ্চলে নায়ার একটি রেষ্টুরেণ্ট চালাচ্ছেন। স্বদেশীয় খাবারের গন্ধে প্রায়ই জাপান-প্রবাসী ভারতীয়েরা হানা দেয় নায়ারের রেষ্টুরেণ্টে। শুনেছিলাম জাপানের যুবরাজ নাকি নায়ারের রেষ্টুরেণ্টের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক।

বান্ধবীদের সঙ্গে আলোচনা হঠাৎ দুর্বোধ্য ভাষার মাধ্যমে মোড় ঘুরে গেলে আমরা বেশ হকচকিয়ে গেলাম। এ ধরণটা যেমন বিস্ময়কর তেমনি অ-জাপানীও বটে। তবে মোটামুটি বুঝলাম নায়ারের সঙ্গে ওঁরা বেশ একটা তীব্র বিতর্কমূলক বিষয়ের বোঝাপড়া করে নিচ্ছেন। চারদিক থেকে প্রশ্নের ওপর প্রশ্নের উত্তর দিতে নায়ারের অবস্থা কাহিল। অবশেষে নিজেকে এই অসহায় অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় নায়ার ইংরেজী ভাষার আশ্রয়

নিয়ে আক্রমণকারিণীদের উদ্দেশ্যে বলে ফেল্‌লেন—"আপনারাই ওঁদের জিজ্ঞেসা করুন না কেন?—আমার পক্ষে অসম্ভব।"

নায়ারের ছোট্ট উক্তিটি বেশ পরিষ্কার করে দিল যে ওঁদের বিতর্কের বিষয়-বস্তু হালে এমন একটী সূক্ষ্ম স্তরে পৌঁছেছে যে হয়ত শালীনতার সীমারেখা ছুঁয়ে যাচ্ছে। তাই খুব সম্ভব জাপানী বান্ধবীরা তাঁদের প্রশ্নটী আমাদের জ্ঞাত্যার্থে নায়ারকে উপস্থিত করতে অনুরোধ জানাচ্ছেন। নিজেরা সোজাসুজি প্রশ্ন করতে চান না, পাছে আমরা ক্ষুব্ধ হই।

জানিয়ে দিলাম যে প্রশ্ন করতে সংকোচ করবার কোনোই কারণ থাকতে পারে না। বন্ধুভাবে সবাই মাত্র এক ক্ষণিকের জন্যে মিলেছি, যদি কোনো বিষয়ে সংশয় থাকে তা' একটু আধটু বাড়াবাড়ি হোলেও পরিষ্কার করেই নেওয়া উচিত হবে। বরং মনের সংশয় যদি মনে রেখে ফিরে যাই তবে সেটা অ-সুখেরই কারণ হবে।

নায়ার তখন জানালেন ওঁদের জিজ্ঞাস্যটী। ওঁরা জানতে চান যে ভারতবর্ষে এখনও হিন্দু বিধবা নানা ধরণের সামাজিক বাধা নিষেধের মধ্যে জীবন যাপন করেন কি না? দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁরা জান্‌তে চান যে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে কি তাঁর মেয়ের বিবাহানুষ্ঠানে, তিনি বিধবা বলেই, অনুপস্থিত থাকতে হয়েছে? নায়ারের বক্তব্য শেষ হোলে জাপানী বান্ধবীরা সপ্রতিভ ক্ষমা প্রার্থনা চাইলেন। প্রশ্নটীর পেছনকার পরিবেশ পরিষ্কার করবার উদ্দেশ্যে ওঁরা জানালেন যে হিন্দু বিধবাদের সম্পর্কে এসব কথা তাঁরা শুনেছেন ক্যাথলিক মিশনারীর কাছ থেকে। ভারতের সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে তাঁদের নিজেদের বিশেষ কোনো ধ্যান-ধারণা না থাকায় পাদ্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদ তাঁরা করতে পারেন নি।

গিয়েন্দের বাড়িতে আমরা দলে ভারীই ছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন ছিলেন অহিন্দু; তিনি এই বিতর্ক থেকে

পারলাম। এবার কিন্তু সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে আলোচনার মোড় ঘুরল। জাপানী বান্ধবীরা এতক্ষণ আলোচনা করছিলেন ইংরেজীর মাধ্যমে। এখন ইংরেজী ছেড়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন নিজেদের মধ্যে স্বকীয় সাবলীল অনুস্বার অধ্যুষিত জাপানী ভাষায়। সে ভাষা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য, তবে মুখ চোখের ভাব দেখে বুঝতে দেরী হোল না যে তাঁদের মধ্যে এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা চলেছে যা ইংরেজীর মাধ্যমে রূপ দিতে তাঁরা কুণ্ঠিত। ওখানে তখন একমাত্র মাধবন নায়ার ছিলেন জাপানী-জানা ভারতীয়। বান্ধবীদের আলোচনার গোটা ধাক্কা দেখলাম সামলাতে হোল তাঁকে।

নায়ারের পরিচয় এর আগে আমরা বেশ ভাল ভাবেই পেয়েছিলাম। তাঁকে এক কথায় জাপানে ভারতের বে-সরকারী দূত বলা যায়। বেশ অনেকদিন জাপান-প্রবাসী হয়ে নায়ার এখন ওখানে সংসার পেতেছেন। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসুর দক্ষিণ-হস্ত-রূপে তাঁকে অনেক কাজে যুক্ত থাকতে হয়েছিল। পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নায়ার নেতাজী সুভাষের সংস্পর্শে এসেছিলেন। বর্তমানে টোকিওর বিখ্যাত গিন্‌জা অঞ্চলে নায়ার একটি রেষ্টুরেণ্ট চালাচ্ছেন। স্বদেশীয় খাবারের গন্ধে প্রায়ই জাপান-প্রবাসী ভারতীয়েরা হানা দেয় নায়ারের রেষ্টুরেণ্টে। শুনেছিলাম জাপানের যুবরাজ নাকি নায়ারের রেষ্টুরেণ্টের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক।

বান্ধবীদের সঙ্গে আলোচনা হঠাৎ দুর্বোধ্য ভাষার মাধ্যমে মোড় ঘুরে গেলে আমরা বেশ হকচকিয়ে গেলাম। এ ধরণটা যেমন বিস্ময়কর তেমনি অ-জাপানীও বটে। তবে মোটামুটি বুঝলাম নায়ারের সঙ্গে ওঁরা বেশ একটা তীব্র বিতর্কমূলক বিষয়ের বোঝাপড়া করে নিচ্ছেন। চারদিক থেকে প্রশ্নের ওপর প্রশ্নের উত্তর দিতে নায়ারের অবস্থা কাহিল। অবশেষে নিজেকে এই অসহায় অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় নায়ার ইংরেজী ভাষার আশ্রয়

নিয়ে আক্রমণকারিণীদের উদ্দেশ্যে বলে ফেললেন—"আপনারাই ওঁদের জিজ্ঞেসা করুন না কেন?—আমার পক্ষে অসম্ভব।"

নায়ারের ছোট্ট উক্তিটি বেশ পরিষ্কার করে দিল যে ওঁদের বিতর্কের বিষয়-বস্তু হালে এমন একটা সূক্ষ্ম স্তরে পৌঁছেছে যে হয়ত শালীনতার সীমারেখা ছুঁয়ে যাচ্ছে। তাই খুব সম্ভব জাপানী বান্ধবীরা তাঁদের প্রশ্নটা আমাদের জ্ঞাত্যার্থে নায়ারকে উপস্থিত করতে অনুরোধ জানাচ্ছেন। নিজেরা সোজাসুজি প্রশ্ন করতে চান না, পাছে আমরা ক্ষুব্ধ হই।

জানিয়ে দিলাম যে প্রশ্ন করতে সংকোচ করবার কোনোই কারণ থাকতে পারে না। বন্ধুভাবে সবাই মাত্র এক ক্ষণিকের জন্যে মিলেছি, যদি কোনো বিষয়ে সংশয় থাকে তা' একটু আধটু বাড়াবাড়ি হোলেও পরিষ্কার করেই নেওয়া উচিত হবে। বরং মনের সংশয় যদি মনে রেখে ফিরে যাই তবে সেটা অ-সুখেরই কারণ হবে।

নায়ার তখন জানালেন ওঁদের জিজ্ঞাস্যটা। ওঁরা জানতে চান যে ভারতবর্ষে এখনও হিন্দু বিধবা নানা ধরণের সামাজিক বাধা নিষেধের মধ্যে জীবন যাপন করেন কি না? দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁরা জান্‌তে চান যে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে কি তাঁর মেয়ের বিবাহানুষ্ঠানে, তিনি বিধবা বলেই, অনুপস্থিত থাকতে হয়েছে? নায়ারের বক্তব্য শেষ হোলে জাপানী বান্ধবীরা সপ্রতিভ ক্ষমা প্রার্থনা চাইলেন। প্রশ্নটার পেছনকার পরিবেশ পরিষ্কার করবার উদ্দেশ্যে ওঁরা জানালেন যে হিন্দু বিধবাদের সম্পর্কে এসব কথা তাঁরা শুনেছেন ক্যাথলিক মিশনারীর কাছ থেকে। ভারতের সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে তাঁদের নিজেদের বিশেষ কোনো ধ্যান-ধারণা না থাকায় পাদ্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদ তাঁরা করতে পারেন নি।

গিয়েন্দের বাড়িতে আমরা দলে ভারীই ছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন ছিলেন অহিন্দু; তিনি এই বিতর্ক থেকে

দূরে রইলেন। কিন্তু তাঁর জায়গা পূরণ করে দিলেন বোম্বের একজন গুজরাটী যুবক। হিসেব করে দেখলাম যে আমাদের দলে উপস্থিত আছেন বাংলা, বোম্বে, পাঞ্জাব আর মহারাষ্ট্র অঞ্চলের লোক। অতএব ওঁদের আশ্বস্ত করলাম এই বলে যে, ভারতবর্ষের এই সব প্রদেশের হিন্দুদের সামাজিক আচার-পদ্ধতির খানিকটা পরিচয় তাঁরা পাবেন আমাদের জবাবের মারফৎ। প্রসঙ্গক্রমে এইখানে বলে রাখা উচিত যে অন্যান্য অঞ্চলের প্রতিনিধিদের মত মহারাষ্ট্রের প্রতিনিধির জবাবটা তেমন জোরালো হয়নি। পরে কারণটা অবশ্য বুঝেছিলাম। ভদ্রলোক সবে আমেরিকা থেকে ফিরেছেন এবং "কালাপানি" পাড়ি দিয়েছিলেন বলে দেশে ফিরে সনাতনী অনুশাসন মতে মন্দিরে গিয়ে দেবতার সামনে দেহ-শুদ্ধি যজ্ঞ করেছেন, হিন্দু সামাজিক জীবন বিশুদ্ধ রাখবার কামনায়।

আমাদের কেউই অবশ্য বান্ধবীদের সঠিক বলতে পারিনি যে শ্রীমতী পণ্ডিত সত্যি সত্যি তাঁর মেয়ের বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন কি না। কারণ, আমাদের কেউই সেই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হননি অথবা কে উপস্থিত ছিলেন বা না ছিলেন সে সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া দরকার মনে করিনি। কিন্তু ওঁদের বলেছিলাম যে বর্তমান ভারতে শ্রীমতী পণ্ডিতের থেকেও প্রবীণা অথবা নবীনা অনেক হিন্দু বিধবাকে তাঁদের পুত্র-কন্যার বিবাহে উপস্থিত ও যোগদান দিতে আমরা দেখেছি। এই সব অনুষ্ঠানে তাঁদের কোনো সামাজিক বাধা বর্তমানে সহ্য করতে হয় বলে আমাদের জানা নেই। তবে বিধবা বিবাহে শাস্ত্রীয় অনুমোদন থাকুক বা নাই থাকুক, উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে এখনও উহা অপ্রচলিত : আইনানুসারে সিদ্ধ বটে কিন্তু সমাজের কাছে অগ্রাহ্য। এটাকেই অবশ্য বিধবাদের উপর সামাজিক জুলুমবাজী হিসেবে দাঁড় করান যেতে পারে।

বিবৃতিটুকু বান্ধবীদের কাছে গ্রাহ্য বলেই মনে হোল। কারণ

ঐ বিষয়ে তাঁরা আর কোনো প্রশ্ন করেন নি। আলোচনা কিন্তু থামল না, মোড় ঘুরে আরও মনোজ্ঞ বিষয়ের উপর গিয়ে পড়ল। এবারের বিষয়বস্তু হোল—বিবাহ পদ্ধতি; ভারতবর্ষে ঘটকালী না পূর্বরাগ বিবাহ বেশী চালু—এই হোল তাঁদের প্রশ্ন।

এবারে আমাদের জবাবে কোনই দ্বিধা দেখা দিল না। সবাই প্রায় একস্বরে ওঁদের জানালাম যে আমাদের দেশে প্রায় সব বিবাহই অনুষ্ঠিত হয় ঘটকালী প্রথানুসারে। হয় বাপ মা বা আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে পাত্র-পাত্রী নির্বাচিত হয়ে থাকে। এখানে ওখানে দু' একটি ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যতিক্রম যে না হয় তা' নয়, তবে সাধারণত ঘটকালী প্রথাই বেশী চালু ও জনপ্রিয়।

জবাব দিতে দিতে ভেবেছিলাম বান্ধবীরা একথা শুনে সুখাই হবেন, কারণ এ বিষয়ে আমাদের দু'দেশে প্রায় একই প্রথা বিদ্যমান। কিন্তু তাজ্জব বনে গেলাম ওঁরা যখন মন্তব্য করলেন। তরুণী প্রশ্নকর্ত্রী ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন—ও তো দেখছি একেবারে সামন্ত যুগের ব্যবস্থা; একদম সেকেলে!

জাপানে গিয়ে শুনেছি এবং জাপান সম্বন্ধে লেখা কেতাব পড়ে ধারণা দৃঢ়ই হয়েছে যে জাপানী সমাজে আবহমানকাল থেকে চলে আসছে ঘটকালী বিয়ে। বর্তমানের বদল্‌তি জাপানে অনেক কিছু ওলট পালট হচ্ছে বটে কিন্তু সম্ভ্রান্ত ও অতি সাধারণ গৃহস্থ তো এ প্রথাই অনুমোদন করে আসছে। বহু ক্ষেত্রে এই সাবেকী প্রথা যেমন এখানে ঠিক তেমনিভাবে ওখানেও মানুষ নাচার হয়ে মেনে থাকে। কিন্তু তবুও রয়েছে প্রথাটী সু-প্রতিষ্ঠিত। শিল্প-প্রধান শহরে এদেশেরই মত ওখানেও পুরনো প্রথার কাঠামোতে অনেক নতুন রঙের ছোঁয়াচ লাগছে তাও জানি। তবে উভয় দেশের বিরাট গ্রামীন সমাজ বিবাহ পদ্ধতিতে পরিবার-কেন্দ্রিক জীবনধারার আদর্শটিকে অব্যাহত রাখতে উন্মুখ বলেই জানি। ওঁদের জাতীয় জীবনের এই আদর্শের সঙ্গে জাপানী তরুণীর

মন্তব্যটুকু যেন বিশেষ খাপ খায়না বলেই মনে হোল। আশ্চর্য হোলেও মন্তব্য শুনে কিন্তু পালটা মন্তব্য করিনি। কেন না আজকের জাপানে "মধ্যযুগের" অথবা "সামন্ত আমলের" প্রভৃতি শব্দগুলো কি অর্থে হামেশা ব্যবহার করা হয় তাও আমার কিছুটা জানা ছিল। যা কিছু ওঁরা এখন বরদাস্ত করতে না চান তাকে ঐসব শব্দগুলোর সহায়তায় তাচ্ছিল্য করে সুখী হন।

বান্ধবীর মন্তব্যটুকু শুনে জানতে চাইলাম যে ঘটকালী-প্রথা মধ্যযুগের ব্যবস্থা বলে স্বীকার করে নিলেও এ থেকে পরিত্রাণ কোথায়? ও ব্যবস্থা উল্‌টে দিয়ে কোন্ নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোলে তাঁর মতে সমাজের সর্বময় মঙ্গল হোতে পারে? অসংকোচের দৃষ্টিতে তরুণী বান্ধবী জবাবে বললেন যে আদিকালের ঘটকালী প্রথা বিয়ে নয়, লোহার নিগড় বিশেষ। স্বাধীন পুরুষ আর মেয়ে স্বাধীন ইচ্ছেয় পরস্পরকে বেছে নেবে সেই তো হোল প্রকৃত জীবনসঙ্গী ও সঙ্গিনী নির্বাচন।

প্রশ্ন করলাম এ ধরণের স্বয়ম্বর ব্যবস্থায় কি কোনো গলদ নেই? ঘটকালী প্রথা যদি ঘরণীকে ঘরের দেওয়ালের মাঝে বন্দিনী করে রাখে তবে স্বয়ম্বর প্রথায় কি গোটা ঘরটা পুড়ে ছাই হয়ে যাবার আশংকা থাকে না? তরুণী সুন্দরী আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে শান্তস্বরে ও দীর্ঘমাত্রা দিয়ে বললেন যে সাবেকী ঘটকালী প্রথায় নারী খুঁজে পায়না তার আত্মার তৃপ্তি। সে হয়ে পড়ে ক্রীতদাসী আর আত্মাবমাননার দীর্ঘশ্বাসে তার বুক ভরে ওঠে। নর আর নারীর মধ্যে পরস্পরের স্বতঃস্ফুর্ত মিলনের আকাংখা না থাকলে তাদের মিলনের মাধুর্য কোথায়?

জেদের পাল্লা না চড়িয়ে ওঁর মতবাদ মেনে নেওয়া সহজেই যেত যদি "সামন্ত যুগের" প্রথাটির সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ম্বর প্রথাটিরও ভাল মন্দ দিকটা দেখতে তিনি রাজী হোতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে

সেদিকে দেখলাম তিনি দৃঢ় চিত্ত। স্বয়ম্বর প্রথায় যে দোষ থাক্‌তে পারে তা' স্বীকার করতেও তিনি নারাজ।

আবার নিবেদন করলাম যে সনাতনী হিন্দু আর সনাতনী জাপানী বোধহয় ঘটকালী প্রথায় যাঁকে বিয়ে করেন তাঁকেই ভালবাসতে চেষ্টা করেন, আর পশ্চিমী পূর্বরাগ প্রথায় যে যাঁকে ভালবাসে তাঁকেই বিয়ে করে সুখী হোতে চান। এই তো হোল এই তুই পদ্ধতির একমাত্র দৃষ্টি-গ্রাহ্য প্রভেদ ? ব্যাখ্যা সমর্থন-যোগ্য হোল কি না জানি না তবে বান্ধবীকে নিরুত্তর দেখে মনে করে নিলাম আমার যুক্তিটা হয়ত বা মনে ধরেছে। এই ভরসায় ওঁকে জানালাম যে ঘটকালী প্রথা পুরনো হোলেও এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পারিবারিক শান্ত জীবনধারা অক্ষুণ্ণ রাখা, যাতে সে ধারায় সন্তান সন্ততিরা সহজ জীবন লাভ করতে পারে। পূর্বরাগে কিন্তু দীর্ঘ-মাত্রাটি গিয়ে পড়ে নর আর নারীর স্বাধীন ইচ্ছেরই ওপর। সেই স্বাধীন ইচ্ছের পথে যদি কোনো বিঘ্ন আসে তবে তার একমাত্র পরিণাম বিবাহ-বিচ্ছেদ, ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ জীবন বা পারিবারিক জীবন সেখানে বিবেচ্য বস্তু নাও হতে পারে।

বান্ধবী কিন্তু বিতর্কটি এভাবে অমীমাংসীত রাখতে নারাজ। ওঁর মতে সেই পুরনো ঘটকালী বিয়ের বিরুদ্ধে বল্‌বার অনেক কিছুই আছে।

ঘটকালী বিয়ে সম্বন্ধে এরপর আলাপে আমাদের নিরুৎসাহ দেখে তিনি আরও মারমুখী হয়ে পড়লেন। জোরের সঙ্গে রায় ঘোষণা করলেন ভারতবর্ষে ঘটকালী প্রথার অবসান হোক : পরিহাসচ্ছলে জানিয়ে দিলেন যে এর জন্যে যদি দরকার হয় তো তিনি নিজেই জাপানী মেয়েদের নিয়ে ভারতবর্ষে এসে অভিযান চালাবেন তাঁর ভারতীয় ভগ্নীদের মধ্যে, সেই সেকেলে মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা ছেঁটে ফেলে দেবার জন্যে।

হাসির ফোয়ারা ছুটল এবার টেব্‌লে আর আসনে। ভারতের

কোটি কোটি পুরুষের পক্ষ থেকে তাঁর প্রস্তাবে সানন্দে সমর্থন জানালাম। এবং তাঁর কাছে এটুকুও নিবেদন করলাম যে পুরনো প্রথাটি উল্‌টে দিয়ে যেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বিবাহ-বিচ্ছেদ-বিলাসী ও বিলাসিনীদের জন্যে কোনো সুষ্ঠু নতুন ব্যবস্থা করেন। আবার এক ঝলক হাসির হররা ছুটল। ভোজ শেষের আলোচনা-মুহূর্ত বেশ কেটে গেল।

খোলাখুলিভাবে স্বীকার করছি যে গিয়েন্দের ভোজসভায় বিতর্কের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে নিজেদের পরাজিতই মনে করেছিলাম। জাপানী মেয়ের সম্পর্কে আমার স্বকল্পিত প্রতিজ্ঞা খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল। বেশ প্রত্যয় হোল যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি দ্বীপময় জাপানের মাটি ছাড়বার আগে স্মিতহাসিনী জাপানী নারীকে জানবার ও বুঝবার সুযোগ না গ্রহণ করলে জাপান-দর্শনই বৃথা হবে। টোকিও বিমানপোতে নামবার মুহূর্ত থেকে বিদায় নেবার মুহূর্ত পর্যন্ত সব সময়েই দেখেছি বর্তমান জাপানের সব ক্ষেত্রেই জাপানী নারীর ভূমিকা কত ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ।

জাপানী নারী বিদেশীদের সঙ্গে গায়ে পড়ে সম্পর্ক পাতাতে ছোটে না। কিন্তু প্রতিটি পদক্ষেপেই তাঁর সত্ত্বা বিদেশীর দৃষ্টির সামনে এসে পড়ে। জাপানের সামাজিক জীবনের প্রতিটি বিশেষত্ব ফুটে উঠেছে তাঁকেই অবলম্বন করে। ঘরে ঘরে চা উৎসব, ফুল সাজানো উৎসব যা জাপানকে বিদেশীদের দৃষ্টিতে এক রূপ-কথার পর্যায়ে নিয়ে যায় তার মধ্যমণি হোল জাপানী নারী। এবং আজ গোটা জাতটার কর্মশালা মুখরিত তাঁর হাস্য কোলাহলে ও চলার ছন্দে। পুরুষ-প্রধান বর্তমান ভারতের সঙ্গে এর কোনো তুলনাই চলে না।

বিবাহ বিচ্ছেদ, পুনর্বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে জাপানী নারীর অধিকার অনেক আগেই স্বীকৃত হয়েছে। এসব সত্ত্বেও কিন্তু জাপানী সমাজ এখন পর্যন্ত পরিবার কেন্দ্রিক, ব্যক্তি-কেন্দ্রিক নয়। শিল্প ও বাণিজ্য অধ্যুষিত হয়েও যে সামাজিক জীবনের ভার-সাম্য

পরিবারের উপরে থাকতে পারে জাপান হোল তার একমাত্র উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আর সেই পরিবারের কেন্দ্রস্থলে, সুখে দুঃখে, আপন মহিমায় বিরাজ করছেন জাপানী মা ও বধূ।

তাই ওঁদের সম্পর্কে কোনো কথা বলতে গেলে এই সমাজ ও পরিবারের পরিপ্রেক্ষিতে দৃষ্টি আনত করতে হয়। সব রকমের অর্থনৈতিক ওলট পালটের মধ্যে জাপানী কুলবধূকে আজও দেখ্‌তে পাওয়া যায় ভারতীয় স্ব-গোষ্ঠির মতই শ্বাশুড়ীর কর্তৃত্বে পারিবারিক জীবনে তালিম নিতে। আর তাঁর শিক্ষা-নবিশী চলে যতদিন পর্যন্ত তিনি নিজে মাতৃত্বের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত না হন। গিয়েন্দের বাড়ীতে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে পরাজিত হোলেও এই মোটামুটি ধারণা আমার যায়নি এবং এজন্যেই শহরের পথ ঘাটে, হোটেল রেষ্টুরেণ্টে, সিনেমা থিয়েটারে, ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোর বা ফ্যাক্টরীতে জাপানী মেয়ের যে রূপ দেখেছি সেটাই যে তাঁর আসল বা একমাত্র রূপ তা' মান্‌তে এখনও রাজী নই।

সমস্ত রকমের আধুনিক বুলি ও বাচনিক বিপ্লবের কাহিনী শুনেও দেখেছি জাপানী সমাজ পরিবারকে কেন্দ্র করে দাঁড়িয়ে আছে ভারতবর্ষের অতি নিকটে। আবার এইখানেই সে সমাজ ইয়োরোপের বা অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য সমাজ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। একেবারে হাল ফ্যাশনের অতি আধুনিকাকেও বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ী এসে শ্বাশুড়ীকে সেই সনাতন কায়দায় সামনে রেখে সব অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয় জাপানে। হামেশা মন্দিরে, ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোরে, থিয়েটারে বা তীর্থে দেখতে পাওয়া যায় পুত্রবধূকে বৃদ্ধা শ্বাশুড়ীর গাইড হয়ে চলতে। পরিবারের নিজস্ব উপাধি নিজের বংশধরের দ্বারা জীইয়ে রাখবার প্রত্যাশা ভারতীয় সমাজের মত জাপানী সমাজে আজও অত্যন্ত প্রবল। যখন সেই আশা পূর্ণ না হবার কারণ দেখা দেয় তখন ভারতীয় সমাজেরই মত জাপানী সমাজে দত্তক-গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে। এবিষয়ে কেবলমাত্র ধনী জাইবাতসু শ্রেণীই তৎপর নয়

আপামর সব শ্রেণীরই এই আকাংখা বংশ-লতাটি যেন চিরকালের জন্য পল্লবিত থাকে।

টৌকিও ইউনিভারসিটীর এক প্রবীন অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করলেন ভারতবর্ষে নাকি জাপানের মতই কলাচর্চার ধারা বংশানুক্রমিকভাবে বর্তায় পুত্র বা শিষ্যের উপর? তিনি জানালেন যে জাপানের বড় বড় চিত্র-শিল্পীরা এইভাবে পুরুষানুক্রমে তাঁদের সৃষ্ট শিল্প-ধারাগুলো জিম্মা করে গেছেন। কবে সেই আদি-শিল্পী গত হয়েছেন কিন্তু তাঁর নাম শত শত বৎসর পরেও তাঁর পুত্র পৌত্রাদি বা শিষ্যদের দ্বারা জীবিত হয়ে আছে। নামজাদা শিল্পী হারুনোবু, কিয়োনাগা প্রভৃতির নাম পারিবারিক উপাধিরূপে তাঁদের মৃত্যুর অনেক পরেও চলে আসছে। যে আদি শিল্পী চা-উৎসব চালু করেছিলেন তাঁর বংশধরের কাছে থেকে তাঁর নামের পরিচয় তো আমরাই পেলাম কিয়োটো শহরে।

অধ্যাপকের প্রশ্নের উত্তরে জানালাম উত্তর-ভারতের সঙ্গীত-সাধকদের বিভিন্ন "ঘরনার" কথা। পারিবারিক উপাধি বংশানুক্রমে আঁকড়ে রাখার ব্যাপারে জাপান আর ভারতবর্ষ একই গোত্রের। আজকাল যা হামেশা শুনতে পাওয়া যায় যে শিল্প-ব্যবস্থা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক কারণেই পরিবার-কেন্দ্রিক সমাজ ভেঙে যায়—জাপানে তার নজীর মেলে না।

জাপানী নারীদের কথা বলতে বলতে ওঁদের পরিবার-কেন্দ্রিক সমাজ-জীবনের মূল সূত্রটীর বিষয় ইচ্ছে করেই উল্লেখ করলাম। একটু অপ্রাসঙ্গিক হোলেও এই ধারাটির সঙ্গে পরিচয় থাকলে সহজেই বুঝতে পারা যায় মহাযুদ্ধের পর জাপানী সমাজ কেন ওঁদের ২০০,০০০ পিতৃনাম-গোত্রহীন শিশু নিয়ে মুস্কিলে পড়েছে। জাপান আত্ম-সমর্পন করলে সেদিন ওদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ও শহরে ঘাটি বাঁন্ধল কয়েক লক্ষ আমেরিকান সৈন্য। প্রথম প্রথম এইসব বিদেশীদের প্রতি ছিল সমাজের ভীষণ রকমের কড়া মনোভাব। কিন্তু দারিদ্র্য,

অনটন ও রাজনৈতিক ওলট-পালটের ঘাত প্রতিঘাতে জাপানী সমাজের বলিষ্ঠ আত্ম-সম্বিতে ফাটল ধরল। দেশের সেই দুর্দিনে অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারেই, বিশেষ করে নারীদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ল। এর ওপর থাকল মদগর্বে ভরপুর দখলকারী বিদেশী সৈন্যদের হাতছানি আর প্রলোভন। নিছক জীবিকার তাগিদে যে জাপানী মেয়ে সেদিন গিয়ে পড়েছিল তাদের খপ্পরে সকলের চোখে সে হোল "প্যান প্যান" (Pan Pan)। কি যে তার অর্থ তা' আমি আজও বুঝিনি কিন্তু শব্দটী যে অপরিসীম অবজ্ঞাসূচক তা' না বুঝে উপায় ছিল না। ক্রমে অনিবার্যভাবেই পিতৃনামহীন শিশুরা আবির্ভাব হোতে থাকল। সমাজের হাতে তখন এমন শক্তি ছিলনা যাতে প্রকাশ্য আন্দোলন করে বিদেশীদের সঙ্গে মেলা মেশা বন্ধ করে দিতে পারে।

ভাষাগত, জাতিগত আর সংস্কৃতিগত একত্বের অধিকারী জাপান যেমন পৃথিবীতে তেমন আর কোনো দেশ আছে কিনা সন্দেহ। এই একত্ব-ভাবটি যেমন একদিকে সেই মেইজী সংস্কার যুগে জাপানের অভূতপূর্ব উন্নতির মূল উৎস স্বরূপ হয়েছিল তেমনি হিরোশিমার পরের যুগেও জাতটাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করে রেখেছে। এই একত্ব-বোধ থেকে জন্ম নিয়েছে সাম্রাজ্য-বাদ, জাতীয় ধর্ম, পররাজ্য-জয় স্পৃহা, আর এসেছে জাতীয় সমৃদ্ধির বেদীতে ব্যক্তির অথবা পরিবারের জীবনকে নিঃশেষ করে দেবার উৎসাহ ও আকাংখা। এমনি উগ্র একত্ব-বোধ থাকাতে ওঁদের মনোরাজ্যে স্থান পায়নি এর বিরোধী কোনো ভাবধারা। পরমত-সহিষ্ণুতা, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া বা অন্যকে বুঝতে চেষ্টা করা ওঁদের জাতীয় কোষ্ঠিতে কোনো দিনই দীর্ঘমাত্রা পায়নি। উগ্র ন্যাশানেলিজমের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করাতে জাপানী সমাজ রবীন্দ্রনাথের ঋষি-দৃষ্টির গুরুত্ব একদিন বুঝতে পারেনি। "যা কিছু জাপানী তাই ভাল" "ন্যায় হোক অন্যায় হোক—আমার জাত" এই ভাবে বিভোর ছিল জাপানের জাতীয় চিন্তা ধারা।

তাই যখন বিজেতা দখলকারীদের জিম্মাতে এসে পড়ল দেশটা, আর বিদেশী সৈন্যদের ঔরসে জন্ম নিয়ে পিতৃনামহীন শিশুরা জাপানী ইতিহাসে প্রথম দেখা দিল তখন জাপানী হৃদয় দৌর্বল্য তৃতীয় পাণ্ডবেরই মত হয়ে পড়েছিল। জাতটা যে বর্ণশঙ্কর হয়ে পড়ল! যখন জাপানী সমাজ দেখল নবাগতদের নাক, মুখ, রং ও চেহেরা সব কিছুই তাদের থেকে আলাদা তখন এল এক বিসদৃশ পরিস্থিতি যার সমাধান করবার কোনো উপায় সে সমাজে পূর্বে ছিল না, এখনও নেই। সমাজ কিছুতেই এই সব শিশুদের গ্রহণ করতে পারেনি। যদি জাপানী সমাজ পরিবার-কেন্দ্রিক না হয়ে ইয়োরোপের মত বিকেন্দ্রিক হোত, যদি সে সমাজে মেয়ে নেওয়া-দেওয়া সমান ভাবে প্রচলিত থাকত তাহোলে হয়ত এ শিশুগুলিকে নিয়ে জাপানকে তেমন কোনোও কঠিন সমস্যায় পড়তে হোত না।

হয়ত ঔপনিবেশিক জাতের সমাজ ছাড়া আর কোনো সমাজই দীর্ঘকালের জন্যে অচলায়তন হয়ে থাকতে পারে না ; ভাঙা-গড়া সব জীবন্ত সমাজেরই ধর্ম। জাপানী সমাজে তাই উগ্র জাতীয়তা বোধের দীর্ঘমাত্রা বরাবর পেয়ে আসলেও আজকে ছোটখাট অদল বদল হোচ্ছে বই কি। বাধ্য হয়ে যে সব ওলট পালট জাপানী সমাজে দেখা দিয়েছে তার তো উল্লেখ করলাম। কিন্তু অনেক বদলা বদলি সে সমাজ স্ব-ইচ্ছেতেও গ্রহণ করেছে। শাসন ব্যবস্থার কল্যাণে জাপানী নারীরা আজ আমেরিকান নারীদের মতই আইনতঃ স্বাধীনা। টোকিও ও অন্যান্য শহরে জাপানী মেয়েরা হয়ত প্যারীর বা নু-ইয়র্কের আধুনিকাদের জাপানী সংস্করণ। এ অনুকরণের ঢেউ চলেছে অব্যাহত ভাবে। রবীন্দ্রনাথ জাপানী নারীর শিষ্ট-রুচিসম্মত আর অপ্রগলভ বেশ ভূষার অকুণ্ঠ সুখ্যাতি করেছিলেন। কিন্তু নতুন জাপানে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তা' অভূতপূর্ব। খোদ হিরোশিমায় গিয়ে আমরা শুনলাম মেয়ে কুস্তীগীরদের লড়ায় প্রতিযোগিতার সংবাদ। এ ওলট পালটের

নিখুঁত চিত্র দিয়েছিলেন "আসাহী" পত্রিকায় এক সমালোচক। তাঁর মতে রাজধানীতে বর্তমানে চলেছে "সাবেকী কাবুকী নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে নগ্ন-নারী নৃত্য যা' জাপানী সমাজে কোনোও দিন সমর্থন পায়নি। নারীদের পোষাকের স্বল্পতা অনাবরণের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই"।

এ সব ধরণ-ধারণ যে কেবল মার্কিনী বা ইংরেজী সেনানিবেশ-গুলোর তাগিদে গড়ে উঠেছে বা সমর্থন পাচ্ছে তাও নয়। হিরোশিমার পরবর্তী যুগে জাপানী সমাজই এ সব ওলট-পালট সমর্থন করে আসছে। টোকিও রঙ্গমঞ্চে ইয়োরোপীয় সারিনৃত্য আজ কাবুকী অভিনয়ের মতই জনপ্রিয়। এ নৃত্যের প্রকৃতি কি তা' কেবল হাউসগুলির দেওয়ালে টাঙান সম্পূর্ণ নগ্ন নারীদেহের চিত্রগুলি থেকেই অনুমান করা যায়। ভারতবর্ষে যেখানে সিনেমায় নায়ক-নায়িকার প্রেম নিবেদনও সংযত করে রাখা হয়েছে সেখানে ঐ ধরণের প্রাচীর চিত্রের কথা কল্পনার বাইরে। সাহিত্যেও আজ পেয়েছে প্রথম জায়গা সেক্‌স, জাপানা দৈনিকের সমালোচনায় ধরা পড়ে সে সাহিত্যের গতি-ধারা।

ওসাকা শহরে শিল্পপতি ইতোর মুখে শুনেছিলাম কলকাতা তথা ভারতবর্ষের পরিচয়। আলোচনার মাঝে তিনি স্বাভাবিক সারল্যের সঙ্গে নতুন জাপানী সামাজিক জীবন তুলনা করলেন কলকাতার সামাজিক জীবনের সঙ্গে। "অফিস ছুটী হোলে সময় কাটাবার জন্যে আমোদ-প্রমোদের কোনো ব্যবস্থাই তো নেই আপনাদের শহরে; ভারতবর্ষের লোকেরা বোধহয় স্বভাবতই ঘর-ঘেঁষা"—মন্তব্য করলেন তিনি। ঘাড় নেড়ে মেনে নিলাম ইতোর উক্তির আংশিক সত্যতা। কলকাতাতেও নৈশ নৃত্যের ব্যবস্থা আছে বৈ কি। সেখানেও বিলিতি নাচের তালে মাত্রা দিতে দিতে স্বল্পবাস সঙ্গিনী টোকিওর মতনই হাত বদল হয়ে যায় তাও ঠিক। কিন্তু সে এক অতি ক্ষুদ্র উন্মার্গ-গামী অতি-ধনী অলসদের

ঘরোয়া ব্যাপার, বৃহত্তর প্রবহমান বাঙালী সমাজ-জীবনে তার কোনোও স্থান নেই। একান্ত নিভৃতে ও অন্ধকারে সে ক্ষুদ্র বিলাস বৈঠক নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে চেষ্টা করে। কিন্তু নতুন জাপানে আজ এই পশ্চিমী আবর্জনায় ভরা বেনো-জলের ধারা বেপরোয়া ভাবে সনাতনী সমাজকে ডুবিয়ে দেবার স্পর্ধা করছে।

এতদিন জাপানী গ্রামীন সমাজ, এমন কি হিরোশিমা কাণ্ডের পরেও, আপন সত্ত্বা বাঁচিয়ে রেখেছিল। সে সমাজে দুঃখ দারিদ্র্য, অনটন সবই ছিল, এখনও আছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সে সমাজ চিরাচরিত ঢঙে চলে আসছিল। সে সমাজেও আজ দেখা দিয়েছে এই পশ্চিমী অনুকরণ-প্রিয়তা। কোনো সামাজিক ঢঙই চিরকালের জন্যে কল্যাণময় না থাক্‌তে পারে। কিন্তু সে সব ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যটুকু ভুলে গিয়ে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে যদি জাপানী সমাজ ঝাপিয়ে পড়ে তা হোলেই কি মঙ্গল হবে ?

জাপানী গ্রামীন সমাজ ছিল পরিবার-গত। পরিবারের মঙ্গলই ছিল একমাত্র কাম্য এবং তার জন্যে পরিবারস্থ সকলেই, বিশেষতঃ মেয়েদের আত্মাহুতি দিতে হোত হামেশা। এ আত্মাহুতির কাহিনী আজ হয়ত এক ভারতবর্ষ আর জাপান ছাড়া অন্য কোথায়ও শুনতে পাওয়া যাবে না। একটি ঘটনা নিয়ে তো জাপানী সংবাদপত্রে বেশ হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। সে করুণ ঘটনাটি আলোচনা করলে জাপানী সমাজে পরিবারের আসন কোথায় তা' বুঝতে পারা যায়।

কলেজে পড়া ২৩ বৎসরের তরুণী অর্থাভাবে কোন্‌খানে গিয়ে দাঁড়ায় কাহিনীটি তার। মেয়েটির সংসারে ছিল একমাত্র ছোট বোন। যক্ষ্মা রোগ আক্রমণ করল বোনটিকে। আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে যখন সাহায্য আসা বন্ধ হয়ে গেল তখন বড় বোন কলেজে পড়া ইস্তাফা দিয়ে চাকরী খুজে নিল এক সারভেয়ার নক্সাকারের অফিসে। মাইনে সামান্য, দু'জনের খাওয়া থাকা জুটিয়ে এমন কিছু থাকেনা যাতে রোগীর চিকিৎসা করা সম্ভবপর হয়।

তাই শুরু হোল যোশীয়াড়া অঞ্চলে তার বিড়ম্বিত জীবন এক "স্পেসাল রেস্টুরেন্টে"। আয়ের থেকে সে মাসে প্রায় ১০,০০০ ইয়েন (প্রায় একশ চৌত্রিশ টাকা) বোনটির চিকিৎসার জন্য পাঠাতে পারল। কিছুদিন পর ঐ ধরণের জীবন যাপনে তার মনে আসল বিষাদ, আর দেহে গ্লানি। অবশেষে একদিন সে পালাল রেস্টুরেন্ট থেকে। সমাজ আর আত্মীয় পরিজনের ঘরের দ্বারে একবার দৃষ্টি ফিরিয়ে সে সপ্তাহ ধরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরল। কোথাও পেলনা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবার আহ্বান। সন্ত পরিত্যক্ত জীবনও বিষময়। ঠিক করে ফেলল জীবন পরিসমাপ্তি। অনেকগুলো ঘুমের-বড়ি কিনে খেয়ে ফেল্ল ধিক্কার-গ্রস্ত জীবন শেষ করতে। উদ্দেশ্য তার সফল হোল না হাসপাতালের ডাক্তার ও নার্সদের শুশ্রুসায়। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সে অবশেষে স্মরণাপন্ন হোল দক্ষিণপন্থী সোস্যালিষ্ট পার্টির অফিসে।

এমনি ধরণের সংবাদ মাঝে মাঝেই জাপানী সংবাদপত্রে প্রকাশ পায়। যে কারণে এ দুর্বিসহ অবস্থা মানুষের জীবনে আসে তা' কখনও সমর্থন যোগ্য না হোতে পারে; কিন্তু যে সামাজিক প্রীতির-বন্ধনে বোন বোনের জন্যে, পুত্র মায়ের জন্যে চরম আত্মোৎসর্গ করতে এগিয়ে আসে তা কি অবহেলার বস্তু? একদা এই পরিবারের মঙ্গলের জন্যেই দরিদ্র জাপানী পিতা সাথে করে দিয়ে আসতেন তাঁর মেয়েকে বাড়ির কাছে কাপড়ের কলে মজুরের কাজ করতে। জাপান তার বস্ত্র-শিল্প-সম্ভার অতি সস্তায় পৃথিবীর বাজারে অতীতে পাঠাতে পেরেছে এই কারণে। মূলতঃ কেবল খাই খরচা নিয়ে এই সব মেয়ে-মজুরেরা কাপড়ের ও সুতোর কলগুলো চালু রেখেছিল। কয়েক বৎসর পর যখন তারা সংসার পাততে চলে যেত তখন তাদের পরে যারা আসত তারাও শুরু করত একই কাজ একই পারিশ্রমিকে ও ঐ একই অনুভূতি নিয়ে। এসব ফ্যাক্টরীর সঙ্গে স্থানীয় শ্রমিক-পরিবারের

যে সম্বন্ধ গড়ে উঠত তা' নিছক পশ্চিমী ধরণের মালিক-মজুরের মত ছিলনা। মজুরী যা এসব মেয়েরা পেত তাতে হয়ত পিতা-মাতার ঋণ সম্পূর্ণ শোধ হোত না, কিন্তু মেয়ের ভবিষ্যৎ সংসার পাতবার জন্যে যে ব্যয় সমাজ কর্তৃক নির্দিষ্ট ছিল তা' মিলত। এর পর মেয়ের থাকবার সুব্যবস্থা, কলের কাজ ছাড়া অন্য কিছু অবসরমত শিখবার সুযোগ বা তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সবটাই নিত এবং এখনও নেয় মালিক। ফলে উভয়ের মাঝে গড়ে উঠত একটা সম্বন্ধ যার খাতিরে মালিক বিপদে পড়লে অনেক সময়ে মজুর এগিয়ে আসত তার সাহায্যে, আবার কল বিকল হয়ে পড়বার উপক্রম হোলে মালিকও অভয় দিতে পারত মজুরকে।

যে পরিবার একের ওপর এক বিপর্যয়ে পড়ে ধ্বংসের মুখে এসে পড়ত, সেখানেও চরম আত্মাহুতির জন্যে এগিয়ে আসত মেয়ে। এসব ক্ষেত্রে বাবা পারিবারিক ঋণদায় থেকে মুক্ত হবার জন্যে মেয়েকে সমর্পণ করে দিত যোশীয়াড়া অথবা গায়শাদের হাতে। পুরনো আমলে অনেক মেয়ে স্মরণে রাখত কেবল পিতৃঋণের কথা এবং দায়-মুক্ত হোলে পরিবারে ফিরে আসবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠত। আবার অনেকে নতুন জীবনের ওপর বিরূপ হয়ে উঠত এবং অপমানের ক্ষতচিহ্ন বহন করে পারিবারিক জীবনের অঙ্গনে ফিরে আসতে চাইত না। জাপানী সমাজে এও ছিল এক অপ্রতিহত ধারা।

ম্যাকআর্থারী আমলে এইসব ভালমন্দ মেশান জাপানী সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে ফেলবার জন্যে হুকুম এল। গো-বেচারী মজুরকে একটানা কাজ করিয়ে যাতে বড় বড় শিল্প-সাম্রাজ্য না গড়ে ওঠে তার জন্যে হোল নতুন ট্রেড ইউনিয়ন আইন যার বিশেষ কোনো পরিচয় হিরোশিমার পূর্ব যুগে জাপানের ছিল না। দরিদ্র ঋণগ্রস্ত চাষী পিতা যাতে তার মেয়েকে যোশীয়াড়া বা

গায়শা অঞ্চলে না পাঠাতে পারে পূর্বের মত তার জন্য এল নতুন হুকুম এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে হোল নতুন ভূমিবন্টন ব্যবস্থা।

গিয়েন্দের বাড়ীতে ভোজসভায় শিক্ষিতা জাপানী আধুনিকাদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে পরাজিত হয়ে কৌতূহলী মন আগ্রহ প্রকাশ করল এই সব নতুন সমাজ ব্যবস্থা কেমন কার্যকরী হয়েছে তার খোঁজ খবর নিতে। জাপানী বৈদেশিক দপ্তরের বন্ধুকে অনুরোধ করলাম কোনো বিশেষজ্ঞ মহিলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। তিনি নিয়ে গেলেন আমাকে "টোকিও টাইমস্" পত্রিকার মহিলা-বিভাগের সম্পাদিকার কাছে। এই বিখ্যাত দৈনিক কেবল ইংরেজী ভাষাতেই প্রকাশিত হয়। যদিও দৈনিক পত্রখানি ট্রাষ্ট-সম্পত্তি, এর জাপানী মালিক কিন্তু এখন আমেরিকান নাগরিক। "আসাহী সিম্বুন," "মৈনিচি" অথবা "টিমুরির" মত টাইমস্‌কে জাতীয়তাবাদী বলে গণ্য হয় না।

মহিলা বিভাগের সম্পাদিকা বর্ষীয়সী। জাপানী নারীদের বিবিধ সামাজিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে তাঁকে বেশ ওয়াকিবহাল ও অভিজ্ঞ দেখলাম। আমার উদ্দেশ্য ও বক্তব্য সুষ্ঠুভাবে বুঝিয়ে দিতে ভূমিকায় ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থার একটি চিত্র তাঁর কাছে উপস্থিত করলাম। বললাম এ চিত্র হয়তো জাপানীদের চোখে বেশ "সেকেলে" বা "সামন্ত-তান্ত্রিক" যুগের বলে মনে হবে। সে যাই হোক, আমি তাঁর কাছে গিয়েছি জাপানের সামাজিক জীবনের একটা বিষয় বিশেষভাবে বুঝে নিতে; সেটা হোল বর্তমানের জাপানী সমাজ "গায়শা" মেয়েদের কি চোখে দেখে? প্রশ্নটি করে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে আছি, দেখলাম সে মুখে বিস্ময়ের কোনো লক্ষণই নেই। যেন কোনো ভারতীয় নৃত্য-বিশারদের কাছে মণিপুরী নৃত্য সম্বন্ধে কিছু জানতে প্রশ্ন করেছি।

জবাব দিলেন খাস আমেরিকান টানের ইংরেজীতে। সে

উত্তরে জড়তার লেশমাত্র ছিল না। "কেন, গায়শা সম্পর্কে আশ্চর্য হবার কি আছে?"—মন্তব্য করলেন মহিলা। "জাপানে তো এটা একটা সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথা—লোকরঞ্জনের জন্যেই এর জন্ম। গায়শা-রা যে কোনো দেশের গায়ক বা নৃত্য-শিল্পীদের মত, জনসাধারণকে চারুকলার মারফৎ আনন্দ-দান করে"। ওঁর ব্যাখ্যাতে নতুনত্ব কিছু খুঁজে পেলাম না। অনেক কাল আগেই জাপান সম্বন্ধে বই-এর মারফৎ এ তথ্য তো জানাই ছিল। জাপানের মাটিতে পা দিয়ে এ কথা অনেকবার শুনেছি। রাজধানীতে, নিক্কো বা মিয়াজামা-তীর্থে গায়শা মেয়েদের দর্শন লাভ ও নৃত্য-গীত শুনবার সুযোগও মিলেছে আমাদের একাধিকবার। তাই সম্পাদিকার মন্তব্য শুনে জানালাম যে ঠিক অবাক হইনি, তবে এই গায়শা প্রথার মাঝে যেমন সস্তা বেচা কেনার মত একটা উদ্দেশ্য লক্ষ্য করেছি, তেমনি অন্যদিকে এর কলা-শিল্পের পরিবেশণের আনন্দও পেয়েছি কম নয়। কিন্তু আমার প্রশ্ন ঠিক গায়শা-প্রথা নিয়ে নয়, বর্তমান জাপানী সমাজ এ প্রথাকে কি ভাবে দেখে সেই সম্পর্কে।

ওঁকে নিরুত্তর দেখে মনে হোল আমার প্রশ্নটা হয়তো ঠিক ধরতে পারেন নি। ক্ষমা ভিক্ষা করে, উদাহরণ দিলাম যে তাঁর মত বিদুষী মহিলা, যিনি জাপানী নারীদের রুচি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতিভূ স্বরূপ তিনি কি এই গায়শা প্রথায় চালিত জীবিকায় বছরের পর বছর অগনিত দরিদ্র পরিবারের কিশোরী ও তরুণী মেয়েকে বিড়ম্বিত হবার নীতি সমর্থন করেন? ডাইরির পাতা উলটে পালটে দেখলাম সম্পাদিকার কাছ থেকে প্রশ্নটার হাঁ বা না, কোন জবাবই আসেনি।

পরে অবশ্য সম্পাদিকাকে নজীর দিয়েছিলাম এই বলে যে প্রাচীন ভারতবর্ষেতো বটেই এমন কি বর্তমান ভারতবর্ষেরও একাধিক প্রদেশে সেদিনও গায়শা-প্রথার অনুরূপ বাইজী প্রথা প্রচলিত ছিল। হয়তো ক্ষীণভাবে কোথাওবা এখনও সে প্রথা প্রচলিত

আছে। উত্তর-ভারতবর্ষে অনেক নামকরা শহর আছে যেখানে একদা জাপানী গায়শা-নৃত্যের মত বাইজীদের পায়ের নূপুর নিক্কণে বা চোখের ইশারায় আগন্তুক অতিথিদের হৃদয় স্পন্দন শুরু হোত। দু'দেশেই এদের সাধারণ বারবণিতার দলে ফেলবার সুযুক্তি হয়তো আদিতে ছিলনা, কিন্তু কেউ যদি উল্‌টো ধারণা নিয়ে বসে থাকেন যে এরা কেবল নৃত্যগীত পটীয়সী আর কলা-শিল্পের পূজারিণীই তাহোলে তিনি বেশ ভুলই করবেন। উভয় দেশেই যোশীয়াজ্ঞা বা বারবনিতা, গায়শা বা বাইজী মূলতঃ একই সামাজিক অবস্থারই সন্তান। তবে জাপান চারুকলার দেশ তাই গায়শা-প্রথা বিস্তৃতির সঙ্গে এসেছে বিবিধ সাজ সজ্জা, আদপ কায়দা আর শিল্পের চটক। এই সব গায়শা-পুষ্ঠ আদি শিল্প-নমুনাগুলো আপামর জাপানী গৃহস্থের কাছে আজও সমাদর পায়। জাপানে যেমন ছিল সামুরায়েরা গায়শাদের পেট্রোন, তেমনি এদেশে বাইজীদের ছিল আমীর-ওমরাহ, রাজা-মহারাজেরা; জাইবাতসুদের জায়গা নিয়েছিল শেঠ-বণিকেরা এবং এদের মিলিত সাহায্যে ও সমর্থনে দুই দেশেই গায়শা বা বাইজী সমাজে অল্পবিস্তার স্থান পেয়েছিল।

মার্জিততর রুচির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাঙলা দেশে সে প্রথা রহিত হয়ে পড়ল। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ-যুগের বাঙলা দেশে, বড় বড় রাজা মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও, বাইজী কোনোদিনই সমাজের ঘাড়ে চড়তে পারেনি। এদের কাছ থেকে নৃত্য আর সঙ্গীতের, বিশেষতঃ নৃত্যের পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত অনেক কটূক্তি ও তীব্র সামাজিক সমালোচনার সম্মুখীন হোতে হয়েছিল। বাঙালীর মার্জিত রুচির ধন্যবাদ যে সে প্রচেষ্টা তাঁর সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল বলেই আজ এখানে ঘরের মেয়েকে সঙ্গীত বা অভিনয়ের ক্ষেত্রে পাঠাতে বাঙালী দ্বিধাশূন্য।

কিন্তু বিস্ময়ের বস্তু হয়ে থাকল জাপান। গায়শা-প্রথা আজ

কেবল জনপ্রিয় নয়, এর বিরুদ্ধে বলবার কিছু নেই বললেই চলে। এটা ভারী অদ্ভুত মনে হোল যে শিক্ষায় দীক্ষায়, নারী আন্দোলনে, শিল্প-কলায় এত উন্নত দেশ তবু গায়শা-প্রথাকে ওঁরা এখনও কেমন করে রঙিন দৃষ্টি দিয়ে দেখে থাকেন! অনেক রকম আজগুবি যুক্তি দিয়ে ওঁরা প্রতিপন্ন করতে চান যে, গায়শা ওঁদের জাতীয় জীবনের একটা বৈশিষ্ট্য। ওঁরা হামেশা মন্তব্য করেন যে বাইরের লোকেরা গায়শাদের বিষয় বিশেষ কিছু জানেনা বলেই এই প্রথার ভাল দিকটা দেখতে পায়না। ওঁদের মতে গায়শারা কলা-পারদর্শিণী স্বেচ্ছা-নির্ভর রমণী মাত্র। অনেকে আবার আলোচনায় খেই না পেয়ে তোলেন অবান্তর ভাবে পাশ্চাত্ত্য দেশের কথা। লোকেরা সেখানে বান্ধবীদের নিয়ে "নাইট ক্লাবে" কি ফুর্ত্তি লোটেনা?—জিজ্ঞেসা করেন ওঁরা। কিন্তু বর্তমান জাপানেও পয়সা-ওয়ালারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় ধারাতেই কি ফুর্ত্তি করতে পারেন না!—উত্তর দিলে ওঁরা নিরুত্তর হন। অনেকে আবার যুক্তি দেন যে গায়শারা স্বাধীনা কলা-শিল্পী। সরকারী তথ্য কিন্তু এ মত সমর্থন করেনা। সরকারী মতে গায়শাদের অধিকাংশই নিছক বারবণিতার পর্যায়ে পড়ে। অথচ গায়শা ও যোশীয়াড়ার মধ্যে সীমারেখা টানতে কেবল জাপানীরাই উৎসাহ দেখান তা নয়, গায়শা-প্রথার অনেক বিদেশী পৃষ্ঠপোষকেরাও প্রায় এই সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখিয়ে থাকেন। গায়শা-প্রথা সমর্থন করে বড় বড় পণ্ডিতী লেখা ও কেতাব প্রায়ই এসব দেশ থেকে এসে থাকে।

কিন্তু গায়শারা কলা-শিল্পী বা স্বাধীনা কি না, তা নিয়ে আমি আলোচনায় যাইনি। আমার জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল জাপানের শিক্ষিতা আর প্রগতিবাদী নারীসমাজ, যাঁরা পূর্বরাগ বা স্বয়ম্বর বিবাহের সমর্থক, তাঁরা এই গায়শা-প্রথা বরদাস্ত করেন কোন্ যুক্তিতে? গায়শা-জীবনের কঠোর শিক্ষানবিশী কালের কথা ওঁরা আলোচনার মাধ্যমে নিয়ে আসেন অনেকটা ইচ্ছে করেই এর মানবিক দিকটা

চাপা দেবার জন্যেই। অনেকে আবার বলে থাকেন যে মাইকোরা (গায়শাদের শিক্ষানবিশী কালের নাম) অধিকাংশই হোল গায়শা-পরিবারের মেয়ে বা দরিদ্র চাষী পরিবারের সন্তান। হোলই বা। তবুও কি যুক্তি থাকতে পারে যে এই শ্রেণীর মেয়েদের জীবনে ঐ সনাতনী ধারা ছাড়া বাঁচবার অন্য কোনো শ্রেয়তর বিধি ব্যবস্থা থাকবেনা?

মহিলা সম্পাদিকা এই আলোচনায় কি সিদ্ধান্তে পৌছলেন তা'. জানিনা, তবে আমি আমার প্রশ্নের কোনোও সদুত্তর জাপানে পাইনি।

জাপানের বড় বড় শহর ও তীর্থ দেখতে দেখতে আমরা উপস্থিত হোলাম বনেদী কিয়োটো নগরে। সংস্কৃতির দিক দিয়ে হাজার হাজার বৌদ্ধ ও সিন্টো মন্দিরে শোভিত এই ধাম জাপানে একমেবাদ্বিতীয়ম। যুদ্ধে জাপানের ছোট বড় সব সহরগুলোই—রাজধানী টোকিও সমেত—আগুনে-বোমায় পুড়িয়ে দেওয় হয়েছিল, রক্ষা পেয়েছিল কেবল কিয়োটো—অসামরিক আর সংস্কৃতির ক্ষেত্র বলেই। তাই আজও কিয়োটোর বড় বড় মন্দির বা বাগানগুলো দেখলে অতীত জাপানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ হয়।

কিয়োটোতে উপস্থিত হবার পর শহরের এক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন গায়শা-গৃহ থেকে আমাদের এক নিমন্ত্রণ এল। মনে মনে পুলকিত হোলাম এই ভেবে আদি গায়শা-প্রথা যে কি তার হয়তো খানিকটা পরিচয় পাব।

সন্ধ্যায় আমরা তিনজন উপস্থিত হোলাম বৈদেশিক দপ্তরের বন্ধুর সঙ্গে গায়শা গৃহে। প্রথম দর্শনই মনে করে দিল যেন পুরনো জাপানের একখানা নিখুঁত উডকাট জীবন্ত করে ধরে রাখা হয়েছে আমাদের চোখের সামনে। গৃহদ্বারে সুদৃশ্য কাগজের লণ্ঠনের আব্ছায়ায় অপেক্ষমান মাইকো নতজানু হয়ে অভ্যর্থনা জানাল অতিথিদের। অতীতে সে এমনিভাবে অভ্যর্থনা করত

সামুরাইদের যারা যুদ্ধ বিগ্রহের অবকাশে চিত্ত বিনোদন করবার জন্যেই সৃষ্টি করেছিল আদি মাইকো আর আদি গায়শাকে। সৃষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে সেদিন এদের নতুন বিলাস বেশ ও কেশ বিন্যাসের ভার নিয়েছিল আদি জায়বাত্সু বণিক, তাদের বচন-পটু হোতে সাহায্য করল কবি-সাহিত্যিক এবং যারা গায়শা-প্রথাকে সর্বপ্রকারে জনপ্রিয় করল সেই চিত্র ও ভাস্কর-শিল্পী সর্বশেষে উপস্থিত হোলেন গায়শা-গৃহে। তাঁরা কাঠের ব্লকে ধরতে চেষ্টা করলেন গায়শা-রূপ, সুচারু বেশ-বিন্যাস ও তনু-ভংগিমা। জাপানের সর্বত্র সমাদর পেল এ চিত্র-শিল্প, সমগ্র জাতটার কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠল গায়শা।

শত শত বছরের সেই পুরনো রীতি অনুযায়ী গায়শা-গৃহে আমাদের স্বাগতার্থে মাইকো নতজানু হয়ে চম্পকাঙ্গুলীর ওপর নির্ভর করে দেহ-লতা পল্লবিত করে দিল গৃহ-দ্বারে বিন্যস্ত পরিচ্ছন্ন পাটির ওপর। সে অবনত ও সহজ দৃষ্টিভংগি জানাল সাদর সম্ভাষণ। অতিথিদের পক্ষ থেকে সে নীরব সম্ভাষণের উত্তর এল প্রায় অনুরূপ দেহভংগিতে। মাইকো পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্‌ল অতিথিদের গৃহের প্রধান কক্ষে, যেখানে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছেন প্রধান গায়শা আর তাঁর সঙ্গীরা।

বাহুল্য লক্ষ্য করলাম না কোথাও। বাক্য সংযম এখানে অত্যন্ত পরিস্ফুট। বন্ধু গায়শার সঙ্গে করে দিলেন আমাদের পরিচয়, প্রথম ফুটে উঠতে দেখলাম গায়শা মুখে হাসির রেখা। তাও কত সংযত! বন্ধু জানালেন এই বিদেশী অতিথিরা এসেছেন দেখতে গায়শা-সৃষ্ট রূপ আর নৃত্য-কলা। আবার অ-বাক উত্তর এল ঈষৎ দেহ ভংগিমা মারফৎ। সে আনত আনন, সে মৃদু পদক্ষেপ, সে একান্ত স্পর্শভীরুতা এবং সর্বোপরি সে সুপরিমিত দেহভংগিমা জানিয়ে দেয় অতিথিদের মার্জিত গায়শা-রুচি।

আসন গ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে সামসেন-একতারায় আছড়ে

পড়তে লাগল সঙ্গীতের মূর্ছনা। সে মৃদু ঝংকারে নেই কোনোই মাদকতা। সঙ্গীত এখানে গৌণ; কিন্তু যখন সে তালে সুকেশা, সুকেশী গায়শা-দেহলতা প্রজাপতির মতনই তার কিমোনো পাখা আন্দোলন করে নৃত্যের ছন্দে দুলে উঠল! রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

একদিন জাপানি নাচ দেখে এলুম। মনে হল, এযেন দেহ-ভঙ্গির সংগীত। এ সংগীত আমাদের দেশের বীণার আলাপ। অর্থাৎ, পদে পদে মীড়, ভঙ্গি-বৈচিত্র্যের পরস্পরের মাঝখানে কোনো ফাঁক নেই, কিম্বা কোথাও জোড়ের চিহ্ন দেখা যায় না; সমস্ত দেহ পুষ্পিত লতার মতো একসঙ্গে দুলতে দুলতে সৌন্দর্যের পুষ্পবৃষ্টি করছে। খাঁটি য়ুরোপীয় নাচ অর্ধনারীশ্বরের মতো—আধখানা ব্যায়াম, আধখানা নাচ; তার মধ্যে লম্ফঝম্ফ, ঘুরপাক, আকাশকে লক্ষ্য করে লাথি ছোঁড়াছুঁড়ি আছে। জাপানি নাচ একেবারে পরিপুর্ণ নাচ। তার সজ্জার মধ্যেও লেশমাত্র উলঙ্গতা নেই। অন্য দেশের নাচে দেহের সৌন্দর্যলীলার সঙ্গে দেহের লালসা মিশ্রিত। এখানে নাচের কোনো ভঙ্গির মধ্যে লালসার ইশারা-মাত্র দেখা গেল না আমার কাছে। তার প্রধান কারণ এই বোধ হয় যে, সৌন্দর্যপ্রিয়তা জাপানির মনে এমন সত্য যে তার মধ্যে কোনো রকমের মিশল তাদের দরকার হয় না, এবং সহ্য হয় না। [জাপান যাত্রী পৃষ্ঠা ৯৫-৯৬]

কেমন করে সময় অতিবাহিত হয়ে গেল বলতে পারিনা, তবে বেশ মনে আছে মুহূর্তের জন্যেও চিন্তাগ্রস্ত হইনি এই ভেবে যে, যে শিল্পী আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর নিভৃত মনের কোণে হয়তো জমাট হয়ে গুমরে মরছে জীবনের কোনো অসার্থকতা।

নৃত্যের তালে তালে গানের কলিগুলি যা ভেসে আসে তা' যেমন ক্ষুদ্র, তেমনি মৃদু। বন্ধু তর্জমা করে ধরে দিলেন সে সঙ্গীতের মর্মার্থ।

হক্কাইডোর জেলে উড়ন্ত পাখীকে প্রশ্ন করল; বলতে পার, বাতাস কোনদিকে বইছে? পাখী উত্তর করল, নীচের তরঙ্গগুলোকে জিজ্ঞেসা কর।

নাচ ও গানের ফাঁকে ফাঁকে যে আলাপ আলোচনা চলল তা'

ছিল নিছক রম্য-রচনা। তাতে থাকে না কোনো রেশ' যা গায়শা-গৃহ পরিত্যাগের পর অতিথি মনে রাখতে পারে। অতিথিকে আনন্দ দানই হোল সে রম্য-আলোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য।

গায়শা-প্রথা নতুন জাপানে থাকবে কি না তা' জাপানী সমাজ আজ না হয় আগামী কাল ঠিক করবেই। যত কিছুই সদ্‌যুক্তি সে প্রথার বিরুদ্ধে দেখান যাক না কেন বর্তমান জাপানী সমাজে গায়শা প্রথা অতি সুপ্রতিষ্ঠভাবেই বিরাজমান থাকবে।

কিয়োটোর গায়শা-নৃত্যগীত নিশ্চয়ই জাপানী সংস্কৃতির একটা বিশিষ্ট রূপ। কিন্তু অবাক হোলাম যখন আলাপ আলোচনায় বর্ষিয়সী গায়শা-ঘরণী জানালেন যে কিয়োটোর প্রভাতী দৈনিক মারফৎ তিনি আমাদের পরিচয় পূর্বেই পেয়েছেন। যে সমাজে তাঁকে থাকতে হয়, যে জীবন তাঁকে যাপন করতে হয় সেখানেও যে ছাপার অক্ষর রোজ গিয়ে পৌঁছয় তাতে দেশটার শিক্ষার ও স্বাচ্ছন্দ্যেরই পরিচয় পেলাম।

হিরোশিমা

অবশেষে উপস্থিত হোলাম হিরোশিমায়—আনবিক যুগের দানবিক বলিপীঠে। যেদিন থেকে জাপান যাত্রা স্থির হয়েছিল সেইদিন থেকেই মনের উপর একান্ত ভাবে ভর করে বসেছিল হিরোশিমা দেখার আকাংখা। জাপানে প্রাচীন ও নবীন দেখার জিনিষের অন্ত নেই, তবু হিরোশিমার সঙ্গে যেন প্রত্যক্ষ পরিচয় হয় এই ছিল মনস্কামনা। হিরোশিমা আধুনিক মানুষের শ্রেষ্ঠ তীর্থ, এরই মাটিতে আনবিক যুগের পদক্ষেপ, এই তীর্থের স্মৃতি বহন করে নতুন যুগের সৃষ্টি হোল—তারই পরিচয় লাভের আশায় এলাম এখানে।

স্থান বা ব্যক্তি মাহাত্ম্য মনে প্রাণে অনুভব ও অকপটে স্বীকার করে থাকি হয়তো সনাতন ভারতবর্ষীয় বলেই। এবং কেবল সে-জন্যেই অতি সাধারণ তীর্থ যাত্রীর মন নিয়ে একদা গিয়েছিলাম ধর্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রে। সেই প্রান্তরে ধর্ম আর সাম্রাজ্য নিয়ে ভয়াবহ দ্বৈরথের ব্যর্থতাই মনকে সেদিন আচ্ছন্ন করেছিল। কুরুক্ষেত্রে কে জয়ী হয়েছিল, ধর্ম না মৃত্যুসাধ? অথচ মানুষের লোভ এমন অন্ধ, বুদ্ধি এমন নির্বিবেক যে শুধু সেদিন নয়, ইতিহাসের পর্যায়ে পর্যায়ে বারবার সে সামান্য পঞ্চ গ্রামের বিনিময়ে সন্ধি স্থাপন না করে, অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী-বাহন সাম্রাজ্যের মরণ বিপর্যয় বেছে নিয়েছে। পারেনি দু'চোখ মেলে সাদা সত্যকে দেখে নিতে, দু'হাত মেলে সেই সত্যকে বরণ করে নিতে কোনদিনই পারেনি সে। সমস্ত বিচার বুদ্ধির অন্তরালে কোনোখানে যেন আদিম অন্ধ আক্রোশের বীজ লুকিয়ে আছে মানুষের নীল নীল শিরায় শিরায়, তাই সকল যুক্তির শাসনকে

উপেক্ষা করে সে পা বাড়ায় অনিবার্য আত্মঘাতের পথে। সেই আত্মঘাতের রূঢ় বাস্তবতাকে অস্পষ্ট করে তোলার জন্যে তার নীতি আর মতবাদ নিত্যই নতুন রূপ নিয়ে দেখা দেয়, তাতে সমস্যার স্বরূপটাই ঢাকা পড়ে শুধু—সমাধান সুদূরেই থেকে যায়। কুরুক্ষেত্রে অ-ধর্ম পরাজিত হয়েছিল বটে, কিন্তু ধর্মও তো টিকে থাকতে পারেনি?

হিরোশিমার পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে কেবলই মনে হয়েছে এর মাটিতে যে যুগ প্রবর্তিত হোল—নাই বা থাকল তাতে গীতার উদাত্ত কোনো বাণী—সে যুগ কোন্ নতুন অধ্যায় জুড়ে দিতে চায় মানুষের ইতিহাসে? হিরোশিমার যুগ যে দিন উন্মোচিত হোল সেদিন আনবিক হাতিয়ার ছিল পৃথিবীর কোনো এক নিভৃত কোণে। আজ তার সন্ধান মিলেছে অন্ততঃ তিন তিনটা কেন্দ্রে। কে বলতে পারে অদূর ভবিষ্যতে সেই মারণাস্ত্র পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে না? তারপর? তারপর পাঁচখানা গণ্ডগ্রামের জন্যে ভারতবর্ষ যা একদিন করেছিল এবং যার প্রত্যক্ষফল সে ভোগ করে এল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, ঠিক সেই অবস্থাই কি ফিরে আসবে না বিরাট ব্যাপকতা নিয়ে সারা পৃথিবীর উপর?

মিয়াজীমার দ্বীপময় মন্দির দেখে মোটরে আমরা চলেছি হিরোশিমার তীর্থক্ষেত্রে। মনটা কৌতূহলে, বিষাদে ভরপুর। হিরোশিমার ইতিহাস যে অতি সদ্য; বার বছরও পূর্ণ হয়নি! কুরুক্ষেত্র অনেক পুরনো তাই সে মনের উপর যে অনুভূতি এনেছিল তা' ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। বিধ্বস্ত শহর কোন্ মুহূর্তে পার হয়ে গেলাম লক্ষ্যই করিনি। আমরা তিনজনেই নির্বাক। শহর পার হয়ে যখন মোটর ছোটখাট পাহাড়ের চড়ায়ের পথে চলতে শুরু করেছে তখন ফিরে পেলাম আত্ম-সম্বিত। মোটর পথের ডান দিকে দেখলাম পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে আছে হিরোশিমার আনবিক হাসপাতাল। এখনও চলেছে আনবিক রোগীদের চিকিৎসা এবং

মনুষ্য শরীরে আনবিক প্রতিক্রিয়ার অনুসন্ধান। আর একটু ওপরে উঠে মোটর মোড় ঘুরে এসে পড়ল পাহাড়ের মাথায়। জায়গাটা মানুষের হাতে সমতল হয়েছে বুঝলাম।

বৈদেশিক দপ্তরের বন্ধুর ইঙ্গিতে আমরা তিনজনেই নেমে পড়লাম গাড়ী থেকে। দূরে দেখলাম নদীর সপ্তধারা। ঠিক ভাগীরথী যেন শাখা প্রশাখায় বিস্তারিত হয়ে মিশেছে সাগর সঙ্গমে—এ যেন সেই ছবির অবিকল প্রতিচ্ছবি! হিরোশিমা আর গঙ্গা মাটির প্রকৃতিতে রয়েছে আকাশ পাতাল প্রভেদ। গঙ্গাবহ নরম গৈরিক পলি মাটি হিরোশিমার কোথাও নেই; আর নেই সেই নারিকেল বনশ্যাম বেলাভূমি, যা মহাকবি কালিদাসের কল্পনাকে উদ্বেল করেছিল। নদী সগর্বে চলেছে সমুদ্র সঙ্গমে, পাথর ও কাঁকর বহুল মাটিকে দু'ধারে ঠেলে ফেলে দিয়ে। পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে হিরোশিমাকে আংশিক ভাগে ভাগ করে। পাহাড়ের অপর পার্শ্বে যেটুকু দেখা যাচ্ছে তা স্বল্প হোলেও প্রাক-আনবিক যুগের আদি ও অকৃত্রিম হিরোশিমা। কি ঘন বসতি সেটুকুতে! এধারে যতদূর দৃষ্টি যায় সবই নতুন, উত্তর-আনবিক যুগ, প্রায় বৈচিত্র্যহীন। কেবল জায়গায় জায়গায় চোখে পড়ে মানুষের ঘর বাঁধবার নতুন প্রচেষ্টা!

বন্ধুর সঙ্গে এগিয়ে চলেছি। পাহাড়ের ওপরকার সমতল জমিটা অনেকটা আমাদের সিমলার ম্যালের মত। সামনেই বিরাট জাপানী তোরণ; সম্পূর্ণ আভরণহীন, অলংকার বিবর্জিত—এমন কি এ তোরণ যে একদিন ধাতু মার্জিত ছিল তারও পরিচয় প্রায় নিশ্চিহ্ন। তোরণ পার হয়ে আমরা উপস্থিত হোলাম পাথুরে বনেদের উপর। বনেদের উপর চোখ যেতেই বুঝতে পারলাম একদিন এখানে দাঁড়িয়েছিল কোনো প্রাসাদ।

একটু নাটকীয় ভংগিতেই বন্ধু পরিচয় করে দিলেন হিরোশিমার সঙ্গে। তর্জনীর সাহায্যে বনেদের দিকে লক্ষ্য রেখে বন্ধু বললেন—একদা এখানে দাঁড়িয়েছিল সম্রাট মেইজীর প্রাসাদ। শতাব্দীর

গোড়ায় যখন রুশ-জাপান যুদ্ধ বেধে উঠেছিল সেদিন সম্রাট টৌকিও-প্রাসাদ ছেড়ে এসেছিলেন এখানে, সেই যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব নিতে। কারণ হিরোশিমা হোল এশিয়ার মূল ভূখণ্ডের নিকটতম শহর। পাহাড়ের এই জায়গাটিকে বলা হয় হিজিয়ামা পার্ক (Hijiyama Park), হিরোশিমার প্রাণকেন্দ্র। আর এর একান্তে অবস্থিত ছিল এই মেইজী প্রাসাদ এবং সাজানো বাগান যা জাপান বানিয়েছিল চীনের হ্যাংচাউ-এর (Hangchow) বিখ্যাত বাগানের অনুকরণে।

আনবিক যুগের পাদপীঠে দাঁড়িয়ে সমুদ্র থেকে ভেসে আসা হাওয়ার বেগে জাপানের মেইজী রাজত্বের গোড়ার কথাগুলো বন্ধু বলেই গেলেন কিন্তু তা' যেন এ কান দিয়ে ঢুকে ও কান দিয়ে বেরিয়ে গেল আমার। মনটা তখন পড়ে আছে সেই তেপান্তরের মাঠের ওপর, সেই ভাঙা বনেদের উপর, যার কাটা বুড়ো আঙুলের চেহারা নিয়ে বৈধব্য-বেশে তোরণটি আজও পড়ে আছে। বেশ অনুমান করতে পারলাম যে এ্যাটমযুগের আগে এখানে দাঁড়িয়েছিল সেই ধরণের একটা প্রাসাদ যার নমুনা আমরা দেখেছি টৌকিও এবং ওসাকা নগরীতে।

হিরোশিমা প্রাসাদটি মেইজী যুগ (১৮৬৮—১৯১২ খৃঃ) শুরু হবার অনেক আগে সামুরাই বংশোদ্ভব মোরে তেরুমতো (More Terumoto) এ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার আশায় ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে বানিয়েছিলেন। তেরুমতো সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন যে যতই এশিয়ার ভূখণ্ডের সঙ্গে জাপানের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবে ততই বেড়ে যাবে হিরোশিমার গুরুত্ব। গিয়েছিলও। জাপানের সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যে হিরোশিমা আর তার সন্নিকটে অবস্থিত কুরে (Cure) বন্দর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্‌কালে হয়ে পড়েছিল এশিয়ার অতিকায় অস্ত্রাগার আর নৌঘাঁটি। তেরুমতো যখন তাঁর হিরোশিমা প্রাসাদ গড়ে তোলেন তখন ছিল এখানে কয়েকটা

গণ্ডগ্রাম—জাপানী জেলেদের আড্ডা। নদীর মোহনায় গল্‌দা চিংড়ী মাছ ধরে তারা জীবন কাটাত, যেমনি ভাবে আমাদের গঙ্গার মোহনায় জীবন কাটায় সুন্দরবনের জেলেরা। কালক্রমে সেই গণ্ডগ্রামগুলো হয়ে পড়ল বিরাট শহর, লোকসংখ্যা দাঁড়াল চার লক্ষের ওপর, আর জাপানের শহরগুল্লির মধ্যে তার জায়গা হোল এগারোর কোঠায়।

যুদ্ধ যখন বাধল তখন এই ছিল হিরোশিমা······চারলক্ষ ব্যস্ত মানুষের শহর, অনেক রণপোত আর বোমারু বিমানের ঘাঁটি। যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যস্ততা গেল বেড়ে, চাপ হোল আত্যন্তিক—মানুষের চাপ, অভাবের চাপ, ঘন ঘন বিমান আক্রমণের চাপ। তবু সব সয়েও মানুষ টিকে ছিল হিরোশিমায়। সহ্যের বাঁধ ভেঙে পড়তে চাইলেও সব সহ্য করে বাস করছিল তারা। কিন্তু সেটাও মহাকালের অভিপ্রেত ছিল না।

আগষ্ট ৬ই ১৯৪৫ সাল। অন্যদিনের মত সেদিনও রণক্লান্ত হিরোশিমার আকাশে সূর্য উঠেছে। কাজের মানুষ বাইরে যাবার আয়োজন করছে, ঘরের গৃহিণী রন্ধনের উদ্যোগে ব্যস্ত, শিশুদের ছোটছোট পদক্ষেপ পড়ছে পাঠশালার পথে, রাস্তার দু'ধারে গাছে গাছে পাখীদের প্রাত্যহিক প্রভাত-বন্দনা হয়তো সদ্য শেষ হয়েছে। সকাল সাড়ে আটটায় চারপাশে ঝলমল রোদ্দুর, সমুদ্রের দিকে নীরবে তাকিয়ে আছে শান্ত শহর। কোথাও এতটুকু অস্বাভাবিকতার ছাপ নেই, এক সংবাদপত্রের পাতায় ছাড়া।

হঠাৎ আকাশে দেখা দিল একটা এরোপ্লেন, মাত্র একটাই। সাইরেন বাজল' যথারীতি, আমল দিল না কেউ বিশেষ। অমন প্লেন তো আসছেই যখন তখন, দিন দুপুরে ; হয় ছবি নিয়ে যাচ্ছে নয় ·····কিন্তু······এ কি ?······সপ্তবর্ণ বিদ্যুৎ, অসহ্যদীপ্তি বিদ্যুৎ ঝল্‌সে উঠল কোথা থেকে····· এ কি ?······অসহ্য আক্রোশে আকাশ বিস্ফোরিত হোল নাকি ?······কিন্তু ভালো করে ভাববার

সময় পেলো না তারা, কিছু ভাববার আগেই আগুনের ঝাপ্‌টা এসে ঝলসে দিল সকলকেই। তারপর ?

লুটাও লুটাও শির, প্রথম রমণী,
সেই মহাকালে ; তার রথচক্রধ্বনি
দূর রুদ্রলোক হতে বজ্রঘর্ঘরিত
ওই শুনা যায়। তোর আর্ত জর্জরিত
হৃদয় পাতিয়া রাখ তার পদতলে।
ছিন্ন সিক্ত হৃৎপিণ্ডের রক্ত শতদলে
অঞ্জলি রচিয়া থাক্ জাগিয়া নীরবে
চাহিয়া নিমেষহীন। তার পর যবে
গগনে উড়িবে ধূলি, কাঁপিবে ধরণী,
সহসা উঠিবে শূন্যে ক্রন্দনের ধ্বনি—
হায় হায় হা রমণী, হায়রে অনাথা,
হায় হায় বীরবধূ, হায় বীরমাতা,
হায় হায় হাহাকার—তখন সুধীরে
ধূলায় পড়িস লুটি অবনত শিরে
মুদিয়া নয়ন। তার পরে নমো নম
সুনিশ্চিত পরিণাম, নির্বাক নির্মম
দারুণ করুণ শান্তি ; নমো নমো নম
কল্যাণ কঠোর কান্ত, ক্ষমা স্নিগ্ধতম।
নমো নমো বিদ্বেষের ভীষণা নিবৃত্তি—
শ্মশানের ভস্মমাখা পরমা নিষ্কৃতি।

[গান্ধারীর আবেদন ; রবীন্দ্রনাথ]

হিরোশিমার বুকে ঘটল আনবিক যুগের প্রথম পদক্ষেপ। ইতিহাসে সম্পূর্ণ এক অজানা অধ্যায়ের সূচনা হোল—পর্বে পর্বে যার ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার দারুণ দিক থেকে দারুণতর দিগন্ত এখনও উম্মোচিত হচ্ছে।

মাত্র একটি এ্যাটম বোমা পড়েছিল হিরোশিমার ওপর। সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করল শহরটিকে, ষাট হাজার মানুষকে তৎক্ষণাৎ নিহত করল,

সঙ্গে সঙ্গে মারাত্মকভাবে আহত করল আরো দু'লক্ষ নরনারীকে। সে বোমা ভাঙল ৬৭০০০ বাড়ি ঘর, আর ছাই করে দিল মানুষের সৃষ্ট সব সম্পত্তি। আমরা হিরোশিমায় উপস্থিত হোলাম, এ্যাটম-যুগ যখন দশ বছর পুরনো। জনসংখ্যা আবার বাড়তির মুখে তিন লক্ষে পৌঁছেছে। নতুন বাড়িঘরের সংখ্যা ৫০,০০০ উর্দ্ধে। কিন্তু এ তিন লক্ষ লোকেরও এক লক্ষ সেদিন, সেই দশ বছর পুর্বে, সেই অ-শুভ মুহূর্তে দেখেছিল হিরোশিমায় নতুন-যুগ প্রবর্তন।

প্রাসাদের তোরণটির দিকেই তাকিয়ে আছি। সেদিন ওটা তো দাঁড়িয়েছিল এমনি করেই। ঝড়ের ঝাপটায় পড়ে যায়নি। যে বিন্দুতে সেই আনবিক বোমাটি নেমে এসেছিল তা' এখান থেকে এক মাইল দক্ষিণে। ঐ যে দূরে দেখা যাচ্ছে দুমড়ে-যাওয়া ইস্পাত লোহার কাঠামোওয়ালা বাড়ি ওরই কাছে নেমে এসেছিল সেই আগুনে মৃত্যুদূত—বললেন বন্ধু। বোমার সেই ঝাপটা নিমেষে সৃষ্টি করল প্রবল ঝড়, আর সে ঝড়ের বেগ এক মাইল পরিধির মধ্যে যা কিছু ছিল তাকে হানল প্রবল আঘাত। এ্যাটম বোমার বিস্ফোরণ হোল শূন্যে, শূন্যেই সেই বিস্ফোরণ সৌরবলয়ের মত এক আগুনের চাকা সৃষ্টি করল যার পরিধি হয়ে পড়ল দু'শ ফিট। আর যখন মাটি স্পর্শ করল ঐ ইস্পাতের কাঠামোওয়ালা বাড়ির সন্নিকটে তখনই, সেই অ-শুভ মুহূর্তে, প্রবর্তিত হোল এ্যাটমিক যুগ।

বিলুপ্ত প্রাসাদের এদিক ওদিক আমরা দেখছি। বন্ধু আমাদের সমর্থন করেই বললেন এই সর্বংসহ মাটির পাহাড়ের আশ্রয়পুটে ছিল বলেই আদি হিরোশিমার ঐ ক্ষুদ্র অংশটুকু রক্ষা পেয়েছে বোমা-তাড়িত ঝড়-ঝাপটা, আর অগ্নিবৃষ্টি থেকে। অপর পক্ষে মেইজী প্রাসাদটী সগর্বে দাঁড়িয়েছিল পাহাড়ের বুকের ওপর। পরিণাম ধ্বংস। এতদূরে, প্রায় এক মাইল ব্যবধানে সম্পূর্ণভাবে নিঃসঙ্গ অবস্থিতি ছিল যার, সেখানে ঝড় আসতে পারে, কিন্তু আগুন এল কি করে? কিন্তু মনুষ্য-সৃষ্ট তেজোময় সে সূর্যের প্রতাপ সেখানেও পৌঁছেছিল।

শ্মশানে পড়ে থাকা হাড় পাঁজরের মত দেখাচ্ছিল কংক্রীট আর পাথরের বনেদটুকু। সে ধরণের বনেদ, মনে হোল, আর একটা দেখেছি মহারাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্র—পুনা শহরে। দুটো প্রাসাদই আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে। পুনার সেই পেশোয়া-দপ্তর প্রাসাদটি যদি সমতলে না হয়ে শহরের পার্বতী পাহাড়ের চূড়ায় হোত—যেখানে রয়েছে পানিপথের দুঃসংবাদে পীড়িত পেশোয়ার সমাধি—তবে হিরোশিমার মেইজী প্রাসাদের সঙ্গে তার তুলনা হোত আরও ঘনিষ্ঠতর।

দুটো প্রাসাদের ইতিহাসে অবশ্য বৈচিত্র্য আছে। পুনার পেশোয়া-প্রাসাদ ছিল মহারাষ্ট্রের জীবন সন্ধ্যার, আর হিরোশিমার মেইজী প্রাসাদ ছিল জাপানের জীবন প্রভাতের, প্রতীক। পুনার প্রাসাদ ধ্বংস হয়েছিল আগুনে, তাতেও ছিল হিরোশিমার মত কাঠের আসবাবপত্র যাতে আগুনের গ্রাস হিরোশিমার মতই ঠেকানো যায়নি। পুনা প্রাসাদ জনশ্রুতি মতে আকস্মিক কারণেই পুড়ে গিয়েছিল, তাই তার ধ্বংশ কাহিনীর দলিল দস্তাবেজ আজ বিরল।

হিরোশিমা সম্পর্কে ইতিহাস কিন্তু সম্পূর্ণ সজাগ। কোনো জনশ্রুতিরই উপর নির্ভর করেনি। কে বহু আড়ম্বরের মাঝেই সেই বোমাকে মানুষের বুকে ফেলল ইতিহাস জানিয়েছিল তার এক সদম্ভ ঘোষণা। সে ঘোষণায় কোনোই ভাব-প্রবণতা ছিল না, উপরন্তু পৃথিবীতে মানুষের বিরুদ্ধে এই মারণাস্ত্র যে কে প্রথম ব্যবহার করতে পারল তার জন্যে এখনো পর্যন্ত রাজনৈতিক জগতে কত না গর্ব ও কত না উল্লাস। হিরোশিমার আনবিক-যুগের জন্ম-মুহূর্ত নিয়ে তাই ঐতিহাসিক কোষ্ঠীকারকদের মধ্যে কোনো কালেও দেখা দেবেনা মতদ্বৈধ। সে মুহূর্ত এসেছিল ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট প্রভাতে ৮-৪০ মিনিটে (৯-১৫ জাপানী সময়)।

বোমারু প্লেন থেকে আনবিক মারণাস্ত্র ছাড়লে ধূমকেতুর মতন জ্বলন্ত-পুচ্ছ দেখিয়ে সে ছুটল হিরোশিমার মাটি ছুঁতে। আকাশে

থাকতেই হোল তার বিস্ফোরণ। বিকট নিনাদে সে বোমা হয়ে পড়ল সে মহাশূন্তেই প্রায় তু'শ ফিট (ষাট মিটার) পরিধির এক অগ্নিপিণ্ড—প্রথম মনুষ্য-সৃষ্ট তেজোময় সূর্য।

সহস্রগুনমুৎস্রষ্টুম আদত্তে হি রশং রবি বলে কালিদাস যে সূর্য-বর্ণনা করেছেন সে বরাভয় ছিলনা এ সূর্যের। এ ছিল সৃষ্টি-নাশে উদ্যত মহাভয়ঙ্করী করাল কালী। এর বর্ণনা করেন নি কোনো কবি। এঁকেই হয়তো "মৃত্যুরূপা মা" বলে আবাহন করে গেছেন স্বামী বিবেকানন্দ।

> লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর! তুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,
> নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!

আজ সে আনবিক বোমার তেজস্ক্রিয় শক্তি হিরোশিমার প্রতিটি বিন্দু থেকে পরীক্ষা কর্ছেন সন্ধানী বিজ্ঞানী। বোমা ফাটল আকাশে মাটি থেকে প্রায় আধ মাইল (৫৭০ মিটার) উচুতে এবং সেই বিন্দুর নামকরণ তাঁরা করেছেন এপিসেণ্টার (epicentre), আর তু'শো-ফিট (ষাট মিটার) পরিধি নিয়ে সেই সৌরবলয় নেমে আসল হিরোশিমার মাটির ওপর যে বিন্দুতে তাকে বলেছেন হাইপোসেণ্টার (hypocentre)। সেই হাইপো-বিন্দু হোল হিরোশিমার সিমা-হাসপাতাল প্রাঙ্গণ। এ তু'শ ফিট পরিধির মধ্যে যা কিছু পড়ল তা' হোল ধূমায়িত, সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন। গ্রানাইট পাথরই হোক বা কোনো ধাতব পদার্থই হোক তা' হোল নিমেষে দ্রব। আর যে ঝড় উঠল তার বেগ হোল যে কোনো ঝড়ের শতগুণ অধিক। (As for the explosion blast, the speed is estimated to be 600 to 700 meters. The horror of the blast will become clear to you if you compare it with that of typhoon which is around 70 or 80 meters per second in the most extreme case)। এ তু'শ ফিট পরিধির বেড় থেকে সম-দূরত্ব রেখে সে তেজের ও সে বেগের প্রতিক্রিয়ার রূপান্তর পরীক্ষা

করেছেন টোকিও বিশ্ববিত্যালয়ের বিজ্ঞানীরা প্রায় ৬০০০ কেন্দ্র থেকে।

তাঁরা দেখেছেন সিমা-হাসপাতাল থেকে প্রায় আড়াই মাইল (৩৭০০ মিটার) দূরে অবস্থিত—যদি না পাহাড় সে তেজ ও সে বেগ ধারণ করে থাকে—সে অগ্নিপিণ্ডের দাহিকা-শক্তি গিয়ে পোঁছেছিল। সহজদাহ্য কাঠ আর অন্যান্য আসবাবপত্র হয়ে পড়েছিল সে আগুনের বিস্তৃতিলাভের প্রধানতম সহায়। প্রভাতে প্রতি বাড়ির রন্ধনশালার আগুন এসে যোগ দিল সে হুতাশনে। বোমা ফেলবার ২০ মিনিটের মধ্যে সমগ্র হিরোশিমা শহর লাগল জ্বলতে।

হিরোশিমার আকাশে আনবিক তেজের ধূম বিরাট ছত্রাকারে ও অসংখ্য কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে শুরু করল। কিন্তু বেশিদূর সে ধূম উঠতে না উঠতে নামল বৃষ্টি, এবং সে বৃষ্টি মিশ্রিত ধূম আবার ফিরে আসল হিরোশিমার বুকের উপর। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হোল ছ'ঘণ্টা ধরে—তেজস্ক্রিয় পদার্থ মেশান জল-কাদা। প্রথম বৃষ্টির ধারা নামল ঐ দু'শ ফিট পরিধিরই মধ্যে, সেই সিমা-হাসপাতালের প্রাঙ্গণে।

বেলা প্রায় দু'টো। হিরোশিমা জ্বলন্ত লংকাপুরী। সন্ধ্যায় হিরোশিমায় পুড়বার আর কিছুই বাকী থাকল না: তবুও সারা রাত ধরে আগুন জ্বলেই চলেছে। পরদিন প্রভাতে ১০টায় সে আগুন হোল বিচ্ছিন্ন। তিন দিন ধরে হিরোশিমা পুড়ে সে আগুন হোল শান্ত, যদিও ছায়ের গাদায় চাপা আগুন ছিল এক সপ্তাহ ধরে জীবন্ত।

যখন হিরোশিমা পুড়ছে—সঠিকভাবে বলতে গেলে বোমা ফেলবার ষোল ঘণ্টা পরে—প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান রেডিও মারফৎ ঘোষণা করলেন: "এখন থেকে ষোলঘণ্টা পূর্বে একখানি বোমারু প্লেন থেকে হিরোশিমার উপর ফেলা হয়েছে একটা বোমা। এ বোমার তেজ-শক্তি ছিল ২০,০০০ টন টি, এন, টি, (T. N. T.) এবং

এ যুদ্ধে যতই শক্তিশালী বোমা ফেলা হয়ে থাকুক না কেন তার যে কোনোটির অপেক্ষা ২০০০ গুণ বেশি শক্তিশালী ও মারাত্মক।

ঐ বোমাকে বলা হয় এ্যাটম-বোমা। এ বোমাতে সেই শক্তি নিয়োগ করা হয়েছে যা' বিরাজিত আছে এই ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র-স্থলে সূর্য-গর্ভে। এ বোমা ফেলা হয়েছে দূর-প্রাচ্যের যুদ্ধকে নিঃশেষ করবার জন্যে। এ বোমা তৈরী করতে আমরা ব্যয় করেছি দশ-শত-কোটি টাকা (২০০০ মিলিয়ান ডলার)। এত বড় বৈজ্ঞানিক জুয়োখেলা (gambling) পৃথিবীর ইতিহাসে আর হয়নি। তবে পরিণামে আমরা হয়েছি জয়ী"।

পাহাড়ের উপর থেকে হিরোশিমার ভৌগলিক সীমানার চাক্ষুষ পরিচয় নিয়ে আমরা ফিরে এলাম এ্যাটমিক মিউজিয়মে। তখনও নতুন মিউজিয়ম-গৃহটিতে দর্শনীয় বস্তুগুলো পুরনো মিউজিয়ম-ঘর থেকে আনা হয়নি। নতুন মিউজিয়মের তুলনায় সে ঘরটা অনেক ছোট, কাজেই দ্রষ্টব্য-বস্তুগুলোতে ছিল বোঝাই। প্রেসিডেণ্টের ঘোষণা-পত্রখানি পকেটে করে ঢুকে পড়লাম সে মিউজিয়মে দেখতে ও বুঝতে যে, পৃথিবীর ইতিহাসের সর্ববৃহৎ বৈজ্ঞানিক জুয়োখেলায় তাঁরা হয়েছেন কতখানি জয়ী। ঘরে ঢুকে কৌতূহল নিবৃত্তি করবার চেষ্টা করলাম দ্রষ্টব্য সব বস্তুরই উপর একবার চোখ বুলিয়ে। এ যাদুঘরে সবকিছুই স্থান পেয়েছে, একমাত্র আনবিক তেজতুষ্ট জীবজন্তুর হাড়-পাঁজর ছাড়া। এখানে, এই আধুনিক মিউজিয়মে, আছে শিশুর ব্যবহৃত দোলনা ও খেলনা থেকে বহুজন-সেবিত পাথরের বুদ্ধমূর্তি। প্রত্যেকটির উপর সেই মুহূর্তের ছাপ পড়ে আছে যখন আনবিক তেজ আর বেগ নেমে এসেছিল হিরোশিমার মাটিতে।

সামনে বিস্তৃত রয়েছে সেই মুহূর্তের একখানা প্রাকৃতিক ম্যাপ (Physical map)। প্রথম কৌতূহল গিয়ে পড়ল তার উপর। হিরোশিমার কি নতুন-রূপ ফুটে উঠেছিল সেই মুহূর্তে যখন আনবিক

বোমা তার মাটি ছুঁলো! দেখলাম মহাশ্মশানের দৃশ্য। লোহার হাড় পাঁজর বের করে সে শ্মশানে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকখানা নতুন কংক্রীটের বাড়ি! তাদের মধ্যে যেখানি ছিল সেই সিমা-হাসপাতালের একটু কাছে সেখানিও এ ম্যাপে দেখা গেল অবিকল সেই অবস্থায় যেমন অবস্থায় আমরা দেখেছিলাম হাইপোসেণ্টার পরিদর্শন কালে। গোটা শহরের পাঁচ মাইল পরিধির মাঝে যে ক'খানা নতুন কংক্রীটের বাড়ি কোনো প্রকারে সে আনবিক বেগ ও তেজ ধারণ করতে পেরেছিল তাদের সংখ্যা গুনে দেখলাম মোটমাট সতরো।

এরই পাশে রাখা হয়েছে বিরাট এ্যালবাম যার প্রতিটি পাতায় ধরে রাখবার চেষ্টা হয়েছে সেই মুহূর্তে দৃষ্ট ঘটনাগুলো। আনবিক বোমা অন্য কোনো ভারী বোমার মত মাটি স্পর্শে ফাটেনি, সে কাজ সে বোমা আকাশ পথেই সমাধা করেছিল। ফলে গর্ত করে তাকে মাটিতে ঢুকে ভুমিকম্প সৃষ্ট করতে হয়নি। কিন্তু তা না করলেও এ ছিল এত তেজোময় ও বেগবান যে হাইপো-সেণ্টারের কাছে ১৬৫০ ফিটের মাঝে পড়ল যে সব হতভাগ্যেরা—সে মানুষই হোক বা অন্য কোনো জীবজন্তুই হোক—তাদের গাত্র-ত্বক এই মনুষ্য-সৃষ্ঠ সূর্যতাপে দগ্ধ হোল নিমেষে। অনতিবিলম্বে এসে পড়ল বেগ-ঝাপটা (blast)। সে বেগ সেই ত্বকহীন দেহের মেদ-মাংস অংশগুলোকে ছিনিয়ে নিল মানুষ আর পশুর হাড় থেকে। যারা ছিল ৪০০০ ফিট পরিধির মাঝে তারা ঝলসে গেল তাপে। কেউবা মরে পড়ে রইল সেখানেই, অর্ধমৃতেরা সে অবস্থায় ছুটল গাত্র জ্বালা নিবারণে। দগ্ধ শবের পাহাড় উঠল সে পরিধির মধ্যে।

ভারতের আদি কবি গরুড়ের সূর্য-তেজ পরাস্ত করবার অভিযান বর্ণনা করেছেন। সে অভিযানে যখন গরুড় হোল হতবীর্য ও মরণোন্মুখ তখন তাঁকে রক্ষা করতে এলেন গরুড়-জ্যেষ্ঠ সম্পাতি।

ভারতীয় সাহিত্যে কবি সৃষ্টি করলেন এক অনুপম ভ্রাতৃ-প্রেমের আলেখ্য। কিন্তু সত্যি সত্যি সূর্য-তেজ যে কি এবং তার দাহ্য শক্তির অভ্যন্তরে এসে পৌঁছলে বিধাতা-দত্ত যে কোনো রক্ষ-কবচ যে সম্পূর্ণভাবে বিফল ও অর্থহীন হয় তা' ছিল কবিগুরুর কাছে অজ্ঞেয়। তা' না হোলে বাল্মিকী সম্পাতির মুখ-দিয়ে সীতা-হরণের সংবাদ পরিবেশন নিশ্চয়ই করতেন না। হিরোশিমার আড়াই লক্ষ নর-নারী যারা সেদিন নিহত ও আহত হয়েছিল সেই মনুষ্য-সৃষ্ঠ সূর্যের তাপে তারাই কেবল বলতে পারত সে তেজোময় শক্তির সঠিক রূপের কথা। এখনও হিরোশিমা শহরে যে অনধিক লক্ষ রুগ্ন ও তেজোতুষ্ট নরনারী জীবনটুকু কোনোমতে রক্ষা করে চলা-ফেরা করছে তাঁরাও বল্‌তে পারে সম্পাতি সে তেজ সহ্য করতে আদৌ সক্ষম ছিল কি না!

ট্রুম্যান গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করলেন আনবিক বোমার কাহিনী। ফরেষ্টাল কিন্তু তাঁর ডাইরিতে লিখেছেন আমেরিকার সামরিক দপ্তরের সেক্রেটারীর মন্তব্য। সেক্রেটারী জাপানে আর বোমারু প্লেন না পাঠাতে জানালেন। কারণ, এ্যাটম-বোমার কাহিনী পড়ে এমন কি আমেরিকার মানুষগুলোও স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে—বলেছিলেন তিনি। বোধহয় ঐ একই কারণে জাপান জিম্মেদার হয়ে পড়বার পর ম্যাক-আর্থার এ্যাটম-বোমা-কাহিনী বর্ণনা বা প্রকাশ নিষিদ্ধ করে হুকুম জারী করেছিলেন। যে পর্যন্ত না জাপানী চুক্তি গৃহীত হোল সে হুকুম সব জাপানীরই উপর প্রযোজ্য ছিল। জাপানে হিরোশিমা ও নাগাসাকির সেদিনকার দুর্দশার যে সব ফোটো-চিত্র বর্তমানে দেখতে পাওয়া যায় তার সবগুলোই সেদিন গোপন করে রেখেছিল জাপানীরা।

আজ জাপান-আমেরিকা মিতালি প্রগাঢ়। কিন্তু তবুও এ্যাটম বোমা কাহিনীর কথা উঠলে—আমেরিকানরা একটু যেন বিব্রত হয়ে পড়েন। সে কাহিনী যেন চিরকালের জন্যেই চাপা পড়ে

থাকে এই হোল আমেরিকানদের ইচ্ছে। হিরোশিমা দেখে আমরা টোকিওতে ফিরেছি, এক আমেরিকান সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় এসে পড়ল হিরোশিমা। দেখলাম অন্যান্যদের মত তিনি এ্যাটম-বোমা কাহিনী আলোচনায় নারাজ নন। আলোচনায় বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন যে এ্যাটম-বোমা ব্যবহৃত না হোলে যুদ্ধ হোত আরও প্রলম্বিত, ক্ষয়-ক্ষতিও হোত আরও বেশি। যুদ্ধ যত তাড়াতাড়ি শেষ হয় তাই ছিল সেদিন কাম্য এবং এ্যাটম-বোমা অতি শীঘ্রই যুদ্ধ বিরতি এনেছিল।

ভদ্রলোক নিজেই তাঁর মন্তব্য পেশ করবার পরেও আমাকে নিরুত্তর দেখে হয়তো একটু অবাকই হয়েছিলেন। তাই আমার উত্তর শুনবার জন্যে একটু অধীর হয়েই প্রশ্ন করলেন ভারতবর্ষ সে অবস্থায় পড়লে কি করত? এবার কথা না বলে কোনো উপায়ই ছিল না; কোনো ঐতিহাসিক নজীর তো দেখাতে পাচ্ছি না, তবে একটা গল্প বলতে পারি—বললাম আমি। গল্পের উল্লেখ করতে স্বাভাবিক পেশাগত উৎসাহ নিয়ে জানতে চাইলেন গল্পের চুম্বক-টুকু। রামায়ণের রাম-পরশুরামের দ্বৈরথ যুদ্ধের কথা পাড়লাম। সংগ্রামে যখন পরশুরাম সাধারণ (conventional) অস্ত্র ব্যবহার করে শত্রুকে পরাভব করতে অসমর্থ হোলেন তখন নাম-না-জানা অস্ত্রের স্মরণ নিলেন। সে দিনের ভারতবর্ষের যুদ্ধ-নীতিতে সে অস্ত্র ব্যবহার-বিধি ছিল নিষিদ্ধ। ঋষি এসে দাঁড়ালেন মাঝখানে সে অস্ত্র সংবরণ করার মানসে। অস্ত্র সংবরণ বিদ্যায় অনভিজ্ঞ ও অপটু পরশুরাম তখন জানালেন নিজের অবস্থা। ভর্ৎসনা পেলেন ঋষির কাছ থেকে এবং তাঁর উপদেশে সে অনামী অস্ত্র ত্যাগ করলেন এমন কেন্দ্রে যেখানে ছিল না কোনো জীবজন্তু। গোপন অস্ত্রের অধিকারী পরশুরাম, সমাজে হয়েছিলেন ঘৃণ্য—বললাম আমি।

গল্পটি শুনে ভদ্রলোক কোন মন্তব্য না করে তাঁর অসম্মতি প্রকাশ করলেন দেহ-চাঞ্চল্যে। "ভুলবেন না", বললেন ভদ্রলোক, "ঐ

বছরেই মে মাসের ২৫শে আর ২৬শে তারিখে এক আমেরিকাই টোকিওর উপরই ফেলেছিল ৪০০০ টন আগুনে-বোমা এবং সে আগুন বিস্তৃত হয়েছিল ৩০ বর্গমাইল জুড়ে। সে আগুনে পুড়েছিল টোকিওর দু'লক্ষ বাড়িঘর আর সম্পত্তি। তবে এ্যাটম বোমাতে কি দোষ করল?" উত্তর দিলাম তা হোলেও টোকিওর মানুষগুলো জানত তারা কিসে মরছে, কি অস্ত্রে তাদের সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে, এবং ইচ্ছে করলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতেও পারত। কিন্তু এ্যাটম বোমা তো মানুষকে সে অবকাশ একটুও দেয়নি। কোনো প্রকার সুযোগ না দিয়ে এ মারণাস্ত্র সবাইকে হানল আঘাত। আজও হিরোশিমার প্রায় এক লাখ বাসিন্দা যে দৈহিক গ্লানি ভুগে আসছে এ্যাটম তাপের কৃপায়, টোকিওতে সে অবস্থা নিশ্চয়ই আসেনি কোনোদিন।

ভদ্রলোক উঠে পড়লেন। দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়েছি, তখন তার অনুমতি চাইলাম একটা ছোট্ট প্রশ্ন করতে। অতি সহজেই ও সহাস্যে সে অনুমতি দিলেন ভদ্রলোক। জিজ্ঞেসা করলাম, তিনি কি এ ধারণা সত্যি বলে মনে করেন না যে, সেদিনকার এ অজ্ঞেয় মারণাস্ত্র আমেরিকা জাপানের বুকের উপর ফেলতে সাহসী হয়েছিল একমাত্র এই কারণেই যে জাপান এশিয়ায় অবস্থিত? হয়তো এই দুর্ভাগ্য আফ্রিকারও আসতে পারত। কিন্তু ইয়োরোপের বেলায়?— বোধ হয় নয়।

কিন্তু দেখলাম ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে আমেরিকান মনও স্থিতিশীল হয়ে পড়েছে। উষ্মা যতটা সম্ভব সংবরণ করে ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন—সেরূপ ধারণা করা আমার পক্ষে উচিত হবে না। তাঁর কথা শুনে সেদিন আর কোনো মন্তব্য করিনি, তবে আমার সে ধারণার কোনোই পরিবর্ত্তন এখনও হয়নি।

এ্যাটমিক মিউজিয়ম দেখে আমরা হাটতে শুরু করলাম হিরোশিমার সেই অঞ্চলে যেখানে নেমে এসেছিল জলন্ত সৌরবলয়-

যার প্রতাপে—টলিল কনকলংকা বীরপদভরে। বর্ত্তমানে সে ধ্বংসস্তূপের আর কোনো চিহ্নই নেই। যেখানে একদা ছিল সিমা-হাসপাতাল এখন সেখানে মাঠ বা ঘন বসতি, যেখানে ছিল ঘনবসতি এখন সেখানে এক'শ মিটার (তিন'শ ফিট) চওড়া রাস্তা। ঘুরতে ঘুরতে আমরা উপস্থিত হোলাম হিরোশিমা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল মিউজিয়মের ভাঙা বাড়িখানার সামনে। ডাক্তারী ছাত্রের ঘরে ঢুকলে যেমন দেওয়ালে টাঙান অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় রক্তমাংসহীন মানুষের হাড়ের কাঠামো, এ বাড়ি খানা দাড়িয়ে আছে ঠিক অনুরূপ প্রতিচ্ছবি নিয়ে। এ্যাটম বোমার পতন বিন্দুতে রাখবার মতন কোনো কিছুই ছিল না, সে কেন্দ্রের আশ পাশে কেবল দাড়িয়ে থাকতে পেরেছিল এই লোহার ফ্রেমে বাঁধা পাথুরে বাড়িখানা; তাই এটাকে সযত্নে রক্ষা করা হচ্ছে এ্যাটম বিধ্বস্ত নমুনা হিসেবে, ভবিষ্যতের মানুষকে দেখাবার ও বুঝাবার জন্যে। আজও মনুষ্যসৃষ্ট সূর্যকরোজ্জ্বলে ধৌত হয়ে এ বাড়িখানা হয়নি নিষ্পাপ, নিষ্কলংক। এর পাষাণ দূষিত ও বোধ হয় ক্ষুধিত, তাই বাড়িখানা তার-কাটার বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। এ্যাটম তেজে কেমন করে ক্ষণিকের মধ্যেই পাষাণ আর লোহা গলতে আরম্ভ করেছিল তার পরিচয় পেয়েছিলাম মিউজিয়মে, আর এখানে এসে দেখলাম ও বুঝতে পারলাম সেই তেজদগ্ধ মানুষের হাড় পাঁজর থেকে এ্যাটম ঝাপটা-বেগ কেমন করে ছাড়িয়ে নিয়েছিল মানুষের মাংসপেশী। লোহার ফ্রেমের উপর সিমেন্টের গাঁথা পাথরগুলো ঠিকরে ছুটে পড়েছিল দেওয়াল থেকে সে অসহনীয় বেগের দাপটে। লোহার ফ্রেমগুলো হয়ে গেছে ম্যুক্ত যেন কোনো দৈত্য সেগুলোকে মুচড়ে রেখে ফেলে গেছে।

অদূরে বইছে অতা (Ota) নদী। এ্যাটম তেজ আর বেগ বিধ্বস্ত হয়ে যে মানুষগুলো তখনও হয়নি উন্মাদ, সেই মুহূর্ত্তে যখন চারিদিকে উঠেছে আর্তনাদ আর ব্যাপকভাবে বিস্তারিত হচ্ছে আগুনের লেলিহান জিহ্বা, তারই মধ্যে ছুটেছিল সে নদীর শীতল

জলে গায়ের জ্বালা মেটাতে। অনেকে ঝাঁপও দিয়েছিল দিক্‌-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সে জলে। একদিন ঠিক ঐ প্রকার তেজদগ্ধ অবস্থায় স্বয়ং অগ্নি দেবতাদের পরামর্শে ও কালিদাসের কল্পনা-প্রতিভায় পেয়েছিলেন আশু পরিত্রাণ গঙ্গাজলে ডুব দিয়ে। কিন্তু হিরোশিমার মানুষগুলো অতা-জলে পায়নি কোনো নিরাময়। অতা-স্রোত তাদের নিয়ে গেল সাগর সঙ্গমে জলজন্তুর আহার্য করে। জাপানী মতে এ অসহায়দের সংখ্যা ছিল কয়েক হাজার।

বাড়িখানা ঘুরে ফিরে দেখে আমরা উপস্থিত হোলাম এর পেছনে। অগ্নিকাণ্ডের পর যেমন পুরনো ভিটের উপর মানুষ গড়ে তোলে সাময়িক কুটির কেবল আশ্রয় পাবার আশায়, এ ব্যবস্থাও ঠিক তাই মনে হোল। হিরোশিমা দেখবার পর টোকিওতে ফিরে আসলে জাপানের ষ্টেট ব্রডকাষ্টিং-এ জাপান-অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলতে হয়েছিল। তখন বলেছিলাম যে হিরোশিমার যে স্মৃতি নিয়ে ফিরে যাব স্বদেশে, তা' জড়িয়ে আছে মানুষের আশ্রয় গড়ার এই নব প্রচেষ্টার মধ্যে। তাদের আজ রক্ষা করার তেমন কিছুই নেই ; তাদের দাবীও হয়েছে শেষ এক নিমেষে, আত্মীয়তা বোধ যা অবশিষ্ট আছে তা অতি সামান্য, কিন্তু তবুও সে মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে তাদের ভগ্ন আশা ও আকাংখা রূপ পেয়েছে ঐ আশ্রয়টুকু সম্বল করে। এ আশ্রয় কেন্দ্রের বিন্দুস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখলাম মন্দির এবং তাতে বিরাজিত গৌতম বুদ্ধ। বাসা হারিয়ে পাখী যেমন খুঁজে ফেরে নতুন নীড় আবার আশ্রয় লাভের আশায়, তেমনি হিরোশিমা কাণ্ডের পর জাপানী মানুষ যেন খুঁজছে কোনো অপার্থিব শক্তি যা তাকে যোগান দিতে পারে মনের খোরাক বেঁচে থাকবার জন্যে।

এখানে সাইন বোর্ড টাঙিয়ে কুটীর বেঁধেছেন আনবিক তেজোদুষ্ট রোগী ওসিকাওয়া, যার সঙ্গে হিরোশিমার প্রায় প্রতিটি বৈদেশিক দর্শকেরই পরিচয় হয়ে থাকে। ভদ্রলোকের স্বাস্থ্য দেখে ধারণা করতে পারিনি যে তিনি কোনোদিন রুগ্ন ছিলেন। অথচ সাইন-বোর্ডে

আমেরিকান কাগজের মন্তব্য উদ্ধার করে বলা হয়েছে যে হিরোশিমার একনম্বর রোগী হোলেন তিনি। আলাপে জানতে পারলাম হাসপাতালে তাঁকে থাকতে হয়েছে ছ'বছর এ্যাটমিক রোগমুক্তি পেতে। কথায় কথায় ভদ্রলোক তাঁর দেহের কোট খুলে ফেললেন এবং তখন আমরা বুঝতে পারলাম আনবিক তেজের দাহিকা শক্তি। পতন-বিন্দু থেকে অনেক দূরে তখন ছিলেন তিনি। আকাশে বোমার নতুন আকৃতি ও প্রকৃতি দেখেই তাঁর মনে হয়েছিল যে এ সাধারণ বোমা নয়, তাই বোমা মাটি ছুঁবার পূর্বেই তিনি প্রাণপণে সে পতন-বিন্দু থেকে আরও দূরে পালাবার চেষ্টাও করেছিলেন। পরিণামে অচৈতন্য হয়ে মাটিতে মুখ রেখে পড়ে যান। তাই আজ তাঁর পিঠে লেখা রয়েছে এ্যাটম-বোমা কাহিনী। মনে হোল যেন একখানা ফিজিক্যাল ম্যাপ ক্ষোদাই করে রাখা হয়েছে তাঁহার দেহের ওপরে।

স্মৃতি ধরে রাখবার জন্যে ভক্তেরা তীর্থ থেকে আর কিছু না জুটলে নিয়ে আসেন তীর্থ মৃত্তিকা। কিন্তু মানুষের এই নতুন তীর্থে ও কাজটি কেউই করেন বলে মনে হয় না। এ্যাটম বোমায় যখন হিরোশিমা ধ্বংস হোল তখন একদল বিজ্ঞানী মতামত দিলেন হিরোশিমা-মাটি এত দুষ্ট হয়ে পড়েছে যে সেখানে কোনো গাছ-পালা আগামী ৭৫ বছরের মধ্যে জন্মাবেনা। সর্বংসহা বসুমতী এ্যাটম তেজ ধারণ করেও কিন্তু তার আদি সন্তান বৃক্ষকে কোল দিতে ভোলেননি। ঘাস তো হয়েছেই এমনকি নতুন বড় বড় রাস্তার পাশে যেসব চারাগাছগুলো লাগান হয়েছে তারাও যে মাটি থেকে জীবনী-শক্তি নিচ্ছে তারও পরিচয় আমরা পেলাম।

ভারতীয় কবি কল্পনা সাহায্যে পাষাণের ভেলা বানাতে পেরেছেন, হিরোশিমাতে দেখলাম এ্যাটম-তেজে পাষাণ গলতে। জাপান আগ্নেয়গিরির দেশ। আকাশ পথে চলতে চলতে আমরা দেখেছি ধূমায়িত গিরিগহ্বর আর তার উপত্যকায় পড়ে আছে সহস্র বিন্দুধারে সমন্বিত নানা আকার বিশিষ্ট পাথুরে ঝামা। হিরোশিমার

এ্যাটম বোমার পতন-বিন্দুতে পাষাণের হয়েছিল ঐ একই রূপান্তর। মিউজিয়মে অন্যান্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে স্থান পেয়েছে এক পাষাণ বুদ্ধমূর্তি। সে মূর্তি হয়তো এসেছে হিরোশিমার বিখ্যাত ফুদোয়িন (Fudoin Temple) মন্দির থেকে। এই পুরনো মন্দিরের সব কিছুই ছিল জাপানের জাতীয় সম্পত্তি। আজ সবই হয়েছে ধ্বংস, আর বুদ্ধ-মূর্তিটি স্থান পেয়েছে এই এ্যাটমিক মিউজিয়মে। মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম সে প্রশান্ত দৃষ্টিতে পড়েছে এ্যাটমিক তেজের ছাপ। অতি আশ্চর্য বলে মনে হোল একখানা পাষাণ-সিঁড়ি। হয়তো এর স্থান ছিল কোনো প্রাসাদে বা মন্দিরে। যখন হিরোশিমার সেই অ-শুভ মুহূর্ত এসে পড়েছিল এবং এ্যাটম তেজে ও আলোতে পুড়তে আর গলতে শুরু করল পতন-পরিধির সবকিছু তখন কোনো হতভাগ্য সে পাষাণের সিঁড়ির ওপরে এসে পড়েছিল এক নিমিষের জন্যে। পাষাণ হয়েছে তখন দ্রব আর তা'তে ধরা রয়েছে সে হতভাগ্যের ছায়া। কোথায়ও বা রাখা হয়েছে বালি-কাঁচ। এ্যাটম-তেজে বালি পরিণত হতে চলেছিল কাঁচে।

যে অঞ্চল হোল বোমার পতন-বিন্দু তা' ছিল হিরোশিমার বড়বাজার। এ অঞ্চলে কেবল দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়ম ছাড়া আর দু'টো কংক্রীটের বাড়ি কোনো প্রকারে। বোমাটী নিয়ে আকাশে উঠেছিল বি-২৯ সুপারফরট্রেস—এনোলা গে (B-29 Superfortress, Enola Gay), বোমা ফেললেন কর্ণেল ডব্লিও ফেরেনি, তাঁর সঙ্গী ছিলেন বোমার স্রষ্টা (Bomb maker) ক্যাপটেন পারসনস্। বোমার অগ্নি পুচ্ছ ১৭০ মাইল দূর থেকে অন্য এক প্লেন থেকে লক্ষ্য রাখা হয়। সুপারফরট্রেস থেকে দেখা গেল মাটি ছুঁলে সে বোমা সৃষ্টি করল ঘন কালো মেঘ আর সে মেঘ হিরোশিমার আকাশ জুড়ে ওপরে উঠল ৪০,০০০ ফিট। মেঘ সরে যাবার পর নেওয়া হোল বিধ্বস্ত হিরোশিমার ছবি। সে ছবিতে দেখা গেল হিরো-শিমা নিশ্চিহ্ন। কেবল রাস্তাগুলোর সীমানা ধরা পড়ল সে ছবিতে।

জাপান আমেরিকার দখলে যাবার প্রায় এক বছর পরে (৩০শে জুন ১৯৪৬) আমেরিকান বিজ্ঞানীরা আসলেন হিরোশিমার আনবিক ধ্বংস অনুসন্ধানে। তাঁরা দেখলেন আনবিক তেজে মরেছে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোক। ঘরবাড়ি ধ্বংসে ও উড়ন্ত জানালা, দরজা, টিন, কাঠের আঘাতে মরেছেও অনেক, আর এ্যাটম রেডিয়ামে মৃত্যুর শেষ তো এখনও হয়নি। হিরোশিমাতে যে বোমা ফেলা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল নাগাসাকি-বোমা আর বিকনীতে যে উদ্‌যান (হাইড্রোজেন) বোমা ছাড়া হয়েছিল তার শক্তির কথা তো বিশ্ববিদিত। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র হিরোশিমা 'বোমাটি যে বিনাশ এক মুহূর্তে করে ফেলল তা' অনুসন্ধান করে আমেরিকান বিজ্ঞানীরা বল্‌লেন যে এর এত ধ্বংস-শক্তি যে এ থেকে আত্মরক্ষার কোনোই পথ নেই।

এ্যাটম বোমা পড়বার পর মুহূর্তে হিরোশিমার বা জাপানী সমাজ-জীবনে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল তা জানবার জন্যে আমি বিশেষ উৎসুক হয়েছিলাম। মৃত্যুর মুখোমুখি সমাজ-জীবন কি রূপ নেয় ইতিহাসে তার নজীর আছে অতি অল্পই। জাপানী বোমা যখন খিদিরপুরের ডকে পড়ে সেদিন, সে ঘটনার অব্যবহিত পরে যেতে হয়েছিল আমাদের সে অঞ্চলে। ক্ষতি অতি অল্পই হয়েছিল কিন্তু তবুও এক বেগেই (blast) মরেছিল অনেকগুলো মানুষ। বোমার ভয়ে মানুষ ছুটেছে পরিত্রাণের আশায়, আশ্রয় পায়নি, পথেই পড়ে আছে অবিকল সেই অবস্থায় যে অবস্থায় সে ছুটেছিল। কেউবা মৃত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম দেওয়ালের পাশে যেখানে এসে পৌঁছেছিল সে বোমাকৃত বায়ু-ঝাপটা। পরদিন থেকে শুরু হোল কলকাতা-ত্যাগ-পালা। স্টেশনে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। ভীত নরনারী ছুটেছে শহর থেকে দূরে! যারা স্থান পেল না গাড়ীতে তারা হাঁটতে শুরু করল।

সে অবস্থার কথা বেশ স্মরণে ছিল বলেই উৎসুক হোলাম

জানবার জন্যে হিরোশিমায় কি হয়েছিল? হিরোশিমার তেত্রিশটি ফায়ার ব্রিগেড স্টেশনের সাতাশটিই ধ্বংস হয়ে গেছিল। তাই সক্ষম হোক বা না হোক আগুন থামানোর কোনই চেষ্টা করা সম্ভবপর হয়নি। প্রায় ৩০০ জন ডাক্তারের মধ্যে ৩০ জন, ২৫০০ জন নার্সের মধ্যে ৬০০ জন বেঁচেছিলেন এবং রোগী দেখবার মত শারীরিক ও মানসিক অবস্থা তাঁদের ছিল। একটা ছাড়া শহরের সবগুলো হাসপাতালই হয়েছিল সম্পূর্ণ ধ্বংস। শহরের জল, আলো, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেলওয়ে-ব্যবস্থা সবই ভেঙে পড়েছিল সে লংকা-কাণ্ডের পর। টোকিও বা নিকটবর্তী অন্য কোনো শহরের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষাও করা সম্ভবপর হয়নি। রেলপথ হয়ে পড়েছিল অচল কারণ এ্যাটমিক ঝড়ে ভেঙে পড়েছিল একটা ব্রিজ এবং ১০০-মিটার (তিন'শ ফিট) দীর্ঘ মাটির পথ ধ্বসে গিয়েছিল এবং স্থানান্তরে এ্যাটমিক তেজে ১২০-মিটার লৌহবর্ত্ম কুঁকড়ে-মুকড়ে যাওয়াতে রেল চলাচল থাকল ৫৬ ঘণ্টা বন্ধ। কিন্তু সে বিপর্যয়ে পড়েও হিরোশিমার নাগরিক-জীবন ভেঙে পড়েনি দূরে সমুদ্রোপকূলে ছিল একটা জাহাজী-অফিস অনেকটা অক্ষত। সেটাকে করা হোল হাসপাতাল রুগ্ন ও আর্তদের জন্যে। যে ডাক্তার এবং যে নার্স পরিত্রাণ পেয়েছিলেন সে লংকা-কাণ্ড থেকে, ছুটলেন হাসপাতালে রুগ্নদের পরিচর্যা করতে। একদিকে পথে পথে উঠল কান্নার রোল, অপরদিকে চলল সামগ্রিক প্রচেষ্টা মানুষকে বাঁচাবার জন্যে।

পরের দিন প্লেনে খবর নেবার পর টোকিওর আর্মি ও নেভি হেডকোয়ার্টারস্ জানতে পারল হিরোশিমা ধ্বংসের ব্যাপকতা। টোকিও ইউনিভারসিটির বিজ্ঞানীরা ছুটলেন হিরোশিমায় এ্যাটম তেজ ও বেগের অনুসন্ধানে। জাপানী বৈদেশিক দপ্তর ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ থেকেই খবর পেয়েছিল যে আমেরিকায় এ্যাটম বোমা তৈরী করতে ব্যাপক চেষ্টা চলছে। জার্মেন প্রচেষ্টা কতদূর সার্থক হতে

পেরেছে তার সঠিক খবর জাপান রেখে আসছিল। জাপানী এক্সপার্টদের ধারণা ছিল যে এত শীঘ্র এ নতুন মারণাস্ত্র মানুষের তূণে আসতে পারে না। তাই ট্রুম্যানের ঘোষণার পরেও জাপান স্বীকার করেনি যে হিরোশিমায় ফেলা হয়েছে এ্যাটম-বোমা। রেডিও মারফৎ জাপানের তরফ থেকে বলা হোল "শত্রুরা হিরোশিমার উপরে নতুন কোনো বোমা ফেলেছে। এ বোমা কোন্ ধরণের তা'র অনুসন্ধান চলছে।"

যুদ্ধের সময় যেমন জাপান অস্বীকার করবার চেষ্টা করল এ্যাটম-বোমার কথা দেশের লোকের কাছে, তেমনি পরে দখলীদারের পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ করে দিল এ্যাটম বোমা আলোচনা বা হিরোশিমা-কাহিনী। এরই ফলে সে দিনকার সেই অলোকসাধারণ অভিজ্ঞতার কথা অনেক দিন রইল অজ্ঞাত দেশে ও বিদেশের লোকদের কাছে। আমরা যখন হিরোশিমায় গেলাম তখন জাপান-আমেরিকা চুক্তির ফলে হিরোশিমা-স্মৃতি যেমন পুরনো তেমনি হয়েছে তীব্রতাশূন্য। কেবল যে সব হতভাগ্যেরা তাদের দেহের ব্যাহ্যাভ্যন্তরে আনবিক তুষানলে পুড়ছে, তাদেরই মুখে দেখেছিলাম বিষাদ। এদের সংখ্যাও অল্প নয়। খোঁজ খবর নিয়ে জানা গিয়েছে এখনও সমগ্র জাপানে হিরোশিমা এ্যাটম তেজে দগ্ধ ও তুষ্ট নর নারীর সংখ্যা হবে এক লক্ষের মত। যারা ছিল সেদিন নিতান্ত শিশু, আজ তারা হয়েছে কিশোর এবং সেদিনের কিশোরেরা আজকের যুবক-যুবতী। দেহের অভ্যন্তরে তারা সকলেই পুষছে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় ব্যাধি, কিন্তু যে ক্ষত চিহ্ন তারা ২৪ ঘণ্টা ধরে বহন করে চলেছে প্রকাশ্যে তা এতই মর্মান্তিক যে তাদের ভাগ্যের সঙ্গে সমতুলনীয় হয় কেবল সেইসব হতভাগিনীদের, যা'রা ভারতবর্ষ ভাগাভাগির সময়কার পাঞ্জাবী দাংগা- হাংগামায় ছিটকে পড়েছিল শত্রুহাতে এবং যা'রা এ'দের কপালে রেখে দিয়েছিল অপমানের কলংক তিলক চিরজীবনের জন্যে।

সাধারণ হিরোশিমা নাগরিককে দেখে মনে হয়েছিল এরি মধ্যে

হিরোশিমা-কাহিনী কুরুক্ষেত্র কাহিনীর মতই একটা ঘুমন্ত স্মৃতি হয়ে পড়েছে জাপানে। ম্যাক-আর্থারী শাসন-ব্যবস্থা, আমেরিকান দাক্ষিণ্য এবং যুদ্ধান্তে নতুন জাপান গড়ে তুলবার দায়িত্বে হিরোশিমা-নাগাসাকি-কাণ্ড ধ্যানে রাখবার অবকাশ না পাওয়াতে সে কাহিনী ম্লান হয়ে পড়ছিল। কিন্তু বিকনীতে হাইড্রোজেন বোমার এক্সপেরিমেণ্টে সে ক্ষত আবার নতুন করে স্মৃতিতে দেখা দিল। জাপানে থাকতে সহজেই বুঝতে পেরেছিলাম এই এ্যাটম বা হাইড্রোজেন অস্ত্র-ব্যবহারে সাধারণ জাপানী কত কাতর ও ভীত! আর যে কোনো দেশ এ্যাটমিক যুদ্ধ কামনা করুক না কেন জাপান যে এটা চায় না তা' যে কোনো জাপানীর সঙ্গে আলাপ আলোচনায় আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। এ্যাটমিক অস্ত্রের ব্যবহার ও গবেষণার ইতিহাস ছোট্ট, কিন্তু যে তিন তিনবার এর ব্যবহারে বা শিক্ষানবিশীতে মানুষকে বলি দিতে হয়েছে, সে বলি এসেছে কেবলমাত্র জাপান থেকে।

এ্যাটমিক যুগের সূতিকাঘর স্বরূপ যে লোহা-কংক্রীটের বাড়িখানা আমরা হিরোশিমায় দেখলাম তার সদর দরজায় একখানা নোটিস-বোর্ড টাঙান আছে। তা'তে লেখা আছে—আমাদের ঐকান্তিক আশা আর যেন হিরোশিমা কাণ্ড না ঘটে (to symbolise our wish that there be no Hiroshimas)। কুরুক্ষেত্রে এ ধ্বনি ওঠেনি। সেখানে অতি পরিষ্কার ভাষায় এবং চিরকালের জন্যে চোখ-রাঙানো হয়েছে এই বলে দরকার হোলে আবার সম্ভবামি। ম্যাক-আর্থার জাপানী যুদ্ধবাজদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশে বলেছিলেন—দাঁড়াও, আমি আসছি! কুরুক্ষেত্রে সে তীব্র ভর্ৎসনা জানবার পরেও ভারতবর্ষের মানুষের আদিম প্রকৃতির কোনো পরিবর্তন যে বড় একটা হয়েছে ইতিহাস তা' স্বীকার করেনা। ম্যাক-আর্থারী চোখ-রাঙানীতেই কি সে পরিবর্তন এসেছে?

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি হিরোশিমার স্মৃতি-

বিজড়িত পার্কে (Memorial Park)। সেখানে দেখলাম জাপানী শিল্পী হিরোশিমা-কাহিনী মনে রাখবার জন্যে গড়ে তুলেছেন এক আধুনিক স্মৃতি-সৌধ। যুদ্ধের সময় বোমা থেকে রক্ষা পাবার আশায় যেমন ভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল কংক্রীটের আশ্রয় স্থল (bomb shelter) কলকাতার রাস্তায় রাস্তায়, এ সৌধটিও দেখতে তদনুরূপ। দশ-ফুট-উঁচু কংক্রীটের খোলা খিলানের মাঝে মাটিতে রাখা হয়েছে পাথরের বাক্স এবং তারই অভ্যন্তরে আছে নামের তালিকা সে-সব হতভাগ্যদের যারা দিয়েছিল প্রাণ বলি এ্যাটমিক যুগ প্রবর্তন মুহূর্তে। নামের তালিকা এখনও অসম্পূর্ণ কারণ এ্যাটমিক তেজদুষ্ট শেষ রোগীর দল এখন হিরোশিমা ও জাপানের নানা শহরে চিকিৎসাধীন।

সৌধটি পুরোপুরি আভরণহীন। খোলা খিলানটি এমন জায়গায় অবস্থিত যার মধ্য দিয়ে একদিকে নজরে পড়ে সেই এ্যাটমিক সূতিকাগৃহখানি—ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়মের বাড়ি—আর অন্যদিকে দাঁড়ালে দেখা যায় নতুন এ্যাটমিক মিউজিয়ম, পুরোপুরি আধুনিক স্থাপত্যের নমুনা। শিল্পী যেন তাঁর কল্পনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন এ্যাটমিক সবকিছুরই পরিবেশে।

আমরা সৌধটির কাছে গেলে দেখতে পেলাম স্মৃতি-আধারে লেখা রয়েছে জাপানী অক্ষরে ও ভাষায়—হিরোশিমা-বাণী। জাপানী বন্ধুকে অনুরোধ করলে তিনি এর মর্মার্থ বুঝিয়ে দিলেন—লিখিত বাণীটি তর্জমা করে। বুঝতে পারলাম সে বাণী তর্জমায় কাতর হয় ধরা দিতে। অনুভূতিতে এক অপরিস্ফুট ধারণা এল —যেন কোনো মানুষী মা তাঁর শিশু-সন্তানকে দোলায় রেখে সান্ত্বনা দিচ্ছেন শান্তিতে ঘুমুতে এই বলে যে, রাক্ষসেরা পুরী ছেড়ে চলে গেছে, আর কোনো ভয় নেই। ভাষা কিন্তু ভাবকে ধরবার চেষ্টা করেনি আদৌ এবং সে ভাষা নিয়েছে এমন বেয়াড়া ভংগি যে, যে কোনো কানে শুনাবে বেসুরো। তর্জমায় সে বাণী হোল,

"শান্তিতে ঘুমোও, আমরা এ ভুল আর করব না"। (sleep peacefully for we shall not commit the error again) এ কাদের কথা ? এ "আমরা" কা'রা ?—সে প্রশ্ন যেমন আমরা করেছি তেমনি করেছে হিরোশিমা তীর্থগামী যে কোনো দর্শক। বৈদেশিক দপ্তরের বন্ধুও অবাক হোলেন বাণীটির ভাষায়। ইতিহাসের সামনে এতবড় ব্যাসকূট ব্যাখ্যা একমাত্র দ্রোণ-বধ যুদ্ধে প্রথম পাণ্ডবের মুখেই কবি কল্পনা করতে পেরেছিলেন বলে জানতাম। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এ্যাটমিক যুগের সমস্ত ঐতিহাসিক খুঁটিনাটি, মাল-মসল্লা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এ অ-সত্য কাহিনী জাপানী ইতিহাসে কেমন করে স্থান পেল ?

হিরোশিমা দেখবার পর আমরা উপস্থিত হোলাম হিরোশিমা রেলওয়ে ষ্টেশনে। স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্রের রিপোর্টারেরা পূর্বাহ্ণেই সেখানে এসেছিলেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। এদের একজন উঠালেন ঐ হিরোশিমার বাণীটির ভাষ্যের কথা। তিনি জানালেন যে ডাঃ রাধাবিনোদ পাল হিরোশিমার স্মৃতি-সৌধে লিখিত বাণীটির মর্মার্থ শুনে আমাদেরই মত বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। ডাঃ পাল নাকি বলেছিলেন এ বাণী অসংগত, অসত্যও বটে কারণ জাপানীরা তো এ্যাটম বোমা ফেলেনি। কিন্তু হিরোশমার স্মৃতি-সৌধ জাপানীদেরই এবং তা'রাই এ স্থাপনা করেছে মহা-শোকে। আমাদের একজন অবশ্য ওদের বুঝাবার চেষ্টা করলেন যে বাণীটি সব মানুষের তরফ থেকে দেখলে গ্রাহ্য হতেও পারে। জানিনা তাঁর ব্যাখ্যা ওঁদের মনঃপূত হোল কি না। কিন্তু বাণীটির মর্মার্থ শুনে আমার মনে হয়েছিল যে, যেমন হিরোশিমা হোল আনাবক যুগের পাদপীঠ তেমনি এই স্মৃতি-সৌধটির গায়ে লেখা বাণীটি হোল সে যুগের জাপানী জাতের গ্লানি ও অপমানের পরিচায়ক। অতি সু-কৌশলে সে বাণীটি জানিয়ে দেয় যুদ্ধান্তে জাপানী দুর্দশার পরিমাণটা।

মদগর্বে বিজেতা সর্বকালে এবং সর্বদেশেই রেখে দেয় স্মৃতি-সৌধ পরাজিতের ক্ষত-চিহ্ন ও অপমানকে জীবন্ত করে রাখতে। ভারতবর্ষেরও অতীত এমন কি বর্তমান ইতিহাসে ঐ একই ধারা অব্যাহত আছে। উত্তর ভারতের প্রাচীন তীর্থগুলোতে যে সব ভাঙা ও সর্বপ্রকারে দুর্দশাগ্রস্ত মন্দির দেখতে পাওয়া যায় সেগুলোও ঐ একই সাক্ষ্য বহন করে আসছে। বর্তমানের কলকাতা ময়দানের গঙ্গাতীরে যে লৌহ-গম্বুজ দাঁড়িয়ে আছে তা' তো আদিতে ছিল গোয়ালিওরের যুদ্ধে পরাজিতদের লৌহ-কামান। বিজেতা সেগুলো গালিয়ে প্রতিষ্ঠা করল ঐ স্মৃতি-সৌধ। রাজভবনের প্রাঙ্গণে অলংকারস্বরূপ রাখা হয়েছে যে ড্রাগন-মুখো কামানগুলো তা'ও এক প্রকার স্মৃতিসৌধ। বিজেতা সেগুলো একদা কেড়ে এনেছিল চীন থেকে এবং রাজভবনের প্রাঙ্গনে সেগুলো রেখে দিল সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতে চীনের সেই অপমান কাহিনী।

এ জাতীয় স্মৃতি-সৌধ স্থাপনে বৈচিত্র্যও দেখা যায়। সম্রাট অশোক কলিঙ্গ বিজয়ের পর ক্ষয়-ক্ষতির হিসেব করে দেখলেন তাঁর বিজয়ী সৈন্যরা যুদ্ধান্তে বন্দী করে নিয়ে এসেছে নর-নারীদের যা'দের সংখ্যা তা'দের গৃহপালিত হাতী, ঘোড়া, গোরু সমেত হবে এক লক্ষ। যুদ্ধে নিহতদের সংখ্যা ততোধিক। এদের মধ্যে ছিল নিরপরাধ ও ধর্মাধর্মে জ্ঞানবৃদ্ধেরা, পিতা-মাতার প্রতি ভক্তিপরায়ণেরা এবং বিবেক-বুদ্ধি-সম্পন্নেরা। নিজে নিজেকেই প্রশ্ন করলেন অশোক—এ যুদ্ধ কিমার্থে, এ লোকক্ষয় কোন্ প্রয়োজনে? সে সনাতন প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে উত্তর চাইলেন—কঃ পন্থা? তাঁর সেই ভাবনার যথাযথ উত্তর তিনিই দিলেন ভারতবর্ষের নানা জায়গায় এক বিচিত্র ধরণের স্মৃতিসৌধের মারফৎ। সেই আত্ম-গ্লানি উদ্ভূত অশোক শিলালেখ পৃথিবীর ইতিহাসে আনল এক নতুন অধ্যায় যা' শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে এখনও হাতছানি দেয়। উড়িষ্যায় গিয়ে কল্পনা করবার চেষ্টা করেছি সেই আত্ম-পীড়িত মানুষটির মনোভাব

যা' তাঁর পরবর্তী জীবনে এবং সেই সাথে ভারতবর্ষের মানস-ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছিল এক নতুন চিন্তাধারা যার ওপর শেষ মন্তব্য পেশ করবার সময় এখনও আসেনি।

আর আজ দেখলাম হিরোশিমার স্মৃতি-সৌধ। আর্ত মানুষ হিরোশিমা-কাণ্ডের পর মনের ইচ্ছেই প্রকাশ করে বলেছে—আর যেন হিরোশিমা না ঘটে! বিকার-গ্রস্তের ভাষায় সে রূপ দিতে চেষ্টা করেছে এই বলে যে, সে আর ভুল করবে না। দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনায় সে ভাষার গাঁথুনি হয়তো—হয়তোই বা কেন?—করতে হয়েছে হাল্‌কা। কিন্তু কে পরিহাস করতে পারে সে স্মৃতি-সৌধের পেছনকার অসহায় নর-নারীর আকুল বেদনাকে!

সিন্দুরে মেঘ দেখার মতনই জাপানী আত্মচেতনা আজ আনবিক অস্ত্রের পরীক্ষাতে সংকুচিত। হিরোশিমা তীর্থে না গেলে জাপানী মানুষের হৃদয়-দৌর্বল্য ধারণা করা অসম্ভব। মিউজিয়মে রক্ষিত এ্যালবাম-খানার পাতা উল্‌টালে যখন চোখে পড়ে "ত্বগস্থিমাংসম প্রলয়াঞ্চ যাতুম," যখন চোখের উপর ধরা দেয় প্রবল ও দুর্বলের ধুমায়িত শেষ অবস্থা, যখন নিমিষের মধ্যে যে স্থান ছিল মানুষের হাস্য কোলাহলে জীবনময় তা' হয়ে পড়ল তৃণহীন, বৃক্ষহীন অ-মানব প্রান্তর—মৃত্যুর করাল-স্পর্শে, তখনই বুঝতে পারা যায় জাপানী মানুষের আতংকের কারণটা।

হিরোশিমায় জাপানী আত্মা আজ খুঁজে ফিরছে এমন একটা সহায় যা' তাকে দিতে পারে অমোঘ, অশোক মন্ত্র। যে হিজিয়ামা পার্কে একদা সগর্বে দাঁড়িয়েছিল মেইজী-প্রাসাদ আজ সে স্থানে উঠ্‌ছে আর একটা স্মৃতিসৌধ যেখানে রাখা হবে এক অশীতি বর্ষ বৃদ্ধের পূতাস্থি। এ মানুষটী কাটিয়েছিলেন তাঁর দীর্ঘ জীবন কেবল মানুষের কল্যাণার্থে। সে কল্যাণ আজও আসেনি, তবুও শুভবুদ্ধি যাঁদের আছে তাঁরা আপদে বিপদে পড়লে এখনও স্মরণ করেন তাঁর নিবেদিত জীবন প্রচেষ্টা। সে পূতাস্থি একদা স্থান পেয়েছিল এই

ভারতবর্ষের মাটিতে, ছ'হাজার পাঁচশ' বছর আগে। তারপর সে পূতাস্থি গেল শ্যাম-দেশে, সিংহলে এবং ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় বিশ্ব-বৌদ্ধ সম্মেলনে উপস্থিত হোল জাপানে। ঐ হিরোশিমা পার্কে সাত-তালা এক প্যাগোডায় রাখা হচ্ছে সে বুদ্ধাস্থি। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রধান-মন্ত্রী ইষিরো হাতোয়ামার প্রতিনিধি সে প্যাগোডার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনা করলেন, বিশিষ্ট জাপানী লোক নায়ক ও অন্যান্য দেশের রাজদূতদের উপস্থিতিতে। এই স্মৃতি-মন্দিরে স্থান পাবে শিল্পী স্থয়োকাসাগী (Sueokasagi) নির্মিত বোধিসত্ব মূর্তি—হৈয়-বাত্‌স্থ (Heiwa Batsu)।

আনবিক যুগের স্মৃতি ভবিষ্যতে খুঁজেই বের করতে হবে হিরোশিমায়। অন্যান্য জাপানী শহরের মতনই হিরোশিমা আজ দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় ছুটেছে তার অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে। তার অতি আধুনিক সমাজ-গত জীবনে সেই আনবিক যুগ প্রবর্তনের মুহূর্তটি কদাচ ধরা দেয়। আজি হতে শতবর্ষ পরে যদি দ্বিপদ মানুষ বেঁচে থাকে আর হিরোশিমায় তীর্থযাত্রায় যায় তবে এই স্মৃতি-মন্দিরেই পাবে সে মুহূর্তের সঠিক পরিচয়।

কঃ পন্থা ?

টোকিওর বিশ্ববিদ্যালয়টি দেখলে যেন চোখ জুড়োয়। শহরের লক্ষ্যহীন চাঞ্চল্যের মাঝখানে শান্তির ওয়েসিস্ (মরুদ্যান) বিশেষ। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়িগুলো অতি সযত্নে রক্ষিত। ইউনিফরম্ পড়া ছাত্রছাত্রীর স্বতঃস্ফূর্ত নির্মল হাসি কলরবে মুখরিত স্থানটি প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা। আমরা দেখা করলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন (Jurisprudence) বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ অদাকার সঙ্গে। জ্ঞানবৃদ্ধ অধ্যাপক আমাদেরই অপেক্ষায় ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন ওঁর দু'জন শ্রদ্ধেয় সহকর্ম্মী, যাঁদের একজন এর মধ্যেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। অনাড়ম্বর কক্ষের মধ্যে আন্তরিক অভ্যর্থনায় বিদ্বজ্জনোচিত সৌজন্যের ও হৃদ্যতার পরিচয় ফুটে উঠল। আলোচ্য বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও আলোচনার উচ্চ মান বিশেষ করেই স্মরণ করিয়ে দিল যে সরস্বতীর এই পীঠ-স্থানটি টোকিওর অন্তর্গত শুধু ভৌগলিক বিচারে, এর জ্ঞানের দিকচক্র ঘিরে রেখেছে বিশ্বজনকে।

আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হোল জাপানের পুনরস্ত্রীকরণ। সেদিনের আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের আগ্রহাতিশয্যেই পুনরস্ত্রীকরণের প্রশ্নটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ প্রশ্ন অধ্যাপকদের কাছে মোটেই নতুন ছিল না। প্রশ্নটীকে তাঁরা অনেক বিচার বিবেচনা করে দেখেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে বর্তমানে জাপানী সংবিধান অনুযায়ী পুনরস্ত্রীকরণ কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। তাঁরা কিন্তু ভাল ভাবেই জানতেন যে যোশিদা বা হাতোয়ামার পার্টি সংবিধানকে ফাঁকি দিয়ে পুনরস্ত্রীকরণ করতে বদ্ধপরিকর।

জাপানী সংবিধান গণদেবতার ব্যাপক সমর্থন পায়নি। তার প্রধান কারণ এই যে, এর জন্ম হয়েছিল আমেরিকার আগ্রহাতিশয্যে

ম্যাক-আর্থারী যুগে। সেই গোড়া থেকেই এর বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা হয়ে আছে। সংবিধানের অনেকগুলো ধারা—যেমন জাপানী মেয়েদের ভোটাধিকার; জাপানী চাষীর জমিতে অধিকার; জাপানী শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার প্রভৃতি—বামপন্থীদের নিকট বিশেষভাবে গ্রাহ্য হোলেও সংবিধান যে বিদেশীর দান, অতএব *স্বদেশী হতে পারে না এটাই ছিল এর বিরুদ্ধে সর্বপ্রধান অভিযোগ।* দক্ষিণপন্থীরাও সংবিধান অগ্রাহ্য করতে ইচ্ছুক প্রধানতঃ সেই ধারাটীর জন্যে, যে ধারা জাপানের পুনরস্ত্রীকরণের পথে অন্তরায়। আজ জাপানে নানা দিক হতে যুক্তিতর্ক দিয়ে দেখান হচ্ছে যে বর্তমান সংবিধান যুগোপযোগী নয়। নতুন সংবিধান রচনা করা প্রয়োজন। সংবিধানের নতুন খসড়াও প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গুলোর তরফ থেকে। কিন্তু জাপানী ডায়েটে কোনো একটি দল এত অধিক সংখ্যক নয় যে বর্তমান সংবিধানের ধারানুযায়ী দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ-ভোটে বর্তমান ধারা বাতিল করে দিতে পারে। এর ফলে জাপানী রাজনৈতিক দলগুলোকে সংবিধানের যুদ্ধপরিহার ধারাটি (Renunciation of War, Article 9) গ্রাহ্যই বা অগ্রাহ্যই হোক, তা' মেনে চলতে হবে যতদিন পর্যন্ত না কোনো বিশেষ দল প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

সংবিধানের ধারা যতই বেয়াড়া হোক না কেন অধ্যাপকদের ধারণা কিন্তু ঠিক যে যোশিদা-হাতোয়ামা-কিসির লিবারেল-ডিমোক্র্যাটিক দল জাপানকে নিরস্ত্র রাখতে অনিচ্ছুক। পরলোকগত সিগেমেতসু যা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছিলেন পুলিশী বা তদারকী ফোর্স নামে সিগেরু যোশিদা তার নামকরণ করলেন সেলফ ডিফেন্স ফোর্স। এই ফোর্স গড়ে তোলবার জন্যে যোশিদা সরকার এক ডিফেন্স এ্যাকাডেমী স্থাপন করেছিলেন সেই ১৯৫৩ সালেই। স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর অফিসর এবং ক্যাডেটদের সামরিক ট্রেনিং দেওয়া ছিল এই এ্যাকাডেমীর উদ্দেশ্য। চার বছরের

ট্রেনিং এবং ৪০০ অফিসরের এবং দেড় হাজার ক্যাডেটদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হোল। সম্প্রতি এই এ্যাকাডেমী থেকে ৩০০ জন অফিসর ট্রেনিং পেয়ে বেরিয়েছে—এরাই হোল যুদ্ধোত্তর জাপানের নতুন সামরিক অফিসর।

কিসি প্রধানমন্ত্রী হবার পর এ্যাকাডেমীতে সেলফ্ ডিফেন্স ফোর্সের সংখ্যা এবং আয়তন আরও বাড়াবার আয়োজন করেছে জাপানী সরকার। বর্তমানে জাপানের আছে ১৬০,০০০ সৈন্য, ১০২,৩১০ টন জাহাজ আর প্রায় ৫০০ যুদ্ধ-প্লেন। প্রস্তাব করা হয়েছে যে মোটমাট দু'লক্ষ মানুষ নিয়ে ফোর্স গড়ে তুলতে হবে এবং সেই ফোর্সে থাকবে ২০,০০০ নৌসৈন্য, ১৫,০০০ বিমান-সৈন্য আর ১৫০,০০০ স্থল-সৈন্য। আর থাকবে ১২৪,০০০ টনের যুদ্ধ-জাহাজ এবং ১৩০০ প্লেন। ফোর্সের আয়তন বাড়াবার প্রধান কারণ হোল যে, এখন থেকে ক্রমে ক্রমে জাপানে অবস্থিত আমেরিকান ফোর্স আইসেনহাওয়ার-কিসি চুক্তি অনুসারে অপসারিত করা হবে। তাদের শূন্য স্থান পূর্ণ করা হবে ডিফেন্স ফোর্স বাড়িয়ে।

সরকারের যাই ইচ্ছে থাকুক না কেন জাপানী জনসাধারণ এ ফোর্সে যোগদান করতে মোটেই আগ্রহ দেখায়নি। ৮০০০ জনের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হোল কিন্তু দরখাস্ত এল কেবল ৫০০০। এই নিরুৎসাহের পরিচয়ে স্বতঃই মনে হয় যে জাপান আর যুদ্ধের মাতলামিতে মাত্‌তে চায় না।

জনসাধারণ হয়তো কোনোদিনই যুদ্ধহাঙ্গামা চায়না। কিন্তু জাতীয় জীবনে সময় সময় এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয় বা করা হয় যখন কেবল যারা বেকার তারাই নয়, অন্যান্যেরাও এ কাজে স্বেচ্ছায় তৎপর হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক কারণ তো থাকেই তা ছাড়া থাকে জাতীয়তার দাবী। সে দাবীর অনেক ভোল থাকে দেশে দেশে, কিন্তু পরিণাম এর একই—সেই সনাতন লোকক্ষয়।

জাপানের ঐতিহ্য অন্যদেশ থেকে কোনো প্রকারেই অন্যরূপ নয়।

মেইজী যুগের (১৮৬৮ খৃঃ) পূর্বে বাইরের বাজারে জাপানের এক কৃষিজাত দ্রব্য ছাড়া আর কোনো কিছু পাঠানর ছিলনা। এমন কি যে জাপান আজ সুতী বস্ত্র বাইরের বাজারে পাঠায় সর্বাধিক সেই জাপান শতাব্দীর গোড়ায় (১৯০০ খৃঃ) ভারতবর্ষ থেকে কিনত বস্ত্র নিজের প্রয়োজনে। আজকের ব্রহ্মের মত ছিল জাপানের অবস্থা। দেশের লোকের শতকরা ৮০ জন ছিল চাষী। এশিয়ার সর্বাধিক শিল্প-দ্রব্যের উৎপাদক হয়েও জাপান আজ তার সেই চাষীর সংখ্যা পঞ্চাশের কোঠার বেশি নীচে নামাতে পারেনি। বর্তমান জাপানের চাষের জমির (১৮ থেকে ২০ ভাগ জমি কেবল চাষের উপযুক্ত) সঙ্গে চাষীর সংখ্যা তুলনা করলে এত শিল্প-সম্ভারের দেশ সত্বেও অনায়াসেই জাপানকে চাষীর দেশ বলা যেতে পারে!

এ জাপান-ই শতাব্দীর গোড়ায় যখন বাইরে কেবল চাল পাঠাত বৈদেশিক মুদ্রা কিনবার জন্যে তখন তার খাদ্যের স্বাচ্ছল্য মোটেই ছিল না। তবুও সে খাদ্য বাইরে না পাঠিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারেনি। শিল্প তৈরীর যন্ত্রপাতি কেনবার জন্যে এবং যে সব বৈদেশিক এক্সপার্টদের দ্বারা স্বদেশের জনসাধারণকে শিল্প-শিক্ষা দেবার জন্যে জাপানে নিমন্ত্রণ করে এনেছিল তাদের পারিশ্রমিক দেবার অর্থের যোগান দিতে এ অর্থের একান্ত প্রয়োজন সেদিন তার ছিল। সে দিন জাপানের অবস্থা ছিল অনেকটা আজকের ভারতবর্ষের মত। কাঁচামাল বাইরে পাঠিয়ে তার অর্থে দেশে ভারী ও হাল্‌কা শিল্প প্রতিষ্ঠান করা ছিল তার উদ্দেশ।

সেই মেইজী যুগ থেকে কিন্তু জাপানে খাদ্য-সমস্যা বা চাল-সমস্যা হয়ে আছে সব চেয়ে বড় সমস্যা। মূল ভূখণ্ডে অস্ত্রের সাহায্যে যতবারই জাপান ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার পেছনের অর্থনৈতিক কারণটা খুজে পাওয়া যায় এই সমস্যার মধ্যে। এ সমস্যা থেকে জাপান মুক্তি পেয়েছিল কেবল অল্পদিনের জন্যে যখন সে পুরোপুরি ইম্পিরিয়ালিষ্ট হয়ে মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, ফরমোজার ধান চাষের

ব্যাপক পরিকল্পনা ১৯২৯ সালে কার্যকরী করেছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধের পর সাম্রাজ্য, এমনকি স্বদেশের অংশবিশেষও জাপান হারিয়েছে কিন্তু জাপানের সেই পুরনো সমস্যা চোরাবালির মতই সমাজের অভ্যন্তরে বিদ্যমান। বিজ্ঞানের সাহায্যে খাদ্য সমস্যা মেটাতে জাপান অকাতর, কিন্তু আজ পর্যন্ত দৈব-নিরপেক্ষ হয়ে কোন্ দেশ কৃষি সমস্যার পাকাপাকি সমাধান করতে পেরেছে? যখনই অতীতে পল্লী-জাপান গোঙানি শুরু করেছে, সে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ বা ১৯২৮ খৃষ্টাব্দই হোক, জাপান তখনই হয়েছে দিগ্বিদিক জ্ঞানশুন্য। জাপানের অনাগত ভবিষ্যতও নিঃসন্দেহে কৃষক-জীবনের সঙ্গে জড়িত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিপর্যয়ের পরে জাপানী জনসাধারণের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রতি যে বিতৃষ্ণা আজ দেখা দিয়েছে তা অতীতের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে। আজকের জাপানে যেমন একদিকে প্রমাণিত হচ্ছে যুদ্ধে অনাশক্তি অন্যদিকে ম্যাকআর্থারী সংবিধান অগ্রাহ্য করে সম্রাটকে পুনরায় পুরনো দেবতার কোঠায় নিয়ে যাবার আকাংখাও দেখা যায়। সাহিত্যে, ফিল্মে যেসব কাহিনী আজ সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সে সবগুলোই হোল জাপানের অতীত সামরিক গৌরব কাহিনী। যুদ্ধের পর যে জনপ্রিয় কেতাব সারা জাপানে ছড়িয়ে পড়েছিল তাতে জাপানী পরাজয় কাহিনী স্থান পায়নি, পেয়েছে কেমন করে জাপানী ডুবো জাহাজ আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজ ডুবিয়েছে, কেমন করে রাবাউলে জাপানীরা আমেরিকানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে তারই কাহিনী। যে ফিল্ম আজ জাপানে সর্বাপেক্ষা সমাদৃত তা' তোলা হোল মেইজী সম্রাটকে কেন্দ্র করে। হিরোশিমায় সম্রাট কেমন করে তাঁর সৈন্যদলকে উৎসাহ দিচ্ছেন রুশ-যুদ্ধে বিজয়ী হোতে তারই ছবি। স্বদেশী যুগের বাঙলাদেশে শিবাজী, রাণা প্রতাপ, প্রতাপাদিত্য, সিরাজদ্দৌলা প্রভৃতি নাটক রচনা করে যে উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছিল আজকের জাপানে মেইজী সম্রাটকে কেন্দ্র করে পরাজয়ের ও জাতীয় আত্মাবমানন অবসানের সেই ধরণের প্রচেষ্টা

চলেছে। সম্রাটের জন্মদিনে যেমন সংবিধানানুযায়ী তাঁর প্রাপ্য যথোচিত সম্মান দেখায় জাপানী জনসাধারণ তেমনি কেটে পড়ে রাজানুগত্য সেই ক্রমশঃ দলভারী শ্রেণীর, যারা সম্রাটকে পেতে চায় দেবতারূপে।

ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এর পর কথা প্রসঙ্গ শুরু হোল অধ্যাপকদের সঙ্গে। ছাত্রেরা পাশ করে কাজ পাবার কি সুযোগ পাচ্ছে প্রশ্ন করলাম। ডাঃ অদাকা উত্তরে বল্‌লেন যে তাঁর বিভাগ এ প্রশ্নের জবাব ভালভাবেই দিতে পারবে, কারণ শতকরা অন্ততঃ ৬০ জন আইনের ছাত্র বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ জোগাড় করতে পারে। যুদ্ধের পরে পুরনো ধারা বদলাতে আরম্ভ করেছে এবং আজ সব প্রতিষ্ঠানেই আইনজ্ঞ কর্মচারীর প্রয়োজন ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, যেমন চলেছে ভারতবর্ষে নতুন নতুন আইন রচনার সঙ্গে সঙ্গে। অন্যান্য বিভাগের কথা উল্লেখ করে কিন্তু অধ্যাপক বললেন যে যদিও তাঁর সাক্ষাৎ জ্ঞান সে সব ক্ষেত্রে নিতান্ত সীমাবদ্ধ এবং এ সম্বন্ধে তিনি যদিও কোন সংখ্যাতত্ত্বের নজীর দাখিল করতে পারবেন না, তবে এটুকু বেশ বলতে পারেন যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে ছাত্রদের কাজ পাওয়া আজকের দিনে বেশ কষ্টসাধ্য।

টোকিওর ইংরেজী সংবাদপত্র "মাইনিচি"র একটী বিবৃতি থেকে দেখলাম যে বছরে প্রায় আনুমানিক ৮০,০০০ নতুন গ্র্যাজুয়েটকে চাকরী খুঁজে বেড়াতে হয়। সংখ্যার পরিমাণ শুনে অবশ্য মোটেই ভীত হইনি কারণ পশ্চিমবঙ্গের ছবি এর চেয়ে কম ভয়াল নয়।

আমরা ছাত্রদের মধ্যে ভীড়ে গেলাম। ওদের সমবায় প্রতিষ্ঠান দেখলাম। দেখলাম ওদের রান্নাঘর ও চা-পানের ঘর। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের টিফিন রুমে বসে কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে মনে হোল কলকাতা ইউনিভার্সিটি রেস্তোরাঁর কথা; ছাত্রজীবন সবদেশেই যেন এক ছাঁচে গড়া। হালকা হাসি ও কথা কাটাকাটির রোল চারিদিক থেকে ভেসে আসছে।

দু'টি ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হোল। তাদের বক্তব্য সেদিন মনে

যে দাগ কেটেছিল তা বহুদিন মুছবে না। প্রশ্ন করলাম লেখাপড়ার খরচ সাধারণতঃ তাঁরা কি উপায়ে সংগ্রহ করেন? জবাবে ওঁরা বললো মাসে ৬০০০ ইয়েন (প্রায় ৮০ টাকা) গড়পড়তা মাথা পিছু ছাত্রের খরচ পড়ে; বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন ও অন্যান্য সব কিছু নিয়ে। বাবা, মা বা অভিভাবকের অবস্থা স্বচ্ছল হোলে ছাত্রের পক্ষে এ টাকার জোগান দিয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া কষ্টকর হয় না। যদি ছাত্র দরিদ্র অথচ মেধাবী হয় তবে সরকারী সাহায্যও পেতে পারে। পড়া শেষ করতে মোট যা অর্থ প্রয়োজন হতে পারে, তার অর্ধেক টাকা মাসিক কিস্তিতে সরকার থেকে ধার দেবার ব্যবস্থা আছে। পরিণামে কিস্তিতে ছাত্রটিকে সে টাকা শোধ করে দিতে হয়।

অর্ধেক খরচের তো ব্যবস্থা হোল, আর অর্ধেক দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্র কোথায় পাবে?—জিজ্ঞেসা করলাম। ধার করে অথবা ছোটখাট সাময়িক কোনো চাকরী করে—উত্তর করল ছাত্রটি। কি কি ধরণের সাময়িক চাকরী ছাত্রেরা পেতে পারে, আবার জিজ্ঞেসা করলাম। উত্তর এল, ছাত্র পড়ান, প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ ইত্যাদি। কিন্তু সেখানেও ক্রমশঃ ভীড় বাড়ছে ও দর পড়ে যাচ্ছে।

তাহোলে কি উপায়?—আমি প্রশ্ন করলাম। "তাহোলে কি উপায়?"—আমার প্রশ্নটাই সে অন্যমনস্ক ভাবে আউড়ে গেল, কিছু যেন জবাবে বলতেও চাইল, কিন্তু বলতে গিয়ে বলতে পারল না; মুখখানা তার লাল হয়ে উঠল। অমন করে থামতে দেখে বুঝলাম, জবাবটার মধ্যে এমন কিছু আছে যা বলতে বাধছে ও দ্বিধায় তার জিভ আড়ষ্ট হয়ে আসছে। বললাম, যদি নিজের বা তার দেশের গায়ে আঁচড় লাগে উত্তর দিতে, তাহোলে আমার সে কথা শুনবার কোনো প্রয়োজন নেই।

আমার কথায় যেন ছেলেটির চমক ভেঙে গেল এবং আস্তে আস্তে

বল্‌ল একজন ভারতীয়ের কাছে তার কিছুই লুকোবার নেই। তারপর ধাঁ করে বলে ফেলল, খরচ মেটাবার "সব পথ বন্ধ দেখলে আমরা রক্ত দিই—মানে রক্ত বিক্রী করি।" এ ধরণের উত্তর প্রত্যাশা করিনি। আঁতকে উঠেছিলাম, কিন্তু কেন—স্ব-বিচারে পরে বুঝতে পারিনি। এটা কি এতই অপ্রত্যাশিত উত্তর আমাদের কাছে? জাপানের কোনো হাসপাতাল থেকে বিশেষ উপাদান-প্রধান রক্তের প্রয়োজন জানিয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুলে বিশ্ববিত্থালয়ের ছাত্রদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়—কে আগে রক্তটা বিক্রী করে কিছু টাকা রোজগার করবার স্থবিধে করতে পারে। নিয়মিত রক্ত দানের ফলে সবই এই ছাত্রদের ভুগতে হয়, যথা, মাথা ঘোরা, শারীরিক দুর্বলতা ইত্যাদি। কিন্তু তাহোলেও ব্লাড ব্যাঙ্কের রক্তের বড় সরবরাহ্ করে থাকে জাপানের বিশ্ব-বিশ্ববিত্থালয়ের ছাত্রের দল। বলা বাহুল্য সে রক্ত আসে ছাত্রদের দেহ থেকে অতি নিরুপায় অবস্থায়। এদের লেখাপড়ার খরচ চালাবার দ্বিতীয় পন্থা নেই! মনটা দমে গেল।

যুদ্ধোত্তর জাপানকে যে একটা বিরাট বাস্তুহারা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে একথা জাপানের বাইরে খুব অল্প লোকই বোধহয় জানে। যুদ্ধে পরাজয়ের পরে এশিয়ার বিভিন্ন অংশে, যেমন কোরিয়া, চীন, মাঞ্চুরিয়াতে যে সব জাপানী বাস করে আসছিল তা'দের প্রায় সবাইকে স্বদেশে ফিরে আসতে হয়েছে। ১৯৫০ সালে এই ঘরে ফেরা জাপানীর সংখ্যা এসে পৌঁছয় ৬০ লক্ষে। যুদ্ধে লিপ্ত না হোলে সে সংখ্যার অন্ততঃ অর্ধেক যেখানে ছিল সেখানেই থাকতে পারত, কারণ তা'রা চীনা বা কোরিয়ার নাগরিকই হয়ে গিয়েছিল। পরাজয়ের ফলে জাপানকে এদের সবাইকার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। আর স্বদেশে জাপান এই পুনর্বাসনের আশাতীত সাফল্যও অর্জন করতে পেরেছে। বহুদিন জাপানী-ভিটে-ছাড়া মানুষ কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি দেশে বাস্তু সৃষ্টি করে বসেছিলে। তাড়া

খেয়ে আবার যে তা'দের এত সহজে অতীতের পরিত্যক্ত বাস্তুতে ফিরে আসা সম্ভব হবে এবং পুরনো বাসিন্দাদের তা'তে কোনোপ্রকার আপত্তি থাকবে না এটা আমরা ভাবতে পারিনি।

এসব রিফিউজিদের অনেকেই বর্তমান শতাব্দীর গোড়া থেকে জাপানী অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে মূল ভূখণ্ডে কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও চীনে যেতে আরম্ভ করেছিল। যে সব ভারতীয়েরা আজ ফিজি, গায়েনা, আফ্রিকা বা সিংহল ও মালয়ে ছড়িয়ে আছে আজ যদি আবার তা'দের নতুন করে ভারতে বাস করতে হয় তাহোলে যে অবস্থা আসত জাপানীদের অবস্থাও অনেকটা সেইরকম হয়েছিল। অনেকেই পিতা পিতামহের বাস্তুভিটার কথাও ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু যখন তা'রা স্বদেশে ফিরে আসতে বাধ্য হোল তখন, সেই যুদ্ধ পরাজয়ে ভেঙে-পড়া সমাজে, তা'দের গ্রহণ করা নিয়ে বিশেষ আপত্তি শোনা যায়নি। জাপানী চরিত্রের এ একটা নতুন বিকাশ, যার পরিচয় পূর্বে পাওয়া যায়নি। কিসে এই পুনর্বাসন সম্ভবপর হোল? পুনর্বাসন কাজে স্বাজাত্যবোধ নিশ্চয়ই একটা প্রেরণা দিয়েছিল। কিন্তু রক্তমাংসের শরীরে এবং অভাব অনটনের মধ্যে জীবনযাপনে অভ্যস্তের কাছে একমাত্র স্বাজাত্যবোধই যে পুরো কার্যকরী হতে পারে, সে ধারণা গ্রহণ করা চলে না। অভিজ্ঞেরা এ প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন এই বলে যে, এই পুনর্বাসনকে অনেকাংশে সম্ভবপর করেছিল তখনকার অর্থনৈতিক মৌশুমী হাওয়া।

সে হাওয়া কোরিয়ার যুদ্ধে জাপানের ভাঙা-বাজারে এনেছিল হঠাৎ খুশীর প্লাবন। শিল্পব্যবসা দেখতে দেখতে ফেঁপে উঠল। এত ফাঁপল যে গোটা জাপানী জাতের যুদ্ধোত্তর কালের বেকার সমস্যা সেই মরশুমে ডুবিয়ে দিল। কাজ করবার লোক সেদিন বেশি থাকলে জাপানের হয়তো আরও সুবিধা হোত। কোরিয়ার যুদ্ধের মরশুম একদিন শেষ হয়ে এল। আমরা যখন জাপানে তখন পল্লীসমাজে প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে যে সব উদ্বাস্তু ঢুকে গিয়েছিল সে

সব জায়গায় অস্বাচ্ছন্দ্য ফুটে উঠেছে।ঠ পুরনো পরিবার-গোষ্ঠী ব্যবস্থা নবাগতদের চাপে ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের মধ্যে বেকার পোষণের যে অতুলনীয় ক্ষমতা ছিল, আমাদের সমাজেরই মত, তা' ক্ষয় হয়ে আসল। আজকের ভারতবর্ষেরই মত জাপানের পল্লীর মানুষ বেপরোয়া হয়ে সেদিন থেকে ছুটতে শুরু করল শহরের দিকে কাজ যোগাড়ের তাগিদে। শুধু টোকিওতেই শুনলাম বছরে চার লক্ষ করে লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে। এর মধ্যে ৮০,০০০ নবজাত শিশু, আর বাকী হোল ৩, ২০,০০০ গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে আসা ভাগ্যান্বেষী মানুষ। এদের এবং সন্থ পাশ করা ও পুরনো গ্র্যাজুয়েটের কেবল একটি অংশ মাত্র জাপানের শিল্পে নিযুক্ত হতে পারে। অবশ্য এ কি ধরণের বেকার সমস্যা তা বোঝা শক্ত, কারণ এ সংবাদও শুনলাম কেউই এদের মধ্যে না খেয়ে থাকে না।

এই সংকটের মধ্যে পড়ে মানুষ যে সুস্থ মনে নেই তা জাপানের যে কোনো শহরে পা দিলেই বুঝতে পারা যায়। টোকিও বা ওসাকা শহরের কোটী বিজলী বাতির চোখ-ঝলসান আলো, বলরূমের নাচ, ট্যাক্সি গার্ল নাচ, গায়শা নাচ, নাইট ক্লাবের হুল্লোড়, বিদেশী মুসাফিরকে বা দেশী ধনীকে ডুবিয়ে রাখে বা রাখতে পারে। কিন্তু নীচের-তলার মানুষ যাদের ওপর দিয়ে সংকটের ঝাপটা যাচ্ছে তাদের গোঙানির আওয়াজ ঐ হুল্লোড়ে চাপা পড়ে না। যে কোনো একটি "পাঞ্চিকো"-ব্যাগটেল খেলার আড্ডায় গেলেই সে গোঙানি স্পষ্টতর হয়। জাপানের এই জুয়াখেলাটি যুদ্ধোত্তর কালে এসে পড়েছে। আগুনের মত এই খেলা জাপানের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এ খেলার বড় পৃষ্ঠপোষক তারাই যাদের জীবনের নোঙর গেছে ছিড়ে। শুধু টোকিয়োতে শুনলাম ৩,৫৩০টি "পাঞ্চিকো"র আড্ডা আছে এবং মোট ২০৮,১৫০ পাঞ্চিকো খেলার যন্ত্র সে সব আড্ডা-গুলোতে চলে। সরকারী ব্যুরোর হিসেব অনুসারে মাসে আনুমাণিক দু'কোটী জাপানী এই পাঞ্চিকোর আড্ডায় দর্শন দেয়। আবাল-

বৃদ্ধবনিতা সব পাঞ্চিকো-আমোদী, ওদের যে কোনো একজনের সাথে কথা বললেই বোঝা যায় জাপানের সমাজ জীবনের লক্ষ্য-হীনতা।

পররাষ্ট্র দপ্তরের বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফুটপাতে এসে দাঁড়িয়েছি। গাড়ীর অপেক্ষা করছি, এমন সময় চোখে পড়ল টোকিওর আকাশে হেলিকপ্‌টার। এই প্রথম হেলিকপ্‌টার বিমান দেখলাম। বিমানটি অপেক্ষা তার লাল কাপড়ের পুচ্ছটী দৃষ্টি আকর্ষণ করল বেশি। ওটা কি হতে পারে সঙ্গের জাপানী বন্ধুটিকে আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করলাম? উত্তর এল, ওটা পাঞ্চিকোর বিজ্ঞাপন। কোথায় খেলা যায় তাই জানাচ্ছে বিজ্ঞাপনের মারফৎ। বিরাট বিরাট বেলুন উড়িয়ে যেমন ডিপার্ট-মেণ্টাল ষ্টোরের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তেমনি দেওয়া হচ্ছে পাঞ্চিকোর বিজ্ঞাপন। রাত্রে পাঞ্চিকোর আড্ডা যে রূপসজ্জায় আলোকিত হয়, তা দেখবার বিষয়। আর দিবারাত্র উদ্দেশ্যহীন মেয়ে-পুরুষ আড্ডায় আসে এখানে গলায় বেঁধা সময় কাটাবার জন্যে।

জাপানের জনসংখ্যা যে জায়গার অনুপাতে অতিরিক্ত সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকতে পারে না। সবাইকার স্থান সংকুলানের জন্যে তার আরও জায়গা চাই। কিন্তু আজ স্ব-অধ্যুষিত স্থানও ছেড়ে দিতে হয়েছে দক্ষিণে আমেরিকার কাছে ও উত্তরে সোভিয়েটের কাছে। বর্তমানে ন' কোটি জনসংখ্যা এবং বাৎসরিক বৃদ্ধি ১০ লক্ষ। জাপানের ভূখণ্ড এই জনসংখ্যার তুলনায় সংকীর্ণ। একমাত্র উত্তরে হোক্‌কাইডোতে এখনও খানিকটা বিস্তারের সম্ভাবনা আছে তা ছাড়া আর কোথাও নেই। সরকারী ভাবে সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার, নানা দেশে, বিশেষতঃ ব্রেজিলে, গিয়ে জাপানীদের বসবাস করবার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়। কিন্তু সে পরিকল্পনাও খুব সফল হয়নি। কারণ, জাপান অপেক্ষা সে দেশগুলি সামাজিক বিধিব্যবস্থার দিক হতে অনেক নিম্ন স্তরের; ফলে সেখানে গিয়ে জাপানীরা ভাগ্য-অন্বেষণের তাগিদে শহরের দিকে ছুটে যায়। ফলে পুনর্বাসন বিফল তো হয়ই এবং যে

দেশ সে সুযোগ দেয় তার সমস্যা যায় বেড়ে। জাপানের আশেপাশে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে অবশ্য বসবাসের উপযুক্ত অনেক জায়গা আছে, কিন্তু সেখানে জাপানীদের পুনর্বাসন অসম্ভব। কারণ এসব অঞ্চলে জাপানাতঙ্ক রোগ বেশ প্রবল। জাপানীকে আতিথ্য দেবার আগ্রহ সেখানে মোটেই নেই যদিও ইয়োরোপের যে কোনো মানুষ অতি সহজেই সেখানে জায়গা পায়। তবে হাব্সী-সম্রাট সম্প্রতি জাপান পরিভ্রমণান্তে জাপানের এই সমস্যার উল্লেখ করে আবিসিনিয়াতে জাপানী-বসতি খুলবার প্রস্তাব করেছেন এবং জাপানও সে প্রস্তাব সাগ্রহে গ্রহণ করেছে। হয়তো আফ্রিকার এই রাজ্যে জাপানী মানুষের বসতির ব্যবস্থা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা সুষ্ঠুও হবে।

কিন্তু তাতেও যে সমস্যার সমাধান হতে পারে না, তা' জাপান জানে এবং জানে বলেই এই অবস্থায় তার প্রজাসংখ্যা বৃদ্ধির পথ বন্ধ করবার জন্যে যে উপায় অবলম্বন করেছে তা জাপানের পক্ষে যেমন আত্মঘাতী যে কোনো আদম-পুত্রের কাছে তা তেমনি বেদনাদায়ক। এ সম্বন্ধে টোকিয়োতে পৌঁছেই স্থানীয় এক সাংবাদিকের কাছে যে তথ্য শুনেছিলাম তা গোড়ায় বিশ্বাস করতে পারিনি। তিনি বললেন যে জাপানে ভ্রূণহত্যা একরকম আইনসঙ্গত বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। চম্‌কে উঠেছিলাম কথাটা শুনে। ওসাকায় শিল্পপতি তাকাহাতির মুখে শুনেছিলাম ভ্রূণহত্যার পক্ষে সমাজের ও সরকারের নীরব সমর্থনের কথা। তারপর পেলাম সরকারী বিবৃতি। মিলিয়ে দেখলাম যে প্রথমেই সাংবাদিক বন্ধুর মুখে যা শুনেছিলাম তা পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য কথা। ১৯৪৯ সালে ২৪৬,৯০৪টি ক্ষেত্রে ভ্রূণহত্যা করান হয় এবং সরকারকে জানান হয়। ১৯৫৫ সালে সেই সংখ্যা দাড়ায় ১,১৭০,০০০এ এবং বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে যে অনেক ক্ষেত্রে বে-আইনীভাবে ভ্রূণহত্যা করা হয়ে থাকে এবং সে খবর ওয়েলফেয়ার দপ্তরে জানান হয় না। অবশ্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে জ্ঞান সম্প্রসারণের জন্যেও

হচ্ছে শুনলাম। মিনিষ্ট্রী অফ ওয়েলফেয়ার থেকে যে সার্ভে করা হয়েছে ১৯৫৬ সালে তা'তে দেখা যায় যে জাপানে শতকরা ৩৩টি পরিবারে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে—শহরে শতকরা ৩৭ এবং পল্লী অঞ্চলে শতকরা ৩০টি ক্ষেত্রে; এও বলা হয়েছে যে এ নিয়ন্ত্রণ ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে পড়ছে।

জাপানের ছোট বড় সমস্যাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে অতিকায় হয়ে আছে এই ক্রমবর্ধমান প্রজা-সংখ্যা। এর নিরাকরণে যে সার্থকতা সে অর্জন করবে তারই ওপর নির্ভর করবে জাপানের ভবিষ্যৎ। এ প্রসঙ্গ আর না বাড়িয়ে একথা বলে শেষ করতে চাই, যে আজ মানুষের শুভবুদ্ধির কাছে আরও জোর আবেদন প্রয়োজন। এশিয়া ভূখণ্ডে যদি যথেষ্ট জায়গা থাকে তবে জাপানের উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা সেখানে বসবাস করবার সুযোগ কেন পাবে না? গত তিন শতাব্দী ধরে সাদা গোষ্ঠীর চক্রান্তে এশিয়া ও আফ্রিকাবাসীর জীবন ক্রমেই জটিল হয়ে পড়েছে। আজ এ ব্যাপার পরিষ্কার করে নেবার সময় কি আসেনি? বর্ণবৈষম্যের দোহাই দিয়ে জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ পোষণের কি সার্থকতা থাকতে পারে, এই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে? যেখানে জাপানের আশেপাশে স্থানাভাব নেই, সেখানে স্থানাভাবের দোহাই দিয়ে একটা গোটা জাত্‌কে আত্মঘাতী মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দিতে দেওয়া অমানুষিক নৃশংসতা।

ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে জাপান হয়ে পড়েছিল পুরোপুরি ইম্পিরিয়ালিষ্ট অন্য সকলেরই মত। জাপানী কবি নোগুচির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপে এবং বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দক্ষিণ-পূর্ব দেশগুলোয় জাপানের কাণ্ড-কারখানা দেখে অবাক হয়ে পড়েছিল এশিয়ার অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষ।

আজ সকলেই জাপানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংদিগ্ধমনা। নতুন জাপান আবার কোন্ পথে চলতে শুরু করবে—সে প্রশ্ন উঠেছে এশিয়ার দিকে দিকে।

রবীন্দ্রনাথ যখন জাপানে প্রথম পদার্পণ করেন তখন সেখানে বাণিজ্য-দানবের অপরিমেয় মেদ-বৃদ্ধি দেখে ও তার ক্রমবর্ধমান ক্ষুধার তাড়না অনুভব করে আতঙ্কিত হয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ আশাও করেছিলেন যে হয়তো জাপানের শিল্পী স্বভাবের প্রেরণায় এই দানব এক মানব কল্যাণকর শক্তিতেই পরিণত হবে। তা' হয়নি। তাঁর জীবদ্দশাতেই এ আশা নির্মূল হয়েছিল।

আজকের জাপান এশিয়ার সংস্কৃতি থেকে প্রায় বিচ্যুত, এশিয়ার সঙ্গে এক দেনা-পাওনার সম্বন্ধ ছাড়া অন্য সম্পর্ক তার অতি ক্ষীণ। মহা-ভারত বা মহা-চীনের মত বণিক পশ্চিমাদের নির্দয় আক্রমণ থেকে কুর্মযোগের দ্বারা আত্ম-রক্ষা করবার বিশেষ কোনো চেষ্টা অতীতে সে করেনি। তাই সর্বপ্রকার উন্নতি ও সকল প্রকার আধুনিক গুণের আধার হয়েও জাপান আজ অবহেলিত, অপমানিত। জালে পড়া শিকারের মত চারদিক থেকে প্রায় আগত শঙ্কা আশঙ্কা করে সে প্রতীক্ষা করছে দূর দিগন্তে দৃষ্টি রেখে নতুন আশার প্রত্যাশায়। দেখে দুঃখ হয়। গোটা জাতটার যেন আজ দেবার মত কোনো বাণী নেই। দেখে আতঙ্কও হয়।

সত্যি মিথ্যে জানিনে তবে জাপানে শুনেছি যে জেনারেল তোজো তাঁর আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন জাপানের যুদ্ধ পরাজয়ের কারণটা। তোজো জানিয়েছেন যখনই জাপান এশিয়ার সমর্থন হারাল, তখনিই তার পরাজয় ঘটেছিল। এ যেন ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ!

জাপান থেকে ফিরে এলাম এই অনুভূতি নিয়ে যে, যে ভারতবর্ষ একদা জাপানের কাছ থেকে পেয়েছিল প্রেরণা আজ জাপানের এই সঙ্কট ও নিগ্রহের দিনে সেই ভারতবর্ষ জানাক তাকে সমবেদনা।

সংস্কৃতির বনেদ

জাপানী সংস্কৃতি বনেদের পরিচয় পেতে হোলে জাপানী বৌদ্ধধর্মের পরিচয় অপরিহার্য। জাপানের চারুকলা সবগুলোই শৈশবে স্থান পেয়েছিল এইসব বৌদ্ধ মন্দির ও মঠে। মুদ্রা-সমন্বিত বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্ব মূর্তি বা চিত্র-শিল্প, চা-উৎসব, ফুল-সাজানো উৎসব যে কোনোটির গোড়া খুঁজতে গেলে দেখতে পাওয়া যায় যে জাপানী বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে আছে তার যোগ-সূত্র। জাপানী পণ্ডিতেরা এসব যোগ-সূত্রের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন, যদিও তা আমাদের কাছে এখনও অপরিজ্ঞাত।

বৈদেশিক দপ্তরের বন্ধু আমাদের নিয়ে গেলেন ওসাকার এক [illegible]। তাঁর নিজেরও সেখানে যাবার প্রয়োজন ছিল। যখন টোকিওতে তাঁর জনৈক বন্ধু শুনলেন যে তিনি চলেছেন ওসাকায় আমাদের সঙ্গে, তখন তাঁকে একটি পুঁটলি-বান্ধা দক্ষিণা সঁপে দিয়েছিলেন সে মন্দিরের পুরোহিতকে দেবার জন্যে। তাঁর মুখে সে কথা শুনে পুলকিত হয়েছিলাম ভারতবর্ষের ও জাপানের আচার-বিচারের ঐক্য দেখে ও জেনে। আমাদেরই সাম্‌নে যথোপ-যুক্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে সে দক্ষিণা তিনি দান করলেন পুরোহিতকে। মন্দিরস্থিত বোধিসত্ত্ব-প্রতিমা দর্শনের পর আমরা পুরোহিতের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সুযোগ পেলাম। তিনি জানালেন ম্যাক-আর্থারী যুগের পর এ সব মঠ ও মন্দির প্রতিষ্ঠানগুলো নির্জিব হয়ে পড়েছে, যজমানেরা পূর্বের মত পুরোহিতের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্পন্ন নেই, কেবল পরিবারের বিবাহ বা শ্রাদ্ধ-বাসরে তাঁদের স্মরণ করা হয়।

বৃদ্ধ পুরোহিত সংসারী ও তিনটি পুত্রের পিতা। হিন্দু পুরোহিত সংসারী, বৌদ্ধ পুরোহিতও যে সংসারী হতে পারেন এ ব্যবস্থা সিংহল

প্রভৃতি অন্যান্য বৌদ্ধধর্মাবলম্বী দেশে নেই। কিন্তু জাপানে এ প্রথা গত চারশ' বছর ধরে বিদ্যমান। কিয়োটার নিশি হোঙ্গানজী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা নিজে চালু করেছিলেন সে প্রথা। ক্রমে সে প্রথা ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। এ প্রথা অনেককেই অবাক করে দেয়। কোরিয়ার সিংম্যান রী, নিজে ক্যাথলিক খৃষ্টান, তিনিও কোরিয়ায় এ প্রথা চালু দেখে অবাক হয়ে মতামত দিয়েছিলেন এই বলে যে কোরিয়া জাপান অধিকৃত হয়ে পড়াতেই এ প্রথা সেখানে এসে পড়েছে। বৃদ্ধ পুরোহিত মন্দির সংলগ্ন গৃহেই বাস করেন এবং তাঁর দৈনিক কাজই হোল মন্দির ও মঠ তদারগ ও যজমানদের কল্যাণ কামনা করা। পুরোহিতের সংসারী জীবন-ধারাটি আমাকে মনে করিয়ে দিল ভারতবর্ষের কুল-পুরোহিত বা কুল-গুরু প্রথাকে।

সংসারী বৌদ্ধ-পুরোহিতের মত জাপানে খাঁটি বৌদ্ধ-ভিক্ষু শ্রমণ ও আছেন এবং তাঁদের জীবন-যাত্রা খাঁটি হিন্দু সন্ন্যাসীদেরই মত ঋজু ও দার্ঢ্য এবং তাঁদের প্রভাব সমাজের ওপর পুরোহিতদের অপেক্ষা এখনও অনেক ব্যাপক।

ওসাকার যে রাস্তার ওপর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত সে রাস্তায় আরও অনেকগুলো বৌদ্ধ-মন্দির অবস্থিত আছে। রাস্তাটির নামকরণ হয়েছে মন্দির-বর্ত্ম (Temple Street)। প্রায় এক ডজন মন্দির ও মঠ রাস্তার দুধারে আছে। প্রতিটি মন্দিরে পুরোহিত আছেন এবং তাঁদের নির্দিষ্ট যজমান ছড়িয়ে পড়ে আছে সারা জাপানে। যজমানদের মধ্যে যাঁরা ভক্তিপরায়ণ তাঁরা যেখানেই থাকুন না কেন পুরোহিতের সঙ্গে সংযোগ রেখে থাকেন, যেমন রাখেন ভারতবর্ষের যজমানেরা।

শিন্টো কথাটি হোল চৈনিক কিন্তু এ মতবাদ জাপানের মাটিতেই জন্মেছিল। পিতৃ-পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হওয়া ছিল সে মতবাদের অন্যতম মূলভিত্তি। এদিক দিয়ে সে মতবাদও ভারতবর্ষের

পিতৃ-পুরুষদের পিণ্ড-দান প্রথা থেকে বিশেষ বিভিন্ন বলে মনে হয় না। কিন্তু মেইজী যুগে অন্যান্য বড় বড় সংস্কারের সঙ্গে শিন্টো মতবাদেরও ভোল পাল্টে দেওয়া হোল এবং গোটা জাতের পূজ্য করে বসানো হোল সম্রাট বংশের আদি পিতাকে।

আজ শিন্টো ও বৌদ্ধ মতবাদ জাপানে একাঙ্গীভূত হয়ে পড়েছে। নিক্কো, মিয়াজিমা, কিয়োটো ও কামাকুরায় গিয়ে দেখলাম হু'টো মতবাদ কেমন করে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে আছে। এ সব ধামগুলোই হোল তীর্থস্থান, হয়তো কোনোখানে শিন্টো কোনোখানে বা বৌদ্ধ মতবাদ প্রাধান্য পেয়ে আছে, কিন্তু কোনো স্থানেই এক অপরের প্রতিবন্ধক তো নয়ই বরং পরিপূরক হয়ে আছে। নিক্কো হোল জাপানের এক নম্বর দর্শনীয় স্থান। শিন্টো মতবাদে অধ্যুষিত ধাম। সুরম্য ও দীর্ঘ সুউচ্চ দেবদারু বৃক্ষ শোভিত বনানীর মধ্যে প্রবেশ করলে মনে হয় যেন কোনো ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হয়েছি। তোরণ পার হয়ে ও প্যাগোডা দর্শন করে নিক্কোতে আমরা প্রথমেই ঢুকে পড়লাম প্রধান মন্দিরের পার্শ্বস্থিত বৌদ্ধ-মন্দিরে।

ভারতবর্ষের দেব-মন্দিরের মতনই গর্ভ-গৃহ অন্ধকারময়। বিজলী বাতির যে ব্যবস্থা আছে তা' কেবল তীর্থ যাত্রীর পথই প্রদর্শন করে, দেব দর্শনের জন্যে নয়। মন্দিরের মধ্যস্থলে উপস্থিত হোলে, সাথী-পাণ্ডা হাত-তালি দিলেন। সে ধ্বনি ফিরে নিয়ে এল প্রতিধ্বনি। পাণ্ডা বল্লেন তাঁর দেব-দর্শন হয়েছে সার্থক। তাঁর অনুবর্তি হয়ে আমরাও হাততালি দিলাম—কেউ একবার কেউবা একাধিকবার। প্রতিধ্বনি কিন্তু একজনের বেলায় ফিরে এল না। আমরা হাসছি, পাণ্ডা কিন্তু সন্ত্রস্থ। তাড়াতাড়ি এসে সঠিক স্থানে দাঁড় করিয়ে পুনরায় হাততালি দিলেই প্রতিধ্বনি ফিরে এল। ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দিল হায়দরাবাদের গোলকোণ্ডা হুর্গের বা তাজমহলের অভ্যন্তরে মৌলভীর কোরাণ-মন্ত্র-আবৃত্তির মতনই।

বৌদ্ধ-মন্দির দেখে আমরা শিণ্টো-মন্দিরে প্রবেশ করলাম। বিরাটত্বের দিক দিয়ে সে মন্দির দক্ষিণ-ভারতের বড় বড় মন্দিরগুলোর সঙ্গে হয়তো তুলনীয় নয়, কিন্তু কি সুবিন্যস্ত ও সজ্জিত করে রেখেছে মন্দিরটাকে জাপানী শিল্পী! প্রবেশ দ্বারটা রঙে ও অলংকারে মনোমুগ্ধকর, প্রতিটি পদে পদে দেখতে পেলাম চিত্র ও ভাস্কর্যের পরিচয়। নাট-মন্দির, নাচঘর, অধিবেশনের ঘর প্রভৃতি দেখে আমরা উপস্থিত হোলাম গর্ভ গৃহে অন্যান্য তীর্থ যাত্রীদের সঙ্গে। বেশ বড় হল-ঘর তার একপ্রান্তে বসে আছেন শিণ্টো পুরোহিতেরা। আর তাঁদের সামনে রেখে নতজানু হয়ে আশীবার্দপ্রার্থী হয়ে অবস্থান করছে স্ত্রী-পুরুষ বালকেরা। কে বলে ম্যাক-আর্থারী দাপটে শিণ্টো-ধর্ম ধ্বংসোম্মুখ? পুরোহিতেরা যজমানদের নিকট থেকে নিচ্ছেন দক্ষিণা ও দান করছেন আশীবার্দ। শিণ্টো ধর্মের প্রকৃত রূপ কি তা' নিয়ে তখন মনে মনে বিচার করিনি, কেবল লক্ষণীয় বিষয়-বস্তু হোল ভারতীয় ও জাপানী মন্দিরের বিধি-ব্যবস্থার ঐক্য। দেখলাম হুবহু মিল রয়েছে সেখানে।

ক্যাথলিক খৃষ্ঠ-ধর্ম জাপানে এসে পৌঁছল পশ্চিমাদের আনা-গোনার সঙ্গে সঙ্গে। মেইজী যুগে জাপান যখন পশ্চিমের দিকে ঝুঁকে পড়ল তখন সে ধর্মও পেয়েছিল বেড়ে উঠবার একটা সুযোগ। কিন্তু যে স্বাভাবিক নিয়মে শিণ্টো ও বৌদ্ধধর্ম একাঙ্গী হয়ে পড়েছিল, ক্যাথলিক খৃষ্টধর্ম সে ঔদার্য দেখাতে পারল না বলেই আজ ক্যাথলিকদের প্রচেষ্টা ব্যাহত। যুদ্ধে পরাজিত হোলে দখলকারীরা চেয়েছিল জাপানে আবার ক্যাথলিক ধর্মের ব্যাপক প্রচার। চেষ্টাও হয়েছিল আন্তরিকতার সহিত। কিন্তু সার্থক হোল না ক্যাথলিক ধর্মের মূলগত দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্যে। বৌদ্ধধর্ম বাইরে থেকে গিয়েছিল বটে কিন্তু জাপানে পত্তন হবার সঙ্গে সঙ্গে সে শিকড় গেড়ে বসল জাপানের মাটিতেই। কেবল মাঝে মাঝে জাপানের বৌদ্ধ-পণ্ডিতের দল যেত চীনদেশে সে ধর্মের

গূঢ়তত্ত্বানুসন্ধানে। এই পণ্ডিতদেরই মধ্যে অনেকটা নিয়ন্ত্রিত থাকত ভারতবর্ষের সঙ্গে পরিচয়ের কথা। জাপানের বৌদ্ধমন্দির গায়ে যে সব সংস্কৃতজ্ঞ ভাষায় ও বাঙলা লিপিতে বৌদ্ধ-সূত্র লিখিত দেখেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ তা'ও জ্ঞাত ছিল কেবল এইসব জাপানী পণ্ডিতদের মধ্যে। জাপানী জন-সাধারণের কাছে সে ধর্ম হয়ে পড়েছিল একান্তভাবে জাপানী। স্বাজাত্যাভিমানী জাপানের কাছে মেইজী যুগের পর বৌদ্ধধর্মের স্থানই হোত না, যদি দেখা যেত সে ধর্মের আসল শিকড় ক্যাথলিক ধর্মের মত বিদেশে পড়ে আছে। ক্যাথলিক ধর্মের বিধি ব্যবস্থা আজও যে জাপান হজম করতে পারেনি তার একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত মিল্‌ল প্রধান মন্ত্রী হাতোয়ামার কাছ থেকে। ভদ্রলোক নিজে ক্যাথলিক খৃষ্টান কিন্তু প্রধান মন্ত্রী হয়েই ছুটলেন টোকিওর মেইজী-মন্দিরে পরলোকগত সম্রাটের স্মৃতির প্রতি শিণ্টো মতে ভক্তি-শ্রদ্ধা জানাতে। তাঁর এই অ-খৃষ্টানী কাজের জন্যে প্রতিবাদ উঠল ক্যাথলিক মহল থেকে। এ যেন মাইকেল মধুসূদনের রামায়ণের প্রতি শ্রদ্ধা দেখান চেষ্টার অনরূপ। খৃষ্টানই না হয়েছি তা বলে রামায়ণকে আদর করব না কেন ভারতীয় হয়ে?—তিনি নাকি বলেছিলেন; ক্যাথলিকই না হয়েছি তা বলে জাপানের সবচেয়ে শেরা সম্রাট ও জন-নায়ক মেইজীকে সম্মান কেন দেখাব না জাপানী হয়ে?—হোল হাতোয়ামার যুক্তি।

আধ্যাত্মিক তত্ত্বের যোগান দেওয়া ছাড়াও বৌদ্ধধর্ম জাপানে জনপ্রিয় হয়ে পড়েছিল অনেকগুলো লোকরঞ্জন সামাজিক ব্যবস্থা চালু করবার জন্যে। এর একটি প্রধান দান হোল চা-পান উৎসব। রবীন্দ্রনাথের শিল্পী-দৃষ্টি মুগ্ধ হয়েছিল এ উৎসব দেখে। আমরাও দেখলাম এ উৎসবের নিয়মগুলো সেই বনেদী কিয়োটো শহরে এবং সেই গৃহে যেখানে আদিতে এ উৎসবের সামাজিক রূপ দেওয়া হয়েছিল বলে জাপানী সমাজে প্রবাদ আছে। অত্যন্ত অনাড়ম্বরের

মাঝে সে সহজ ও সরল উৎসবটি এখনও এখানে প্রতিপালিত হয়ে থাকে, যদিও ক্রিয়া ও প্রক্রিয়াগুলো সুনিয়ন্ত্রিত আচারে পর্যবসিত হয়ে পড়েছে আজ এবং সেজন্যে বিংশ শতাব্দীর যাযাবরী ও অধীর মানুষের কাছে হয়তো এর আদিম কারণগুলো সহজবোধ্য নাও হতে পারে। কিন্তু যখন মানুষের হাতে ছিল প্রচুর অবসর, যখন মানুষ পারত তার খেয়াল-খুশী অনুযায়ী সে সময় কাটাতে তখন হয়তো এ চা-উৎসব হয়ে পড়ত বেশ লোকরঞ্জন সামাজিক ব্যাপারই। যেমন দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তেমনি এখনও দেখতে পাওয়া যায় এ চা-পান উৎসব জাপানী পুরুষ ও নারীর কাছে কত আদরের ভব্যতা। উৎসবটি আদিতে ছিল একান্তভাবে একক করণীয় সামাজিক ব্যাপার। আজ একে ব্যাপক সামাজিক উৎসবে রূপায়ণ করবার চেষ্টা চলেছে জাপানে। জানিনা সে চেষ্টা সার্থক হবে কি না এবং হোলেও আদি চা-উৎসবের অন্তর্নিহিত ভাবধারাটি অক্ষুণ্ণ থাকবে কি না।

চা-উৎসবের ঘরটি দেখলাম অপ্রশস্ত সাড়ে চার খানা পার্টির মাপে, ন' বর্গফিট পরিধি তার। ঠাণ্ডার দেশ, তিনদিকেই কাঠের দেয়াল, একদিকে কাচের জানালা। জানালা দিয়ে চোখ বাড়ালে বাড়ির সংলগ্ন বাগানটুকু দৃষ্টিগোচর হয়। সে ক্ষুদ্র বাগানটিও জাপানী ধরণে বানান, অর্থাৎ সে বাগানে কোনো বৃক্ষ গুল্ম, লতা শুকিয়ে গেলে সেখানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় ঠিক অনুরূপ বৃক্ষ, গুল্ম ও লতা গাছটি। উদ্দেশ্য হোল বাগানটি হবে ঠিক প্রকৃতিদত্ত দান, মানুষের কারিগিরী সেখানে কোনো স্থান পাবে না। গৃহকর্ত্রী অতি সুপরিমিত পদক্ষেপে আসবেন সে ঘরে, চা-বাগানের সব সরঞ্জাম থাকবে উনুনের পার্শ্বে।

অতিথিরা ঢুকবেন সে ঘরে মাথা হেঁট করে ঐ জানালার ফাঁক দিয়ে। সেই আদি সামুরাই নিয়মে সে ঘরে ঢুকবার চেষ্টা করলাম আমরা তিনজনেই। একমাত্র সক্ষম হোলেন বন্ধুবর ওয়াগ্‌লে। মাথা হেঁট করে চা-ঘরে ঢুকবার প্রথাটি মনে হোল বেশ ডিমোক্র্যাটিক

ব্যবস্থা। ঘরে ঢুকে মাথার ওপরে দেখলাম মাচান, যার ওপরে রাখতে হবে পোষাক পরিচ্ছদ ও অস্ত্র শস্ত্র। চা-পানের ঘরে দেখা যাবেনা কোনো উচ্চ-নীচ ব্যবস্থা, গায়শা-শ্রেণী গড়ে তোলবার মতনই জাপানের সামুরাইদের ও জাইবাত্‌সুদের সমর্থনে এ চা-উৎসব সামাজিক রূপ পেয়েছিল। যুদ্ধাবসানে যখন সামুরাইরা ফিরে আসত ঘরে, তখন বিবাদ বিসম্বাদ ভুলে সময় কাটাবার জন্যেই গড়ে উঠেছিল এই চা-এর আসর। সেখানেও, সেই অতি নিভৃত আসরে, যদি বাইরের অনৈক্য এসে পড়ে তবে তো আর আড্ডা দেওয়া যায়না, এই ছিল সামাজিক মতলব।

আসন গ্রহণ করলাম মোঙ্গলীয় ধরণে হাটু ভেঙে। একে একে অতিথিদের পরিবেশন করলেন চায়ের বাটি অতি ধীরে সুস্থে গৃহকর্ত্রী। সকলের দৃষ্টি পড়ে আছে যেমন পরিবেশন ক্রিয়াটির ওপর, তেমনি চায়ের স্বাদ, চীনে মাটির বাটির নির্মাণ-শিল্পের ওপর। চা হাতে নিয়ে চুমুক দেবার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হোল খোস গল্প আর সামনে দৃষ্টি পড়ে থাকল বাগানটির গাছপালার দিকে।

সৃষ্টি হোল নতুন নতুন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী। হয়তো পাশাপাশি বসে আছেন নিরস্ত্র দুই শত্রু। যতক্ষণ তাঁরা আছেন বা থাকবেন সে ঘরে ততক্ষণ সেখানে আসবে না কোনো বেয়াড়া আলোচনা যা চা-পান উৎসবকে ম্লান করতে পারে এতটুকু। হয়তো সেই সামুরাইদের আমলে এ চা-উৎসবের মধ্য দিয়ে জাপানের উচ্চ শ্রেণীরা আনতে পেরেছিল তাঁদের জীবনভোর বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যে সাময়িক ছেদ। চা-পান উৎসব সামাজিক উৎসবে রূপায়িত হয়ে পড়ল গোটা জাপানে, যেমন হয়েছিল গায়শা বা ফুল সাজানো-উৎসব।

জাপানী মতে এ চা-উৎসবটি হোল আদি বৌদ্ধ শ্রমণদের দান। সদা বিবদমান সামাজিক বিশৃঙ্খলায় যখন তাঁদের অন্তরাত্মা তেঁতে উঠত তখন তাঁরা পালাতেন আরণ্যক আশ্রমে। এবং

সেখানে নির্জনে গরম চা-এর সঙ্গে চালাতেন তত্ত্বানুসন্ধান। সামনে বিস্তৃত থাকত প্রকৃতি তার সমস্ত পসরা নিয়ে। দেশ শান্ত হলে মানুষের সমাজে ফিরে আসলেও তাঁরা চেষ্টা করতেন সেই আরণ্যক পরিবেশ সৃষ্টি করতে। জাপানী শ্রমণেরা কি মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধান করতে পেরেছেন জানিনা, তবে অরণ্যবাস হেতু তাঁদের চোখে পড়েছিল প্রকৃতির রূপ এবং সে রূপ তাঁরা যথাসাধ্য রূপায়িত করতে সক্ষমও হয়েছিলেন মানুষের কুটিরের আশপাশে।

কিয়োটোর যে খড়ের অনাড়ম্বর কুটিরে আমরা চা-উৎসব দেখলাম সেখানে শুনলাম এ উৎসবের আদি ইতিহাস। যে ঘরে এ উৎসব হয় তার নাম হোল সো-আন (so-an) মানে, পর্ণ কুটির, উৎসবের নাম সোইন কাজারী (Shoin Kagari) অর্থাৎ চায়ের মরশুমের মেলা। যিনি প্রথমে উৎসবটি পালন করতে শুরু করেন তার নাম ছিল মুরাতা-জুকো। নারা-তীর্থ-ধামের সোমোজী মন্দিরের তিনি ছিলেন পুরোহিত-শিষ্য। বেচারীর পার্থিব বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ ও অপার্থিব বিষয়ে অনিচ্ছা থাকাতে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত সেই ষোড়শ শতাব্দীতে তাঁকে সংসারে ফিরে যেতে উপদেশ দেন এবং উপহার স্বরূপ দান করেন একখানি স্ক্রোল-পেন্টিং। জুকো গুরুর উপদেশ ও উপহার শিরোধার্য করে কিয়োটোতে ফিরে এসে চালু করলেন অতি সাদাসিদে খড়ের ঘরে এই উৎসব এবং সে ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখলেন গুরুদত্ত পেন্টিং খানা। আদিতে ঘরটীর বেড় ছিল পূর্বেই বলেছি সাড়ে-চার খানা পাটির মাপে। উৎসবটি জনপ্রিয় হোলো জুকো স্টাইলের চা-উৎসব নামে। জনপ্রিয় হবার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠল সে উৎসবের বিধিব্যবস্থা। জুকো জানালেন বুদ্ধ-ধ্যান এ চা-উৎসবের মাধ্যমেও সম্ভব। পরে জুকোর ষ্টাইল অন্যান্যেরা গ্রহণ করতে লাগল ঘরের পরিসর অদল বদল করে। সাড়ে-চার খানা পাটির মাপ কমে কমে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘরের পরিধি এমন কি দু'পাটি পরিধিতে এসে পড়ল। কিন্তু

চায়ের সরঞ্জাম বা সেই একখানি স্ক্রোল-পেন্টিং ছাড়া এ চা-ঘরে এখনও অন্য কোনো কিছু আসবাবই স্থান পায় না।

জাপানী মানুষের এই আরণ্যক দৃষ্টিভঙ্গী লাভের প্রচেষ্টা একটা জাতিগত নেশা। এর কতটা চীন বা ভারতবর্ষ থেকে ধার করা ঐতিহ্য তা বড় প্রশ্ন নয়, বড় প্রশ্ন হোল যে ম্যাকআর্থারী যুগের পরেও এ নেশা একান্তভাবে জাপানী শিল্প-কলা হিসেবে জাপানী সমাজে কি করে স্থান পেয়ে আছে?

এর মূল উদ্দেশ্য কিন্তু থাকল ধ্যান, বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা-করণ। জাপানী চা-উৎসবকে একান্তে সমগোত্রীয়ের আড্ডা দেবার উপায় বলে বর্ণনা করলে হয়তো ভুলই করা হবে। এর পেছনে ছিল ও আছে জাপানী জাতটির প্রকৃতি-সঙ্গ লাভের উপায়।

ফুল-সাজানো উৎসবও এমনি করে গড়ে উঠেছিল। এর জাপানী নাম হোল ইকেবেনা (Ikebena)। বৌদ্ধ ধর্মের জাপানী অশোক, রাজকুমার সোটোকু (Shotoku), বুদ্ধ প্রতিমা ফুলে সাজাতে চালু করেছিলেন এই ফুল-উৎসবটি। এই কিয়োটো শহরেই চোবোজী (Choboji) মন্দির স্থাপিত করেছিলেন তিনি। মন্দিরের পেছনে ছিল তাঁর আশ্রম। ফুল ও ফুল-গাছ দিয়ে তিনি সাজালেন আশ্রমটি। শুরু হোল ফুল সাজানো উৎসব যাকে আমরা ইংরাজীতে বলে থাকি—art of flowers বা floral arrangement.

এ ক্ষেত্রেও ক্রমে ক্রমে স্টাইল বদলে চলল। মন্দিরের এক পুরোহিত, নাম ছিল তাঁর রক্কাই-ডু, তিনি চালু করলেন রিক্কা স্টাইল। এ স্টাইলে ফুল গাছটির থাকবে সাত অথবা ন'টি ডগা। সে ডগা-গুলোর থাকবে সুপরিমিত দৈর্ঘ, উচ্চতা ও বিস্তৃতি যাতে সবগুলো মিলে মানুষের কল্পনার উদ্রেক করতে পারে। জাপানী চোখে ফুল গাছ-সাজানো উৎসবটি হোল বিশ্ব-কল্পনা। গাছের ডাল-গুলো হোল পাহাড়, উপত্যকা, নদী এবং আকাশের প্রতিভূ এবং সবগুলোর

মাঝে ছড়িয়ে পড়ে আছে একের সঙ্গে অপরের প্রাকৃতিক সম্বন্ধটির রূপ।

কালক্রমে রিক্কা-স্টাইলেরও হোল অদল বদল। সাত অথবা ন-ডগার গাছ কাকুবনা (kakubana) স্টাইলে হোল এক-ডগার গাছ। মেইজী সংস্কার যুগের পর ও পশ্চিমী প্রভাব এসে পড়াতে সে স্টাইল নিল আর একটি রূপ এবং তার নামকরণ হোল গেণ্ডাইকা (Gendaika)। এ স্টাইল অদল বদল করে দিল পাত্রাধারটির রূপ। কোনোটির মুখ প্রশস্ত আবার কোনোটি বা হোল অপেক্ষাকৃত উঁচু।

বর্তমানে কিয়োটোর এই ফুল-গাছ সাজানো বিদ্যাটি হয়েছে অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং যেমন জাপানী তেমনি বিদেশীরা এসে থাকে কিয়োটো শহরে সে কলা-বিদ্যা আয়ত্ত করতে।

এ সব কলা-বিদ্যার ক্ষেত্রই পরে হয়েছিল যেমন বৌদ্ধ তেমনি শিণ্টো মন্দিরগুলো। মেইজী সংস্কার যুগ পর্যন্ত আত্মিক বা তাত্ত্বিক সব বিষয়েই ছুটো মতবাদ একাঙ্গীভূত হয়েছিল। সে নিবিড় আত্মীয়তা এমন রূপ ধরল যে শিণ্টো দেব-দেবীরা হোলেন জাপানের মহাযান বৌদ্ধ-ধর্মের অবতার বিশেষ। এ মিশ্রণ নিয়ে এল নতুন ভাবধারা এবং তার নামকরণ হোল হোনজি-সুজাকু (Honji-sujaku) যা বল্‌তে শুরু করল যে বৌদ্ধ-শিণ্টো মতবাদ একই।

মেইজী সংস্কার কালে ছু'টো ধর্মকে পৃথক করে দেওয়া হোল। প্রতিটি মন্দির ও মঠ প্রতিষ্ঠানকে বেছে নিতে হোল একটা ধর্মমতকে। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু এ পৃথক-করণ চেষ্টা সহজ-সাধ্য হয়নি এবং এর রেশ যে এখনও অপূর্ণ তা' আমরা দেখতে পেলাম সুবিখ্যাত নিক্কো তীর্থে। তীর্থটী এই পৃথক-করণে গিয়ে পড়ল শিণ্টো-মতবাদীদের হাতে, যদিও পাশে পড়ে থাকল বৌদ্ধ মন্দিরটি। শিণ্টো পুরোহিতদের জিম্মায় এসে পড়ল তীর্থটীর পাঁচতলা বৌদ্ধ-প্যাগোডা আর তার সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ এবং আরও দর্শনীয় বৌদ্ধবস্তু। বৌদ্ধ মন্দিরের পুরোহিতেরা দাবী করে আসছেন

সে সব দ্রব্যগুলো নিজেদের অধিকারে রাখতে। শিন্টো মন্দিরের পুরোহিতেরা সে দাবী মানতে রাজী নন। অবশেষে এ দাবীর মীমাংসার ভার গিয়ে পৌঁছল বিচারালয়ে। শিন্টো পুরোহিতেরা স্বীকার করলেন যে ও সব দর্শনীয় বস্তুগুলো হোল বৌদ্ধদের তবে ১৮৭১ সালে যখন মন্দির মঠ পৃথক করে দেওয়া হোল সেদিন থেকেই ওগুলো সংস্কৃত করে রাখতে তাদের অর্থব্যয় করতে হয়েছে প্রচুর। বৌদ্ধ-পুরোহিতেরা উত্তর দিলেন যে, যে অর্থব্যয় করেছে শিন্টো-পুরোহিতেরা তার অনেকগুণ বেশি অর্থপ্রাপ্তি তাদের হয়েছে তীর্থ যাত্রীদের দক্ষিণা হতে। এ বাদ প্রতিবাদের বিষয় শুনে মনে হোল এ পরিস্থিতি যেন অনেকটা—সবটা নয়—হিন্দু যাত্রীদের বারাণসীধামের বেনীমাধবের ধ্বজা-মন্দিরটি দর্শনের মত। আদিতে সে মন্দির ছিল হিন্দুদের, ভেঙে তাকে করা হোল মসজিদ। আর আশু অর্থ-প্রাপ্তির লোভে সে মন্দির-মসজিদের দরজা খুলে রাখা হোল হিন্দুদের জন্যে। জাপানে জাপানী জাতের যতটা গড়তে দেখা যায় ততটা ভাঙতে দেখা যায় না। সেই জাতিধর্মানুসারে শিন্টোদের অধিকারে তীর্থটী আসলেও বৌদ্ধ-নিদর্শনগুলো নিশ্চিহ্ন না করে সেগুলো আরও সংস্কৃত ও অলংকৃত করে রেখেছে তারা ভবিষ্যৎ বংশীয়দের দেখবার ও বুঝবার জন্যেই।

জাপানী বাগানও মোগল বা ইয়োরোপীয় বাগান নয়। গাছ, গুল্ম ও ঘাস মানুষের খেয়াল-খুশী অনুসারে সে বাগানে গজায় না বা মরে না। সে বাগান বাগানই, আপনা থেকে বেড়ে চলে; যদি কোনো গাছ স্বাভাবিক কারণেই শুকিয়ে যায় তবে আপ্রাণ চেষ্টা হয় সে মৃতের স্থানে অবিকল তদনুরূপ বৃক্ষরোপণ করা, যাতে পূর্বেকার দৃশ্যে না পড়তে পারে কোনো ছেদ। মানুষ এখানে কেবল দর্শক, যেমনি ভাবে সে দর্শক হয় নিছক অরণ্যে।

কেবল গাছ-পালা নিয়ে নয়, ভৌগলিক অবস্থান, আশপাশে পড়ে-থাকা পাথরখণ্ডগুলো এবং নালা-নদী জাপানী বাগানে স্থান

পাবে অতি স্বাভাবিক ভাবে। সমগ্র জাপানে এমন খারা খাঁটি জাপানী বাগান আছে অনেকগুলো। এদের সৃজন বৈচিত্র্যও বিচিত্র। এর প্রতিটিতে আছে কোনো বিশেষ গঠন শিল্পের দৃষ্টিভঙ্গী। হয়তো গোটা বাগানই হোল বালির-মাট, তাতে রেখে দেওয়া হয়েছে বিশেষ আকৃতির তিন চারখানা পাথর-খণ্ড এবং সেই পাথর-খণ্ডগুলো দিয়ে বিচার করতে হবে সে বাগানের শিল্প বৈশিষ্ট্য।

কিয়োটো শহরে আছে জাপানী-বাগানের সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনা। তার নাম হোলো কাটস্যুরা বাগান (Katsura Garden)। এর সুনাম কেবল জাপানে নয়, সমগ্র বাগান-শিল্প জগতে বিদিত। আমরা দেখতে গেলাম সে বাগান। এখন পর্যন্ত এ বাগান রয়েছে সম্রাটের পরিবারের তত্ত্বানুবধানে। সত্যি কথা বলতে গেলে কাটস্যুরা-বাগের প্রথম দর্শন চোখের পর্দায় আনেনি কোনোই বৈচিত্র্য। অতি সাদা-সিদে বাঁশের ও খড়ের দেয়ালে ঘেরা বাগানটির মধ্যে ঢুকেও পাইনি এর বৈশিষ্ট্যের সন্ধান। চারদিক্‌কার গাছ-পালা, খাল, খাল পার হবার সেতু, সেতুর পাশে খড়ের কুটির, জলের ধারে পড়ে থাকা শেওলা-পড়া পাথর-খণ্ড—এ সবই দেখে মনে হোল যে আমরা যেন এসে পড়েছি কোনো ছেড়ে-যাওয়া এবং অতি সাদাসিধে ধরণের বাগানবাড়িতে। তাজমহলের বা দিল্লীর সাজানো গুছানো বাগান দেখতে যে চোখ অভ্যস্ত সে চোখে এ বাগানের দৃশ্যে আনে না কোনোই মোহ। বাগানে বেড়াতে বেড়াতে মোরেস্‌কে জিজ্ঞেসা করলাম, "কেমন দেখছেন জাপানের বাদসাহী বাগ? ফতেপুর-সিক্রী বা তাজমহল সংলগ্ন মোগল বাগানের সঙ্গে এর তুলনা চলে কি?" মোরেস বল্‌লেন, "সত্যি, জাপানী বাগানে নেই কোনো ঐশ্বর্যের পরিচয়, কোনো বিরাটত্ব বা কোনো মহিমা যা দেখতে পাওয়া যায় ভারতবর্ষের মোগল-বাগানে।"

সঙ্গে চলেছেন আমাদেরই মত প্রায় শ'খানেক জাপানী নর-নারী। তাঁদের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সে সব চোখগুলো

যেন মুগ্ধ। সে চোখ গিয়ে পড়ছে শেওলা-ধরা পাথরগুলোর ওপর, জলের ধারের অ-ঘসা ও অ-মাজা পাথরের লণ্ঠনের ওপর, পুরনো পাথরের সেতুর ওপর বা বন্য বৃক্ষ ও গুল্মের ওপর।

আমাদের উদাসীন দেখে বন্ধু নিয়ে বসালেন খালের পাড়ে, পথের ধারে, খড়ের পর্ণকুটিরের বাঁশের বেঞ্চের ওপর। এ পর্ণকুটিরটি হোল চা-পান উৎসবের ঘর। ঘরটির সহজ গঠনপ্রকৃতি শহরের সেই চা-পান কক্ষেরই মত। একদম সাদাসিধে, কাঠের পরিবর্তে এ বানান হয়েছে কেবল বাঁশ, কাগজ ও খড় দিয়ে। একদিক খোলা এবং সে খোলা দিকের সাম্‌নে পড়ে আছে বাগানের একাংশ। বন্ধু বল্‌লেন জাপানী বাগানের কথা। এ একাংশ, একাংশ নয়; যে চোখ সে একাংশ দেখবে তার কাছে এটা অংশ বলে মনে হবে না, মনে হবে ওতেই অংশটুকু স্বয়ংপূর্ণ, যেন জাপানী চিত্রশিল্পীর পরিপূর্ণ ল্যাণ্ডস্‌কেপ পেন্টিং। ঐটুকুতেই শিল্পীচোখ পাবে তৃপ্তি। সমগ্র বাগানটী তন্ন তন্ন করে দেখবার কোনোই প্রয়োজন হবে না তাঁর। প্রকৃতির অঞ্চলটুকুর যে কোনো অংশ দেখে যেমন মানুষের মনে আস্‌তে পারে সমগ্র রূপের কাঠামোখানি, এও সেই একই প্রচেষ্টা। উদাহরণ স্বরূপ পাড়লেন হিমালয়ের কথা। হিমালয়ের রূপ ধ্যান করতে হোলে যেমন নিতে হয়না মনের দর্পণে প্রতিটি শিখর-দৃশ্য, এও হোল তাই।

জাপানী ল্যাণ্ডস্‌কেপ ছবির দিকে তাকালে যেমন চোখ জোড়া প্রথমে ফেলতে হয় বাঁয়ে, এখানেও দৃষ্টির গতি চলবে তেমনি ভাবে; গোটা বাগানটি হোল ছবি, মানুষ এঁকে রেখেছে প্রকৃতির দানের সাহায্যে জমির ওপর। এ বাগানের সামগ্রিক রূপ ধরবার চেষ্টা করা বৃথা হবে, এর প্রতিটি অংশই স্বয়ংসম্পূর্ণ দর্শকের কাছে। জাপানী চিত্রের মতন বাগান-শিল্পী একটা বাঁশ-ঝাড়, একটা গাছ, একটা ছোট্ট পাথরের ঢেলার পথ, একটা পাথরের লণ্ঠন, অঙ্কিত করে রেখেছেন দর্শকের চোখ ও মন ভুলাতে। প্রতিটি

দর্শনীয় যা কিছু আছে এ বাগানে তা যেন প্রকৃতিই নিজ হাতে যথাস্থানে রেখেছে মানুষের প্রীত্যর্থে। কোথাও নেই ঘস' মাজার চেষ্টা, কোনো গাছ বা গুল্মকে ছেটে কেটে জ্যামিতির নানা চিহ্ন-সমন্বিত করে রাখা হয়নি এখানে, এমনকি কোনো কিশোরী মাধবীলতাকেও বৃক্ষ-শাখে উঠবার জন্যে কোনোই সাহায্য করা হয়নি। বাগানের মাঝে যেসব খড়ের পর্ণকুটির বা কাঠের বাড়ি আছে সেগুলোও এমন জায়গায় অবস্থিত যাতে দর্শকের চোখ প্রকৃতির পসরা ছেড়ে সেদিকে গিয়ে না পড়তে পারে।

বাড়িগুলোর নামকরণ দেখলে তাদের সৃজন উদ্দেশ্যও অনেকটা বুঝতে পারা যায়। আমরা এলাম চন্দ্রালোক-প্রাঙ্গণে (moonlit pavilion)। প্রাঙ্গণ বল্‌লে ভারতীয় ধারণাকে হেয়ই করা হয়। সে কাঠের বাড়িখানার দাওয়ায় দাঁড়িয়ে কল্পনা করলাম মধুচন্দ্রিমার রাতে সম্রাট বা সামুরায়েরা যখন এ বাগানে আসতেন প্রকৃতির সান্নিধ্য পেতে।

তুলনা করলাম মনে মনে বর্তমান ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম বাগানটি জাপানের এই কাটস্থুরা বাগের সঙ্গে। সে বাগ দেখেছিলাম দক্ষিণে মহীসুর রাজ্যে। সার মির্জা ইসমাইল কল্পনা করেছিলেন সেই বৃন্দাবন-বাগ আর তার রূপ দান করলেন বিখ্যাত ইনজিনিয়ার শ্রীবিশ্বেশ্বরায়া। কাবেরী নদী-স্রোতের জল সরবরাহ করে থাকে সে বাগানে জল-শক্তি। বৈদ্যুতিক আলোতে সমগ্র বাগানটি আলোয় আলোকিত। সে আলোর কি বাহার! লাল, বেগুনে, হলদে বাতিগুলো ফোয়ারার জলকে নানা রঙে রাঙা করে রাখা হয়েছে।

কাটস্থুরা-বাগে জাপান কিন্তু খুঁজতে আসে না কোনো চোখ-ঝলসানো বাহার, চায়না পেতে জলকেলির কোনো সুযোগ, শুনতে ইচ্ছুক হয় না মানুষের কোনো কণ্ঠধ্বনি—সে হতে চায় মৌনী, স্তব্ধ আপনাতে আপনি নিমগ্ন। প্রাকৃতিক পরিবেশ সে সৃষ্টি করেছে

অন্যরূপ। সে পরিবেশ অনবদ্য। বৃন্দাবন-বাগ রূপাজীবা, নেই তাতে কাটসুরা-বাগের অধিষ্ঠাত্রী বনলক্ষ্মীর কোনো আসন।

এ সব বাগানের প্রতিটি উপাদান স্বাভাবিক নিয়মে ক্ষয়প্রাপ্তি হোলে পুনসংস্কার করা হয় বিশেষ যত্ন ও অনুভূতির সঙ্গে। যে শেওলা-পড়া পাথরখণ্ড পড়ে আছে জলের কিনারায় তা' যদি যায় ভেঙে তার সেখানে আসবে ঠিক অবিকল শেওলা-পড়া সম-কোণ বিশিষ্ট সেই বয়সের আর একখানা পাথরখণ্ড, যদি পরগাছায় ঢাকা কোনো গাছ স্বাভাবিক কারণেই শুকিয়ে যায় তবে সেস্থানে আসবে ঠিক অনুরূপ একটা গাছ। শেওলা-পড়া শত শতাব্দী পুরনো উৎপল খণ্ড হয়তো অনেকটা অনায়াসলভ্য, কিন্তু গাছ নাও মিলতে পারে যেখানে সেখানে এবং মিললেও সে প্রাচীনকে আনা এবং পুনপ্রতিষ্ঠা করা সহজসাধ্য ব্যাপারও নয়। সেজন্যে জাপানে গড়ে উঠেছে বড় বড় গাছ স্থানান্তরে নিয়ে যাবার টেকনিক। ইয়োরোপে শুনা যায় বড় বড় বাড়ি ঘর অবিকৃত অবস্থায় স্থানান্তরিত হয়ে থাকে, আর জাপানে হামেশায় স্থানান্তরিত হয় বড় বড় জ্যান্ত গাছগুলো। পৃথিবীর আদি সন্তানের সঙ্গে এই নিবিড় পরিচয় জাপানের জাতিধর্ম। অ-জাপানীদের কাছে সে ধর্মের গুঢ়তত্ত্ব সহজে ধরা দিতে চায় না, কিন্তু জাপানীদের কাছে তা' অতি সহজ ও অনাড়ম্বরের মধ্যেই এসে পড়ে, অতীতের ঐতিহ্যের দরুণ।

চা-পান উৎসবের মত জাপানের ফুল-সাজানো উৎসবের, ছোট ছোট ছাতের ওপর কৃত্রিম বাগান বানানর প্রচেষ্টায় জাপানী মনীষা যে উৎকর্ষতা দেখিয়েছে তার গোড়াতে ছিল—জাপানী পণ্ডিতেরা একথা অকুণ্ঠ ভাবে স্বীকার করে থাকেন—অতীতের সেই সব জেন (ধ্যান) বৌদ্ধ-শ্রমণদের সৃজন প্রতিভা। রবীন্দ্রনাথ জাপানী চরিত্রের এ অধ্যায় অনুসন্ধান করে তার নামকরণ করেছেন—ধ্যানী জাপান।

আত্ম-সমাহিত, সরল ও অনাসক্ত ধ্যান-মগ্ন এই জাপান ভারতবর্ষের অতি আদরের ও অতি পরিচিত বস্তু।

সেই জাপানের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রথম পরিচয় করে গিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজী জাপানের যে ক্ষুদ্র বিবরণীটুকু দিয়েছেন তা' যেমন একদিকে স্মরণ করিয়ে দেয় চীন-জাপানের সঙ্গে অতীত ভারতবর্ষের অক্ষুণ্ণ যোগসূত্রটীর কথা, তেমনি তা' অনাগত ভবিষ্যতের গৌরবময় সম্ভাবনার প্রতি লক্ষ্য রাখতে আহ্বান জানায়।

বিবেকানন্দ আমেরিকার যাত্রাপথে জাপানে পৌঁছেছিলেন মেইজী-যুগের প্রভাতকালে (১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে)। সে প্রভাতে জাপান স্বদেশ গঠনে তার সমগ্র জাতীয় প্রচেষ্টা নিযুক্ত করেছিল। তাই জাপান সম্পর্কে স্বামীজীর সেই ছোট্ট বিবৃতিটুকু সবদিক থেকেই ঐতিহাসিক। শিকাগো কনফারেন্সের বিশ্ববরেণ্য বিবেকানন্দ সে বিবৃতি লেখেননি, সে বিবৃতি এসেছিল এক অনামী সন্নাসীর কাছ থেকে, যিনি স্বদেশের সঙ্গে জাপানের তুলনা করে তাঁর বক্তব্য এমন ভাষায় লিখেছেন যাতে নেই কোনো হেঁয়ালি। সে লেখা আজও পড়লে অতি সহজেই ধরা পড়ে সেই সন্নাসীর মানসচক্ষে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের কোন্ আলেখ্য প্রতিফলিত হয়েছিল। অপরদিকে এমন দেশ সম্পর্কে সে বিবৃতিটুকু দেওয়া হয়েছিল যে তখনও ইয়োরোপের ব্যাপক এশিয়া-আক্রমণের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। জাপান তখনও ইয়োরোপে প্রতিষ্ঠা পায়নি চীন-জাপান বা রুশ-জাপান যুদ্ধের বিজয়ী রূপে। সে দেশও তখন ছিল সেই সন্নাসীরই মত অনামী, ইয়োরোপের চোখে আনতে পারেনি কোনো বিস্ময়।

স্বামীজীর চিঠিখানা তাই পুরোপুরি ঐতিহাসিক দলিল ঃ

পৃথিবীর মধ্যে যত পরিষ্কার জাত আছে, জাপানীরা তাহাদের অন্যতম। ইহাদের সবই কেমন পরিষ্কার। রাস্তাগুলি চওড়া, সিধা ও বরাবর সমানভাবে বাঁধানো।

ইহাদের খাঁচার মত ছোট ছোট দিব্যি বাড়ীগুলি, প্রায় প্রতি সহর ও পল্লীর পশ্চাতে অবস্থিত দেবদারু বৃক্ষে ঢাকা চিরহরিৎ ছোট ছোট

পাহাড়গুলি, বেঁটে, সুন্দরকায় অদ্ভুত বেশধারী জাপ্‌গণ—তাদের প্রত্যেক চালচলন ভাবভঙ্গী সবই সুন্দর। জাপান "সৌন্দর্য্যভূমি"। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর পশ্চাতেই এক একখানি বাগান আছে—উহা জাপানী ফ্যাশনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্ম, তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ড, ছোট ছোট কৃত্রিম জল প্রণালী এবং পাথরের সাঁকো দ্বারা উত্তমরূপে সজ্জিত।

নাগাসাকি হইতে কোবিতে গেলাম।

কোবি গিয়া জাহাজ ছেড়ে দিলাম, স্থলপথে ইয়োকোহমায় আসিলাম—জাপানের মধ্যবর্ত্তি প্রদেশ সমূহ দেখিবার জন্য আমি জাপানের মধ্যপ্রদেশে তিনটি বড় বড় সহর দেখিয়াছি। ওসাকা—এখানে নানা শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়; কিয়োটো—প্রাচীন রাজধানী, টোকিও—বর্ত্তমান রাজধানী; টোকিও কলিকাতার প্রায় দ্বিগুণ হইবে। লোকসংখ্যাও প্রায় কলিকাতার দিগুণ।

বৈদেশিক ছাড়পত্র ব্যতিরকে জাপানের ভিতরে ভ্রমণ করিতে দেয়না। দেখিয়া বোধহয়, জাপানীরা বর্ত্তমান কালের কি প্রয়োজন তাহা বুঝিয়াছে। তাহারা সম্পূর্ণরূপে জাগরিত হইয়াছে। উহাদের সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত ও সুনিয়ন্ত্রিত স্থলসৈন্য আছে। উহাদের যে কামান আছে, তাহা উহাদেরই একজন কর্ম্মচারী আবিষ্কার করিয়াছেন। সকলেই বলে, উহা কোন জাতির কামানের চেয়ে কম নয়। আর তারা তাদের নৌবলও ক্রমাগত বৃদ্ধি কচ্ছে। আমি একজন জাপানী স্থপতি নির্মিত প্রায় এক মাইল লম্বা সুড়ঙ্গ (tunnel) দেখিয়াছি।

ইহাদের দেশলাইয়ের কারখানা এক দেখবার জিনিস। ইহাদের যে কোন জিনিষের অভাব, তাই নিজেদের দেশে করবার চেষ্টা কচ্ছে। জাপানীদের নিজেদের একটি স্টিমার লাইন আছে—চীন জাপানের মধ্যে উহাদের যাতায়াত করে। আর ইহারা শীঘ্রই বোম্বাই ও ইয়োকোহমার মধ্যে জাহাজ চালাইবে মতলব করিতেছে।

আমি ইহাদের অনেকগুলি মন্দির দেখিলাম। প্রত্যেক মন্দিরে কতগুলি সংস্কৃত মন্ত্র প্রাচীন বাঙলা অক্ষরে লেখা আছে, কিন্তু মন্দিরের পুরোহিতগণের অল্প সংখ্যক মাত্রই সংস্কৃত বুঝে। কিন্তু ইহারা বেশ বুদ্ধিমান। বর্তমান কালে সর্বত্র এই যে উন্নতির জন্য প্রবল তৃষ্ণা দেখা যায়, তা পুরোহিতদের মধ্যেও প্রবেশ করেছে। জাপানীদের সম্বন্ধে

আমার মনে কত কথা উদয় হচ্ছে; তা একটা সংক্ষিপ্ত চিঠির মধ্যে প্রকাশ কোরে বলতে পারিনা। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, আমাদের দেশের যুবকেরা দলে দলে প্রতিবৎসর চীন ও জাপানে যাক্। জাপানে যাওয়া আবার বিশেষ দরকার; জাপানীদের কাছে ভারত এখনও সর্বপ্রকারে উচ্চ ও মহৎ পদার্থের স্বপ্নরাজ্যস্বরূপ।

[পত্রাবলী ; মাদ্রাজী শিষ্যগণের নিকট লিখিত, ১০ই জুলাই, ১৮৯৩ সাল]

জানিনা মেইজী-যুগের জাপানের এমনি নিখুঁত ছবি স্বামীজীর পূর্বে ভারতবর্ষের আর কেউ দিয়েছেন কিনা। সেই বিবেকানন্দ-দত্ত পরিচয়, রুশ-জাপান যুদ্ধ, স্বদেশী আন্দোলন এবং সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের লেখনী-প্রতিভা অতি সহজে জাপানকে ভারতবর্ষের নিকট আত্মীয় করে তুলেছিল।

এ পরিচয় একতরফা হয়নি। টোকিওতে কাবুকী অভিনয় দেখ্‌ছি, পাশে বসেছেন তর্জমা করে বুঝিয়ে দেবার জন্যে বৈদেশিক দপ্তরের এক যুবক-অফিসর। তাঁকে জিজ্ঞেসা করলাম, ওকাকুরার নাম শুনেছেন কিনা। কাছে বসেছিলেন জাপানের তদানীন্তন ভারতস্থিত দূত, নিশিয়ামা (Nishiama), তিনি আমাদের কথাবার্তা শুনে হাসতে হাসতে বল্‌লেন—আপনার প্রশ্নের তাৎপর্য ধরতে পেরেছি।

গোটা জাপানে ওকাকুরা ছিলেন একমেবাদ্বিতীয়ম্। খাঁটি মেইজী যুগের ছাত্র হয়েও তিনি ছিলেন মনে প্রাণে স্বদেশী। বঙ্কিম যেমন আমাদের, তেমনি তিনি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) প্রথম দলের ছাত্র। পড়াশুনা শেষ হলে শিক্ষা-বিভাগের চিত্র-কলা-বিদ্যার রিসার্চ কমিশনার পদ গ্রহণ করলে তাঁর চোখ জাপানের চিত্র-কলার ঐতিহ্যের ওপর গিয়ে পড়ল। টোকিও স্কুল অফ আর্টস্ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হোলে ওকাকুরা হলেন তার সর্বময় কর্তা।

জাপান তখন ইয়োরোপের রূপ, রস ও গন্ধে মোহগ্রস্ত। চিত্র-কলার ক্ষেত্রেও মেইজী-যুগ প্রবর্তকেরা ইয়োরোপীয় ধারা আনতে

বদ্ধপরিকর দেখে ওকাকুরা করলেন দৃঢ় প্রতিবাদ। তাঁর প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করেই পশ্চিমী ধারায় জাপানে চিত্রাঙ্কন বিদ্যা শেখানর ব্যবস্থা হোলে ওকাকুরা পদত্যাগ করে দাঁড়ালেন সে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। প্রতিষ্ঠানের আরো পনেরোজন সহকর্মী ও অধ্যাপকেরা ওকাকুরাকে সমর্থন করে চাকরীতে ইস্তাফা দিয়ে তাঁরই নেতৃত্বে টোকিও শহরে গড়ে তুললেন খাঁটি জাপানী পদ্ধতিতে চালিত চিত্র-কলা-কেন্দ্র। ওকাকুরার সেই চেষ্টার জন্যেই আজ জাপানে জাপানী চিত্রাঙ্কন বিদ্যাধারা জীবন্ত হয়ে আছে।

স্বামীজীর আমেরিকান শিষ্যার মুখে ভারতবর্ষের কথা শুনে ওকাকুরা ছুটে এলেন কলকাতায়। এখানে এসেও চিত্র-বিদ্যার ক্ষেত্রে পশ্চিমী স্রোতধারার অবাধ গতি লক্ষ্য করে ওকাকুরা বিষণ্নই হয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী দৃষ্টি, যেমন হ্যাভেল তেমনি ওকাকুরা, ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি দরদী হোতে খুলে দিলেন। তাঁর কাছ থেকেই অবনীন্দ্রনাথ শিখলেন জাপানী ওয়াটার কলারিং টেকনিক। প্রতিষ্ঠিত হোল বেঙ্গল স্কুল অফ পেন্টিং অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে। অজন্তা ও ইলোরা দেয়াল চিত্র এবং মোঘল, রাজপুত আর ক্যাঙ্গরা মিনিয়েচার ছবিগুলো আবার পেল রূপ ও নবজীবন।

বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ জাপানকে যেমন ভারতবর্ষের কাছে টেনে এনেছিলেন তেমনি কাকুজী ওকাকুরা ভারতবর্ষকে জাপানের কাছে পৌঁছে দিলেন। তাঁর সাহিত্যিক নাম ছিল তেনসিন ওকাকুরা। স্বামীজীকে জাপানের পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ করতে এসে ওকাকুরা তাঁরই সঙ্গী হয়ে গিয়েছিলেন গয়াধামের মহাবোধি মন্দির দর্শনার্থে। ভগ্ন-স্বাস্থ্য বিবেকানন্দ জাপানের সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেন নি। কিন্তু যে মন্ত্র ওকাকুরা পেলেন সেই সন্ন্যাসীর কাছ থেকে তা' হয়ে পড়েছিল এতই জোরাল যে পরিণামে ইম্পিরিয়ালিষ্ট কার্জন এই জাপানী শিল্প-রসজ্ঞের ভারতবর্ষে অবস্থিতি দেখলেন ইংরেজ-সাম্রাজ্যের বিপদস্বরূপে।

সে বিপদ ঘিরে ছিল সেই বিশ্ব-বন্দিত মহাবোধি-মন্দির নিয়ে। বিবেকানন্দের নিকট হতে মন্দিরের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা শুনে এবং মন্দিরের সেদিনকার দুর্দশা দেখে ওকাকুরা প্রতিজ্ঞা করলেন সে মন্দির মোহান্তের হাত থেকে নিয়ে পুরোপুরি সংস্কার করবেন। বিবেকানন্দ তখন তিরোধামে, রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং নিবেদিতা ওকাকুরাকে সাহায্য করতে এলেন এগিয়ে। মোহান্তের সঙ্গে সব কথাবার্তাই প্রায় ঠিক হয়েছে, যখন কার্জন বুঝতে পারলেন এ বাঙালী-জাপানী-আইরিশ মতলবের সুদূর-প্রসারী প্রতিক্রিয়া। মোহান্ত কার্জনী ধমক খেয়ে হয়ে গেল চুপ, ওকাকুরাকে এমন কি নিবেদিতাকেও সাময়িক কালের জন্য ছাড়তে হয়েছিল ভারতবর্ষ। এই ওকাকুরা লিখলেন—পূবের সাধনা (The ideals of the East) নিবেদিতা লিখলেন তার ভূমিকা। এশিয়া যে এক সেকথা প্রথম ধ্বনিত হোল বিবেকানন্দের আশীর্বাদ-প্রাপ্ত জাপানী শিল্প-রসজ্ঞ ওকাকুরার সেই গ্রন্থে।

চলন্ত পৃথিবীতে সনাতনী অচলায়তন থাকতে পারে না। ভেঙে পড়বেই সে দুর্গ মানুষের চির সঞ্চরণশীল পদক্ষেপে, বিশেষতঃ সে সব দেশে যে দেশে পূব আর পশ্চিম এত কাছাকাছি এসে পড়েছে। নতুন জাপানে দেখে এলাম ঘাত-প্রতিঘাতের প্রচণ্ড সংঘর্ষ, তা থেকে কোন্ নতুন প্রতিভার স্থষ্টি হবে কে বলতে পারে? কেবল এটুকুই আজ দৃষ্টি-গ্রাহ্য যে গোটা জাপান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং লৌকিক সবদিক দিয়েই নতুনত্বের সম্ভাবনা নিয়ে ভরপুর। ইতিহাস সেখানে রয়েছে নতুন অধ্যায় জুড়ে দেবার প্রতীক্ষায়।

এমনি এক যুগ-সন্ধিকালে জাপানী মানুষকে দেখলাম ছোট বড় সমস্যার সামনে পড়েও তার ছোট কুটিরে বসে চায়ের বাটি সাম্‌নে রেখে দুই চোখ জানালা দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাছের ওপর, দোল-খাওয়া লতার ওপর, শেওলা-পড়া ডুবন্ত

পাথরের ওপর। সে চোখ হোল ধ্যানী-জাপানের। কোন্ রহস্যের সন্ধানে সে চোখ নিবদ্ধ? নিক্কোর বনানীর মধ্যে ও লেকের বা পাহাড় থেকে গর্জে গর্জে পড়া জল-প্রপাতের পাশে, মিয়াজিমার সমুদ্রের মধ্যে প্রোথিত রক্তবর্ণের তোর্জি-তোরণ আর হ্যাকনের টগবগে উষ্ণ প্রস্রবনের ধূমে আবৃত ফুজিয়ামা দেখে জাপানী চোখ অন্ততঃ নিমেষের জন্যে এখনও আত্ম-ভোলা হয়ে পড়ে। এখনও ক্ষণিকের অবসরে—জাপানী মন খুঁজে পেতে চায় আত্মতৃপ্তি এসব প্রকৃতি দত্ত ও মনুষ্য-সৃষ্ট অবদানের মধ্য দিয়ে। সেখানে, নতুন জাপানে আর সেই পুরনো জাপানে কোনো বিচ্ছেদ নেই। ভারতবর্ষের দিকপালেরা যে চিত্র রেখে গেছেন জাপানের, সে চিত্র এত পরিবর্তনের মধ্যেও এতটুকু ম্লান হয়নি।

প্রশান্ত মহাসাগরের ধার দিয়ে আমরা চলেছি কামাকুরায় দাই-বাত্সু বুদ্ধ-প্রতিমা দর্শনে। কামাকুরায় সীমার মাঝে অসীম পড়ে আছে এক নিবিড় আত্মীয়তার যোগসূত্র স্থাপন করে। ডাইনে বিরাট সমুদ্রের প্রশস্ত ঘাট, অসংখ্য নরনারী সমুদ্র স্নানে বা পাড়ে গল্প-গুজবে ব্যস্ত। কত ক্ষুদ্র দেখাল তাদের সেই প্রশান্ত মহাসমুদ্রের কিনারে। আস্তে আস্তে মোটর এসে পড়ল এক প্রাঙ্গণে। জাপানের শিল্পীহস্ত সে প্রাঙ্গণ এত সুসজ্জিত করে রেখেছে যে কোনো মন্তব্যই চলেনা সে সজ্জা সম্পর্কে। এগিয়ে চল্‌লাম বাগানের পথ দিয়ে, সাম্‌নে আসনস্থ হয়ে আছেন জাপানের শিল্পী-আত্মার প্রতীক—ধ্যানী বুদ্ধ। বিরাট তাঁর অবয়ব, শির ঈষৎ আনত, পাণিদ্বয় জানুদ্বয়ের ওপর সুবিন্যস্ত, নিজের মধ্যেই নিজে খুঁজছেন রহস্যের কোনো সন্ধান। সে মূর্তিতে ধরা পড়ে আছে জাপানের আর ভারতবর্ষের শিল্প-মাধুর্যের সব-কিছু প্রভাব, সে ধ্যানে নিহিত আছে ভারতবর্ষের আত্ম-সমাহিতি।

জাপানের শিল্পী আত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক এ দাই-বাতসু বুদ্ধমূর্তি যেমন মুগ্ধ করে থাকে বিদেশী ভাবুক দর্শককে তেমনি আনন্দ দান

করে জাপানী জন-সাধারণকে। প্রতিমা-খানি রয়েছে অক্ষত এবং অবিকল সেই অবস্থায় যে অবস্থায় সে গত কয়েক শতাব্দী ধরে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে আপন রহস্য উদ্‌ঘাটনে। একদা এই ধাতুনির্মিত বুদ্ধ মূর্তিকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল নারা-শহরের বুদ্ধ-মূর্তির মত। প্রশান্ত মহাসাগর থেকে উত্থিত ঝড়ে সে আশ্রয় হোল চুরমার। পুনরায় আশ্রয় গড়ে তুললে আবার ঝড় ভেঙে ফেল্‌ল সে আশ্রয়। আর একবার আশ্রয় দেওয়া হোল এবং তা' ভাসিয়ে নিয়ে গেল প্রশান্ত মহাসাগরের প্লাবন ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে। সেদিন থেকে সে প্রতিমা হয়ে আছে অ-নাগরিক, তার সাথী আজ পার্শ্বস্থিত পাহাড়, বৃক্ষ ও সমুদ্র। প্রতিদিন প্রশান্ত মহাসাগর থেকে নবসূর্য উদয়াচলে উঠলে প্রথমেই দর্শন করে এই শান্ত, আত্মদ্রষ্টা, ধ্যানী-বুদ্ধকে। প্রাঙ্গণে পড়ে আছে পাঁচ ফিট পরিধির পাথরখণ্ডগুলো যা' একদিন সুদৃঢ় করে রাখতে চেষ্টা করেছিল দাইবুাতসু প্রতিমার আশ্রম ঘরের খুঁটিগুলোকে।

অনাবৃত প্রতিমার অঙ্গনে রয়েছে পাথরের সুদৃশ্য লণ্ঠনগুলো আর বেদীর ওপর স্থাপিত আছে পাথরের ধূপদানী। বেদীর কাছেই অতি মিষ্ট ভাষায় লেখা আছে জাতির পক্ষ থেকে দর্শকের প্রতি জাপানের নিবেদন।

সে ভাষা যেমন সরল তার আবেদনটুকু তেমনি হৃদয়গ্রাহী। তর্জমা করলে সে আবেদন জানায়, 'হে দর্শক! তুমি যে কেউ হও না কেন, তোমার ধর্মাধর্মজ্ঞান যাই থাকুক না কেন, যখন তুমি এই আশ্রমে প্রবেশ করছ তখন মনে রেখ যে এ মাটি যুগযুগান্তর ধরে পবিত্র হয়ে আছে অতীতের ঐতিহ্যে ও যজ্ঞে।

এ বৌদ্ধারাম হোল নির্বাণ-পথের চটি; তুমি যখন সে আরামে প্রবেশ করছ তখন সেই কথাটি মনে রেখো।"

পাশে পাথরের নোটিসবোর্ডে লেখা রয়েছে জাপানী সম্রাট কর্তৃক সে মূর্তি উন্মোচনের ছোট্ট কাহিনী।

মন্দির প্রাঙ্গণের প্রতিটি পাথরখণ্ডের আছে ছোট বড় ইতিহাস। সবচেয়ে আকর্ষণ করল আমাকে সেই প্রস্তর-লিপিখানি যা স্মরণে এনে দেয় সেই মহিলার স্মৃতিকে যিনি এই দাই-বাতস্থ-প্রতিমা স্থাপন ব্রত নিয়েছিলেন ১২৩৮ সালে। তাঁর নাম ছিল ইদানো-নো-স্থবোনে। তিনি ছিলেন জাপানী ইতিহাসের ভারতীয় অম্রপালী। নারা-ধামের বুদ্ধ মূর্তি সংস্কার উৎসবে সম্রাটের আমন্ত্রণে গিয়েছিলেন কামাকুরার সোগান-মন্ত্রী। উৎসব থেকে ফিরে এসে তিনি ঠিক করলেন কামাকুরায় এমন একটি বুদ্ধ প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করবেন যা হবে সবদিক দিয়ে নারা-ধামের বুদ্ধমূর্তি থেকে সুন্দরতর। মনের অভিলাষ পূরণ হবার পূর্বেই হোল তাঁর মৃত্যু। তাঁর সেই অপূর্ণ আকাঙ্খার রূপ দিলেন তাঁর প্রিয় বান্ধবী।

মূর্তি ও আশ্রমটি তন্ন তন্ন করে দেখে শুনে ঢুকে পড়লাম পাশের ছোট মিউজিয়ম-দোকানে। সেখানে যেমন পাওয়া যায় কামাকুরার সবকিছু স্থভেনির ক্রয়ার্থে, তেমনি রক্ষিত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় দাই-বাত্‌স্থ প্রীতার্থে দান সামগ্রীগুলো। অবাক হয়ে দেখলাম যে কৃষি-বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা পাঠিয়েছে বিরাট একজোড়া খড়ের চটি-পাদুকা বুদ্ধের অর্ঘ-স্বরূপ, কারণ সে বছর তাদের আশানুরূপ শস্য-প্রাপ্তি হয়েছে। কিয়োটোর নিশি হোঙ্গানজী মন্দিরে দেখে-ছিলাম জাপানের মেয়েদের মাথার লম্বা চুলে বানান সুদীর্ঘ রজ্জু যা ব্যবহার করা হয়—অবশ্য প্রতীক হিসেবেই—রথযাত্রা উৎসবে নিশি হোঙ্গানজী মন্দিরে অমিতাভ-বুদ্ধ দর্শনে গেলে জাপানের মন্দির-সজ্জাও বিশেষ ভাবে চোখে পড়েছিল। ভারতীয় মন্দির-সজ্জার সঙ্গে তার মিল আছে খুবই। নিক্কোর শিণ্টো-মন্দির অঙ্গনে ভক্তদের গাছের ডালে ধ্বজা বেঁধে রাখতে দেখলাম। সিংহলের, চীনের, জাপানের এমন কি সাইবেরিয়ার মোঙ্গল বৌদ্ধ-ভক্তদেরও দেখেছিলাম একই পদ্ধতিতে ধ্বজা বেঁধে দিতে লুম্বিনী ও শ্রাবস্তীতে

হিন্দু তীর্থযাত্রীদের পক্ষে এটাতো অতি করণীয় কাজ বিশেষ করে যখন তারা যান পুরীধামে জগন্নাথ দর্শনে।

কামাকুরার বুদ্ধমূর্তি, আশ্রমটি এবং প্রশান্ত মহাসাগরের পাড়টি মনোমুগ্ধ করল একান্তভাবেই। একদা কুশীনগরের বিরাট চৈত্যের পাশে নবনির্মিত শ্বেত পাথরে সংস্কৃত, প্রশস্ত প্রদক্ষিণ-পথ ঘুরে প্রণাম নিবেদন করে এসেছিলাম পরপারে গমনোন্মুখ শায়িত গৌতম-বুদ্ধ-প্রতিমাকে। আর আজ পূবের শেষ সীমানায় বিরাজমান ধ্যানমগ্ন, মৌনী, স্থির ও শান্ত অমিতাভ-বুদ্ধ মূর্তির সম্মুখে করজোড়ে জয়-ধ্বনি দিয়ে এলাম।

অন্তহারা সঞ্চয়ের আহুতি মাগিয়া
সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল উঠেছে জাগিয়া;
তাই আসিয়াছে দিন,
পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন,
আবার তাহারে
আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে
শুনিবারে
পাষাণের মৌনতটে যে-বাণী রয়েছে চিরস্থির—
কোলাহল ভেদকরি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র—'বুদ্ধের শরণ লইলাম।'

[বোরোবদুর (যবদ্বীপ) রবীন্দ্রনাথ]

চীন সীমান্তে

তিন তিনবার পূবের আকাশ-পথে পাড়ি দিলাম। প্রথমে সিঙাপুর, পরে হংকং, এবার জাপান।

আকাশ পথে বিচরণে যে নতুনত্বের আস্বাদ তা পুরোপুরি ভাবে আগেই পেয়েছি যখন স্বদেশে কলকাতা-কাঠমাণ্ডু বিমান পথ খোলবার প্রথম নিষ্ফল চেষ্টা করা হয়েছিল। সেই প্রথম বিমানে আমিই ছিলাম একমাত্র সাংবাদিক। দু' দু'বার হিমালয়ের দক্ষিণাঞ্চল অতিক্রম করেও মেঘ বাদলার জন্যে সে বিমান কাঠমাণ্ডুতে অবতরণ করতে পারেনি। বেশ মনে আছে প্রথমবার সিবালিক-হিমালয়ের ওপর দিয়ে ঘণ্টাখানেক ঘুরে যখন কাঠমাণ্ডু বিমানপোতের কোনোই হদ্দিস না করতে পেরে প্লেনটী পাটনায় ফিরে এল, তখন হাঁফ ছেড়ে মনে মনে ধারণা করেছিলাম যে গিরি-লঙ্ঘন ভাগ্যে লেখা নেই। পাটনার এরোড্রোমে বসে আছি কলকাতায় ফিরব বলে এমন সময় টেলিফোনের যন্ত্র ক্রিড়ং ক্রিড়ং করে বেজে উঠল। কাঠমাণ্ডুর ভারতীয় এমব্যাসী থেকে আর একবার কাঠমাণ্ডু অভিযান করতে অনুরোধ এল।

অত্যন্ত অনিচ্ছায় ও কেবল লজ্জায় পড়েই দ্বিতীয়বার বিমানে উঠলাম। ড্যাকোটা প্লেন, আধুনিক বিমানগুলোর মত বাহির-নিরপেক্ষ হয়ে অভ্যন্তরে স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস নেবার ব্যবস্থা নেই। অথচ পাইলট-চালক অত্যন্ত সাবধানী, হিমালয়ের নাম শুনেই বিমানটী ১৮০০০ ফুটের ওপর আকাশে ঠেলে উঠিয়েছেন। বেশ অস্বস্তিবোধ করেছি, গলার টাই আল্‌গা করে ফেলেছি, কিছুক্ষণ পর পেটের প্যাণ্টের বোতামও খুলেছি, চেয়ারখানা কাত করে প্রায় শুয়ে পড়বার যোগাড় করেছি সহজে নিশ্বাস প্রশ্বাস নেবার জন্যে। বিমান পুনরায় হিমালয়ের শিখরের ওপর চক্কর দিচ্ছে, মাঝে

মাঝে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে রৌদ্রকরোজ্জ্বলে ঝলমল করে উঠছে ক্ষণিকের জন্যে তুষার মণ্ডিত গৌরীশঙ্করচূড়া। দেখবার ইচ্ছে রয়েছে ষোল আনা, কিন্তু দেহের অবস্থা একান্তভাবেই প্রতিকূল; আবার ঘণ্টাখানেক ঘুরে ঘুরে যাত্রীদের বেশ খানিকটা বৃথা হয়রানি করে বিমান ফিরে এল পাটনায় এমন সময় যখন সূর্যদেব পশ্চিম আকাশে অনেকখানি ঢলে পড়েছেন।

পাহাড় তো গেল। এবার শুরু হোল ঝড় আর বৃষ্টি। দমদমে ফেরবার মুখে যখন বিমানটী বাতাসের ঢেউ-এর ওপর আছাড় খেতে লাগল তখন ভয় পেলেও শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য ততো বেশি বোধ করিনি। কিন্তু ঢেউ চলে যাবার পর বিমান যখন নীচে পড়তে থাকে তখনকার অবস্থায় কে নির্বিকার থাকতে পারে? সঙ্গীদের মাঝে এক যাত্রী-ভদ্রলোকের পক্ষে ভদ্রলোকের মত বসে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ল। নিজের অবস্থা তখন হাসি কান্নার পরপারে। কাঠমাণ্ডু দেখবার সাধ মিটল যখন সেই ঝড়ের মধ্যেই নামলাম দমদম বিমানপোতে। বিমান-বিহারের এই প্রথম আস্বাদ লাভের পর বোধহয় আর একটাই নতুন অভিজ্ঞতা প্রাপ্য থাকতে পারে, যদিও তা বর্ণনা করবার সুযোগ সেই ভুক্তভোগীর ভাগ্যে কদাচিৎ এসে থাকে।

জাপানে যেতে সেই পুরনো কথা মনে পড়ল যখন হংকং থেকে প্রভাতে যাত্রার যোগাড় করেছি। বিমানগুলো হংকং বিমানপোত ছাড়ে প্রভাতে। আবার ফেরবার সময় টোকিও থেকে আকাশচারী হয় রাত্রিবেলা যাতে হংকং-এ এসে পড়তে পারে প্রভাতে। হংকং বিমানপোতে পৌছলে কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিলেন জাপান-গামী যাত্রী-বিমান ছাড়তে দেরী হবে কারণ আবহাওয়ার সংবাদ ভাল নয়। কাঠমাণ্ডুর অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে সে সংবাদ অগ্রাহ্যই করলাম। রবীন্দ্রনাথের "জাপানযাত্রী" পড়ে এ অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থার সঙ্গে পরিচয় হয়েও অস্থির হইনি। প্রশান্ত

মহাসাগরের ওপর দিয়ে পাগলা ঝড়ের আনাগোনার পথই হোল এটা। ভারতবর্ষের কালবোশেখী জাপানী টর্ণেডো টাইফুনের কাছে অকিঞ্চিৎকর। হংকং থেকে বিমানগুলো আকস্মিক এই ঝড়ের আশঙ্কায় প্রায়ই যাতায়াতের নিয়ম-ভঙ্গ করে থাকে।

হংকং-এ প্রথম যেবার এসেছিলাম এবং স্বদেশে ফিরবার জন্যে বিমানপোতে এসে যখন পৌঁছেছি তখন সেখানে হঠাৎ দেখা হোল লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর সঙ্গে। তিনি চলেছেন জাপানে ইউনেস্কের কাজে। বিমানঘাঁটিতে পৌঁছে তিনি শুনেছেন ঝড়ের জন্যে তাঁদের বিমানটি ছাড়তে দেরী হবে। সেই দূরদেশে স্বদেশীয়কে দেখে বেশ বিচলিত ভাবে জিজ্ঞেসা করলেন, এই ঝড়ে কী করে থাকবেন বিমানের মধ্যে? তাঁকে সেদিন মাভৈঃ দিয়ে বলেছিলাম যদি তেমন নাচন কোঁদনের মধ্যে পড়েন তবে কিছু পান্-টান্ করে মনটাকে অন্য দিকে চালিয়ে দেবেন। হাল্কা হাসি ঠাট্টার মধ্যে ক্ষণিকের সাক্ষাৎ সমাপ্ত হোল। আমাদের যাত্রার পূর্বেই তাঁর বিমানে আসন নেবার জন্য ডাক পড়ল। নমস্কার করে হাসতে হাসতে তিনি ঢুকে পড়লেন বিমানের মধ্যে।

এবার সেই বিমানঘাঁটি পৌঁছে আবার ঝড়ের সাবধান-সংকেত শুনবার পর মনে পড়ল দেবীপ্রসাদের সেই প্রশ্নটা। জাপান-গামী বিমান হংকং ছেড়ে সাধারণতঃ থামে ওকিনওয়া দ্বীপে এবং সেখানে থেকে এক দৌড়ে সোজা পৌঁছয় টোকিওতে। ঝড়ের জন্যে আমাদের বিমানটা ওকিনওয়াতে নামবার ব্যবস্থা স্থগিত রেখে সোজা টোকিওর পথ ধরল। যাত্রা শুরু হোলে পথটি যে ঝড়ে বাধাগ্রস্ত তা' কিন্তু মালুমই হোল না। কেবল এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে বিমানখানি অনেক উঁচু দিয়ে ছুটেছে। অন্যান্য জায়গায় সমুদ্রের বেলাভূমি বা মাঝ দরিয়া খোলা চোখে বেশ আঁচ করতে পেরেছি। কিন্তু এখানে, এই জাপান ও প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্গমে, বিভ্রম এলো চোখের পর্দায়। নীচে

যা দেখলাম তা আর নীল সমুদ্র বলে মনে হোল না। একটা টানা নীল রং-এর ঢেউ খেলানো আঁচল যেন বিস্তৃত হয়ে আছে। লক্ষ্যবেধ দৃষ্টি নীচে হানলে কেবল এটুকু ধরা যাচ্ছিল যে সেই অচল নীল আঁচলের ভাঁজে ভাঁজে প্রতি মুহূর্তে সাদা ফুল ফুটে উঠছে এবং পরক্ষণেই সেই অসীম নীলাম্বরে আপনি মিশে যাচ্ছে। এটা সহজবোধ হোল যে নীচে সমুদ্রের ওপর দিয়ে চলেছে ঝড় আর সে ঝড়ের গতিপথের অনেক অনেক উঁচু দিয়ে চলেছে বিমান। পাইলট তো আগেই যাত্রীদের জানিয়েছেন কত উঁচু দিয়ে আমরা চলেছি।

কিন্তু সে উচ্চতা কাগজ কলমের মারফৎ ছাড়া উপলব্ধি করব কি করে? বিষয়টী একান্তে ভাবতে ভাবতে বিমানের জানলা দিয়ে চোখ ছেড়ে বসে আছি। হঠাৎ দেখলাম কে যেন একটা ছোট্ট ঢিল মারল বিমানের বিরাট এলুমিনিয়ম দেহে, হয়তো বা আমার ধ্যানভঙ্গ করবার জন্যেই। উৎকর্ণ হয়ে থাকলাম। আবার শব্দ। বিরাট ধাতব পাখার স্ক্রু, বল্টুগুলো খুলে যাচ্ছে না তো? সন্দেহ হোল, ভাবছি হষ্টেসকে ডেকে ব্যাপারটি বুঝিয়ে দেই। বিমানের মাঝে কিন্তু সকলেই নির্বিকার অথবা গল্প গুজবে মশগুল। এ অবস্থায় একটা হৈ চৈ করা উচিত হবে না মনে করে আবার তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলাম শব্দের উৎসটা, পাখার দৃষ্টাংশের ওপর চোখ বুলিয়ে। দেখতে পেলাম প্রপেলার যেখানে অবিরাম অবস্থায় ঘুরছে ঠিক তার পেছনে বাতাস জমে বরফ হয়ে লেগে যাচ্ছে পাখার বনেদের ধারে ধারে। যেই সে জমা-বরফ একটু একটু করে বড় হয়ে উঠছে অমনি বাতাস তার আগাটুকু উপড়ে নিয়ে ফেলছে। এর কোনোটা ছুটে এসে প্লেনের গায়ে ঠেকছে, আর কোনোটা বা কক্ষচ্যুত গ্রহের মত মহাশূন্যে ছুটতে ছুটতে যাচ্ছে ধরিত্রী-ধৃত নীলাম্বুজে। কারণটা ধরতে পেরে মনটা খুশী হোল। মাটিতে আপেল পড়ার কারণ আবিষ্কার

করে নিউটন এর চেয়ে বেশি খোশমেজাজী হননি। হাওয়া ঘুরে বরফ হচ্ছে তা থেকে মাটির কত উঁচুতে আমরা আছি অনুমান করলাম।

জাপান থেকে রাত্রে আবার ঐ পথে স্বদেশে ফিরছি। কখনো দ্বীপের ওপর দিয়ে কখনো বা প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে বিমান উড়ে চলেছে। পথ নির্দেশ করে দিচ্ছে দ্বীপস্থিত শহর বা গাঁয়ের বৈদ্যুতিক বাতিগুলি আর আকাশের সপ্তর্ষিমণ্ডল। ঘুমানর সময় আগত, বিমানের মধ্যেকার বাতি নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরাও যে যার চেয়ারে যতটা সম্ভবপর আরাম ভোগ করা যায় তা পাবার চেষ্টা করছি। এমন সময় সবগুলো আলো একসঙ্গে জ্বলে উঠল। পেটের বেল্‌ট বাঁধতে নির্দেশ এল। হস্টেসরা বিমানের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে দেখছেন সে নির্দেশ সবাই মেনে নিয়েছে কি না। আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রীদের মধ্যে যাঁরা নিদালু তাঁরা শশব্যস্ত হয়ে জেগে উঠেছেন। ব্যাপার কী? ব্যাপার যে কী তা বুঝতে বা বোঝাতে একটুও দেরী লাগল না বিমানের নটরাজ নৃত্যের তালে তালে ঠেকা দিতে দিতে। সে নাচনও থামে না, সে আলোও আর নেভে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। বিপদ যখন চিরস্থায়ী হয়ে হাঁকিয়ে বসে তখন সে সম্পর্কে উগ্রতাবোধ আপনা থেকেই কমে যায়। দেহ ও মন সে বিপদকে বাহুল্য বা খাতির না দেখিয়ে দৈব ব্যবস্থার ওপর নিজেকে ছেড়ে দেয় অতি সহজ অবস্থায়।

ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিমান চলেছে গাঢ় তিমির ভেদ করে গন্তব্যস্থলে। ক্রমাগত হোচট্‌ খাচ্ছে বটে তবে যাত্রীদের ক্লান্ত দেহ তখন অসাড়-প্রায়। আমরা তিনজন পাশাপাশি ও মুখোমুখি হয়ে চোখ বুজে বসে আছি। যেন তিনজনই সব কিছু অগ্রাহ্য করে ঘুমচ্ছি। একবার বেশ একটা প্রচণ্ড ঢেউ সজ্ঞান করে

দিয়ে গেল। চোখ খুলে ফেলেছি, সামনে ওয়াগ্‌লে ও ফ্রাঙ্ক মোরেস তাঁকিয়ে আছেন, দেখলাম। অনেকটা ইঙ্গিতেই জিজ্ঞেসা করলাম, কেমন লাগছে? ওয়াগ্‌লে ছোট্ট উত্তরে জানালেন, তিনি বুঝতেই পারছিলেন না আমি ঐ অবস্থায় কী করে ঘুমচ্ছি। অকপটে স্বীকার করলাম, এক পলক ঘুমও আসেনি আমার, বিমানের এই ওঠা-নামার ঠেলায়। কী আর করি, চোখ বুজে পড়ে আছি। সেই যে তিনজন চোখ-খোলা অবস্থায় আর ক্রমাগত হাই তোলার মাঝে গল্প জুড়ে দিলাম তার নিবৃত্তি হোল ওকিনওয়া বিমান ঘাঁটিতে নেমে। বিমানের দরজা খুলে দিলে ওভারকোট গায়ে মুড়ে সবার সঙ্গে আমিও রাত্রির অন্ধকারে নেমে পড়বার উদ্যোগ করছি। গ্যাঙওয়েতে পা বাড়িয়েছি কি ঝড়ো হাওয়া এসে দিল ধাক্কা। পড়ে যাই আর কি!

আমেরিকানদের দ্বারা সংরক্ষিত বিমানঘাঁটির হ্যাঙ্গারে তাড়াতাড়ি ঢুকে ও গরম কফি আত্মসাৎ করে তৃপ্তি পেলাম। রাত্রি তখন শেষ হয়ে এসেছে, ঝড়ের এলাকা প্রায় পেছনে ফেলে এসেছি, তাই আবার যখন বিমানে আসন গ্রহণ করলাম তখন দেহ ক্লান্ত হোলেও মন শ্রান্ত হয়নি।

হংকং বিমানঘাঁটি অদ্ভুত। প্রায় চারদিকেই পাহাড় আর নামতে হয় একদম সমুদ্রের উপকূলে। এই বিপদ সংকুল ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যে হংকং যদিও পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় বিমানঘাঁটি তবু এখানে কেবল দিনের আলোতে বিমানগুলো ওঠা-নামা করে। রাত্রে হংকং বিমানঘাঁটি থাকে ঘুমিয়ে। যেবার প্রথম হংকং যাই এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনালের অতিকায় “হিমালয়ান প্রিনসেস্” বিমানে তখনই লক্ষ্য করেছিলাম কি সতর্কতার সঙ্গে ভারতীয় পাইলট হংকং পাহাড়ের আনুমানিক মাত্র ৫০০।৬০০ ফিট ওপর দিয়ে এ-কাত ও-কাত করে বিমানটি নামিয়ে নিয়ে এলেন যেন সমুদ্রের মধ্যে। যোগ বিয়োগে একটু এদিক ওদিক হোলে রক্ষে নেই। বিমানঘাঁটি

বাড়াবার কাজও সহজসাধ্য নয়। হয় একদিকে গোটা পাহাড় ভেঙে নতুবা অন্যদিকে সমুদ্র বেঁধে কংক্রীটের সমতল মাঠ তৈরী করতে হবে। বেশ ব্যয়সাধ্য পরিকল্পনা। হয়তো হংকং এর ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই ইংরেজী ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র বিমানঘাঁটি পরিকল্পনায় উৎসাহ দেখাতে নারাজ।

জাপানের মত পূর্ব-এশিয়ায় হংকং হোল গোটা দুনিয়ার মধ্যে একটা মস্ত বড় মুসাফিরখানা। মূল চীন ভূখণ্ড থেকে পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠী পাততাড়ি গোটাবার পর থেকে এর সুনাম ও দুর্নাম বেড়ে গেছে অপ্রত্যাশিতভাবে। ইংরেজের উপনিবেশ, কিন্তু চীনের জায়গা; ঠিক গোয়া যেমন হোল পর্তুগীজ ঘাঁটি কিন্তু ভারতবর্ষের জমি। এর ভবিষ্যৎ কী এই নিয়ে কল্পনা জল্পনার শেষ নেই। কিন্তু সত্যি সত্যি এ বিষয় নিয়ে যাদের মাথা ব্যথা হওয়া উচিত তারা কিন্তু একান্তভাবে নির্বিকার। শুধু নির্বিকার বললে সব কিছু বলা হোল না। অপ্রত্যক্ষভাবে নানা ঘটনার মারফতে চীন যেন চাচ্ছে ইংরেজ হংকংএ থাকুক; অন্ততঃ বর্তমানে। চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই ভারতবর্ষ থেকে স্বদেশে ফিরতে—কী জন্যে কেউ জানে না—বিমান পথ ঘুরিয়ে নেমেছিলেন এই হংকং বিমানপোতে। বান্দুং কনফারেন্সর চীনা যাত্রী নিয়ে ভারতীয় বিমান এই পোত থেকেই যাত্রা করে মাঝপথে গিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। চিয়াং কাই-শেক প্রেরিত দূত সুযোগ নিয়ে এই হংকং বিমানপোতে অবস্থানকালে বিমানটির নলের অভ্যন্তরে পূরে রেখেছিল টাইম বোমা। অনেক হৈ চৈ হয়েছিল সে ঘটনার পর। কিন্তু তখনও হংকং এর ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো কথাই চীনের তরফ থেকে সরকারীভাবে জানান হয়নি।

হংকং এর ভৌগোলিক অস্তিত্ব বা রাজনৈতিক গুরুত্ব যতই সম্ভাবনাপূর্ণ হোক না কেন, চীনের সান্নিধ্যহেতু এর দৈনন্দিন সামাজিক জীবনযাত্রা যে কোনো ভবঘুরে সাংবাদিকের কাছে অতি আদরের

জ্ঞাতব্য বস্তু। হংকং ছেড়ে জাপানের মাটি ছুঁলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঔপনিবেশিক ও স্বাজাত্যাভিমানী শাসন-যন্ত্রের মূল পার্থক্যটুকু। অন্যদিকে আবার হংকং দেখলে, স্বদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরেও বিগত কালের ঔপনিবেশিক ধারা, অবিকলভাবে অথচ অনেকটা অজ্ঞাতসারে, কেমন করে চলে আসছে আজ তাও ধরতে পারা যায়।

জাপান দেশটা জাপানীদেরই। স্বদেশকে যতটা সম্ভব সুন্দর করে রাখা বা দেখানর আগ্রহ প্রতিটি জাপানী নিজ কর্তব্য বলে মনে করে। পোতে জাহাজ বা বিমান পেঁাছলে নতুন মুসাফির, খালাসী বা নাবিকের ছুটো রাত্রি কেবল হুল্লোড়ে কাটানর কি ব্যবস্থা আছে হংকং উপনিবেশে পেঁৗছলেই চোখে পড়ে। এটাই হোল হংকং, সিঙাপুর এমন কি কলকাতার ও বোম্বের বিশেষত্ব। ফেরিওয়ালা হংকংএর ফুটপাতেও বসে থাকে। তাদের সজাগ দৃষ্টি কিন্তু সর্বদা পড়ে আছে রাস্তার দূর কোণে। হঠাৎ মোবাইল পুলিশ ভ্যান আসতে দেখ্‌লে সাজান পণ্যগুলি তাড়াতাড়ি কাপড়ে বেঁধে অমনি ছুট দেবে যেমনি আমরা কলকাতার রাস্তায় হামেশাই দেখতে পাই। যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েও জাপানে এ দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় না। ফেরিওয়ালা, মুটেওয়ালা, রিক্সাওয়ালা ও দোকানদারদের দরদস্তুর দেখলে একটুও বুঝতে কষ্ট হয় না হংকং এবং কলকাতার সঙ্গে টোকিও এবং ওসাকার তফাৎ কোথায়।

হংকং এলাকা ৩৯১ বর্গমাইল জুড়ে বিস্তৃত। এর কেবল ১২ বর্গমাইল হোল মানুষের বসবাসের উপযুক্ত আর ৫০ বর্গমাইল চাষের জমি। বাকী পাহাড়ী অঞ্চল, চাষ বা বসবাসের অনুপযুক্ত। হংকংএর লোক-সংখ্যা ১৯৩৭ সালে ছিল ১,২০০,০০০ আর বর্তমানে চীনে রিফিউজিরা এসে পড়াতে সে সংখ্যা ডবলেরও বেশি হয়ে পড়েছে।

কিন্তু স্থানাভাব হোলেও হংকং-এর রিফিউজি পুনর্বাসন অনেকটা

সার্থকতার পথেই দেখলাম এবার। কেন এমন-টা সম্ভবপর হোল তার একটা কারণ এই যে হংকংএর উপনিবেশী শাসনতন্ত্র মানুষের জীবন নিয়ে অযথা হৈ চৈ করতে প্রশ্রয় দেয় না। তা' ছাড়াও কিন্তু আরও কয়েকটি বড় বড় কারণ আছে যেগুলো পুনর্বাসন কাজকে ভালভাবে সহায়তা করেছিল। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এ কারণগুলো প্রকাশ্যে স্বীকার করে থাকেন।

এ কারণগুলোর কোনোটাই কিন্তু চৈনিক সমাজ-জীবনে নবাগত নয়। হংকং কর্তৃপক্ষের মত হোল যে, রিফিউজি পুনর্বাসন সম্ভবপর হয়েছে কেবল হংকংএর শিল্পোন্নতির জন্যে এবং এ উন্নতি সম্ভবপর করে তুলল চীনে চাষী ও মজুরেরা তাঁদের কর্মদক্ষতা, অকাতর কর্মপ্রয়াস ও ব্যবসা-বুদ্ধি দিয়ে। এ তিনটেই চীনে রিফিউজিরা উত্তর চীন থেকে সাথে করে নিয়ে এসেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে উপনিবেশী কর্তৃপক্ষের দৃঢ়তা ছিল বলেই সব রকমের অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও হংকংএর রিফিউজি পুনর্বাসন সম্ভবপর হয়েছে। কোনো প্রকার তুলনা না করেও ভারতীয় অভিজ্ঞতার কথা মনে রাখলে হংকং কর্তৃপক্ষের বক্তব্য সহজেই মেনে নেওয়া যায়। পাঞ্জাবী বা সিন্ধুর রিফিউজিদের পুনর্বাসন অনেকটা সম্ভবপর হয়েছে কারণ তার পেছনে পাঞ্জাবীদের ঐ তিনটা গুন যে ছিল তা অনস্বীকার্য।

আজকেও হংকং বন্দরের যে কোনো বিন্দুতে দাঁড়ালে দেখতে পাওয়া যায় চীনা মজুরের কর্মপ্রীতির পরিচয়। সে ঠিক অবিকল সেই অবস্থায় কাজ করেই চলেছে যে অবস্থায় তাকে এই বন্দরেই কাজ করতে দেখেছিলেন গত শতাব্দীর শেষে এবং এ শতাব্দীর প্রায় গোড়ায় স্বামীজী ও রবীন্দ্রনাথ। হংকং বন্দরস্থিত নৌকার মেয়ে-পুরুষ মাঝি-মাল্লা চারদিককার দুনিয়া অগ্রাহ্য করে হাল্ মেরে ছোটে আজও যন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। অবশ্য গত শতাব্দীর পুরুষের মাথার বেণী আর মেয়ের জোর করে ছোট-করে-রাখা পদদ্বয় অবশ্য

আর দেখতে পাওয়া যায় না। তবে আজও চীনা-শিশু মায়ের পিঠে বন্ধন অবস্থাতেই সেই ছোট্ট নৌকার ওপর থেকেই পৃথিবীর সঙ্গে প্রথম পরিচয় লাভ করে থাকে যা' দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন ভারতবর্ষের সন্ন্যাসী।

এই দুই দিকপালের দেওয়া চীনের মানুষের প্রথম পরিচয়টুকু আর তার সঙ্গে জুড়ে থাকা মন্তব্যটুকু কত স্নিগ্ধ!

হংকং সম্পর্কে স্বামীজী লিখেছেন তাঁর মাদ্রাজী শিষ্যের কাছে ঃ

ঐ স্থানে আসিলে মনে হয়, চীনে আসিয়াছি। চীনের ভাব এখান হইতেই এত অধিক! সকল কার্য্য সকল ব্যবসা বাণিজ্য বোধ হয় তাহাদেরই হাতে, আর হংকংই আসল চীন; যাই জাহাজ কিনারায় নজর করে, অমনি শত শত চীনা নৌকা আসিয়া ডাঙ্গায় লইয়া যাইবার জন্য তোমায় ঘিরিয়া ফিরিবে। এই নৌকাগুলি একটু নূতন রকমের— প্রত্যেকটিতে ২টি ২টি করিয়া হাল। মাঝিরা সপরিবারে নৌকায় বাস করে। প্রায়ই দেখা যায়, মাঝির স্ত্রীই হালে বসিয়া থাকে, একটি হাল দুই হাত দিয়া ও অপর হাল এক পা দিয়া চালায়। আর অনেক সময় দেখা যায়, তাহার একটি কচি ছেলে পিঠে একপ্রকার নূতন রকমের থলিতে বাঁধা থাকে, যাহাতে সে হাত পা অনায়াসেই খেলাইতে পারে। এ এক দেখতে বড় মজা। এ দিকে চীনে-খোকা মায়ের পিঠে বেশ শান্তভাবে নড়ছে চড়ছে; ওদিকে মা কখন তাঁর যত শক্তি সব প্রয়োগ করে নৌকা চালাচ্ছেন, কখন ভারী ভারী বোঝা ঠেলছেন অথবা অত্যদ্ভুত তৎপরতার সহিত এক নৌকা থেকে অপর নৌকায় লাফিয়ে যাচ্ছেন। আর এত নৌকা ও ষ্টিম-লঞ্চের ভিড় ক্রমাগত আসছে যাচ্ছে! প্রতি মুহূর্তে চীনে খোকার টীকি সমেত ছোট মাথাটি একেবারে গুঁড়ো হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। খোকার কিন্তু সেদিকে খেয়ালই নাই। তার পক্ষে এই মহাব্যস্ত কর্ম্ম-জীবনের যেন কোন আকর্ষণ নাই। তার পাগলের মত ব্যস্ত মা মাঝে মাঝে তাকে দু একখানা পিঠে দিচ্ছেন, সে ততক্ষণ তার আলোচনা করেই সন্তুষ্ট।

চীনে খোকা একটি রীতিমত দার্শনিক। যখন ভারতীয় শিশু হামাগুড়ি দিতেও অক্ষম, এমন বয়েসে সে স্থিরভাবে কার্য্য করিতে চায়। সে

বিশেষভাবেই অভাবের দর্শন শিখিয়াছে। চীনা ও ভারতবাসী যে সভ্যতা সোপানে একপদও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, দরিদ্রের অতি দারিদ্র্যই তাহার এক কারণ। সাধারণ হিন্দু বা চীনবাসীর পক্ষে তাহার প্রাত্যহিক অভাবই এত ভয়ানক যে, তাহার আর কিছু ভাবিবার অবসর দেয় না।

...আমরা বৈকালে একখানি জাহাজে চড়িয়া পরদিন প্রাতে ক্যাণ্টনে পঁহুছিলাম। কি হৈ চৈ! কি জীবনের চিহ্ন! নৌকার ভিড়ই বা কি! জল যেন ছেয়ে ফেলে দিয়েছে।

প্রায় পঁচিশ বছর পরে হংকং বন্দরে উপস্থিত হোলে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল ঠিক ঐ একই বিন্দুতে। হংকংএর আর কিছুই এ দিকপালদের চোখের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি যেমন পেরেছিল চীনে মানুষগুলো।

প্রথমেই চোখে পড়ল জাহাজের ঘাটে চীনা মজুরদের কাজ। তাদের একটা করে নীল পায়জামা পরা এবং গা খোলা। এমন শরীরও কোথাও দেখি নি, এমন কাজও না। একেবারে প্রাণসার দেহ, লেশমাত্র বাহুল্য নেই। কাজের তালে তালে সমস্ত শরীরের মাংসপেশী কেবলই ঢেউ খেলাচ্ছে। এরা বড় বড় বোঝাকে এমন সহজে এবং এমন দ্রুত আয়ত্ত করছে যে সে দেখে আনন্দ হয়। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোথাও অনিচ্ছা অবসাদ বা জড়ত্বের লেশমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না। বাইরে থেকে তাদের তাড়া দেবার কোনো দরকার নেই। তাদের দেহের বীনাযন্ত্র থেকে কাজ যেন সংগীতের মতো বেজে উঠেছে। জাহাজের ঘাটে মাল তোলা-নামার কাজ দেখতে যে আমার এত আনন্দ হবে, একথা আমি পূর্বে মনে করতে পারতুম না। পূর্ণ শক্তির কাজ বড়ো সুন্দর; তার প্রত্যেক আঘাতে আঘাতে শরীরকে সুন্দর করতে থাকে, এবং সেই শরীর ও কাজকে সুন্দর করে তোলে। এইখানে কাজের কাব্য এবং মানুষের শরীরের ছন্দ আমার সামনে বিস্তীর্ণ হয়ে দেখা দিলে। এ কথা জোর করে বলতে পারি, ওদের দেহের চেয়ে কোনো স্ত্রীলোকের দেহ সুন্দর হতে পারে না। কেননা শক্তির সঙ্গে সুষমার এমন নিখুঁত সংগতি মেয়েদের শরীরে নিশ্চয়ই দুর্লভ। আমাদেরই জাহাজের ঠিক সামনেই আর একটা জাহাজে বিকেলবেলায় কাজ কর্মের পর সমস্ত চীনা মাল্লা

জাহাজের ডেকের উপর কাপড় খুলে ফেলে স্নান করছিল; মানুষের শরীরে যে কী স্বর্গীয় শোভা তা আমি এমন করে আর কোনদিন দেখতে পাইনি।

(জাপান-যাত্রী, রবীন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠা ৬৬)

রবীন্দ্রনাথ চৈনিক মানুষের প্রথম পরিচয় দেবার সঙ্গে সঙ্গে হৃতচিত্তে স্ব-সমাজের ওপর যে মন্তব্যটুকু রেখে গেছেন তাঁর পরবর্তিদের অনুধাবনের জন্যে, তা' পড়লে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হতে হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বাধীন ভারতবর্ষ দেখে যান্ নি, কিন্তু আজও কি তাঁর সেই চল্লিশ বছরের পুরনো মন্তব্যের কোনো ব্যতিক্রম হয়েছে ভারতবর্ষের সমাজ দেহের কোনো অঙ্গে?

এদের মেয়ে পুরুষ ছেলে সকলে মিলে কাজ করবার এই ছবি দেখে আমার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। ভারতবর্ষে এই ছবি কবে দেখতে পাব? সেখানে মানুষ আপনার বারো আনাকে ফাঁকি দিয়ে কাটাচ্ছে। এমন সব নিয়মের জাল, যাতে মানুষ কেবলই বেধে বেধে গিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে প'ড়েই নিজের অধিকাংশ শক্তির বাজে খরচ করে এবং বাকি অধিকাংশকে কাজে খাটাতে পারে না—এমন বিপুল জটিলতা এবং জড়তার সমাবেশ পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

(জাপান-যাত্রী, রবীন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠা ৬৮-৬৯)

পথিকৃত বিবেকানন্দ আরও জোরাল ভাষায় তাঁর ভর্ৎসনা জানিয়ে গেছেন তাঁর মাদ্রাজী শিষ্যদের নিকটে লিখিত পত্রের মারফৎ।

আর তোমরা কি কচ্চো? সারা জীবন বাজে বকচো। এস এদের দেখে যাও, তারপর যাও গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোওগে।

(পত্রাবলী)

চীন-সীমান্তে যেতে হংকংএর পথের দু'ধারে প্রথমবারে দেখেছিলাম সেই দৃশ্য যা কলকাতা ও শহরতলীতে এখনও দেখা যায় হামেশা। ছেড়া কাপড়, চট, ভাঙা টিন আর পাথর খণ্ড দিয়ে পাহাড়ের গায়ে বানান কুঁড়ে ঘর আর তার মধ্যে বাস করছে চীনা

রিফিউজিরা। দ্বিতীয়বার যখন এলাম তখন দেখলাম অগ্নিদেবের কৃপায় সে সব রিফিউজি কলোনী একের ওপর একটি করে হয়েছে ভস্মীভূত, আর সেখানে উঠেছে পাকা সুউচ্চ বিরাট বাড়িঘর যার প্রতিটি ঘরে বসবাস করছে স্বতন্ত্র ভাবে চীনা রিফিউজি পরিবার। এক জাত, এক ভাষা একই সামাজিক আবহাওয়ায় তারা মানুষ ; সে জন্যে এসব বাড়িতে—বারো রাজপুতের তের হাঁড়ির মত—দরকার হয়নি স্বতন্ত্র স্নান বা সৌচাগার প্রতিটি পরিবারের জন্যে। কলকাতার এক-ঘরো ব্যারাকগুলোতে এমনকি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা থাকলেও তা জনপ্রিয় হতে পারছেনা সেই সনাতন আচার ধর্মের সঙ্গে কাল ধর্মের মধ্যে কোনো আপোষ না আনবার অক্ষমতা হেতু। এসব ঘরে বসবাস করতে রিফিউজিদের—জবর দখলের ব্যবস্থা নেই হংকংএ—ভাড়া দিতে হয় প্রতি মাসে এবং সে ভাড়ার রেটও কলকাতার বাড়ি ভাড়ার রেট থেকে তুলনায় কম নয়। প্রতিটি ঘরের জন্যে দিতে হয় ভারতীয় মুদ্রায় দশ টাকা।

প্রায় দশ লক্ষ রিফিউজি এসে পড়েছিল ছোট্ট হংকং এলাকায়। এদের মধ্যে এখনও আড়াই লক্ষের পুনর্বাসন হয়নি, তবে হবার পথে। এত লক্ষ লক্ষ নর-নারীর কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়াই হয়েছিল প্রধান সমস্যা। কিন্তু চীনা মজুরের কাজ করবার আকাঙ্ক্ষা ও কৌশল এবং কর্তৃপক্ষের সে সুযোগ বুঝে বিধি ব্যবস্থা করাতে হংকং-এর চীনা রিফিউজি আজ হয়ে পড়ছে হংকংএর সমৃদ্ধি-বৃদ্ধির প্রধানতম সহায়ক। রিফিউজিরা যে সকলেই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছে তা নয় কিন্তু কর্তৃপক্ষেরা মনে করেন যে সকলেই কিছু না কিছু রুজী রোজগারে সমর্থ।

সব দেখে শুনে মনে হোল হংকংএর রিফিউজি পুনর্বাসনের কাজ রিফিউজিদের সাহায্যেই হয়েছে সার্থক। কিন্তু ভবিষ্যতে সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে রাজনৈতিক কারণে। সামাজিক

জীবনের প্রতিবন্ধক নয় বলেই চীনে রিফিউজিরা অতি স্বাভাবিক ভাবেই বিরাট বিরাট ব্যারাকের সমষ্টিগত স্নানের বা সৌচের বা বসবাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পেরেছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষদের কাছে এসব রিফিউজিদের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা জানবার বিষয় হয়নি। হয়তো অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যে তারা ভবিষ্যতে ভুলেও যেতে পারে রাজনৈতিক দলাদলির কথা, হয়তো বা বাইরের প্রভাবে সে দলাদলি আরও দানা বেঁধে উঠতেও পারে। সে দলাদলি যদি কোনোদিন উগ্র হয়ে ওঠে এবং এসব ব্যারাকের প্রতি ঘরে ঘরে বা প্রতি ফ্লাটে ফ্লাটে থাকতে দেখা যায় বিভিন্ন দলের প্রাধান্য তাহোলে আসবে এমন এক পরিস্থিতি বা ভয়াবহ অবস্থা যা কল্পনা করলেও শিউরে উঠতে হয়।

হংকং হোল বাজার, কেনা বেচার জায়গা, সে পণ্য শ্রমই হোক বা দ্রব্যই হোক। এখানে শাসন আছে, নিয়ম আছে, সম্বন্ধ-বোধ নেই। টোকিও হোল জাপানীদের রাজধানী, বাজার নয়। টোকিও দেখলে যেমন গোটা জাপানকে আঁচ করা যায়, হংকং এমন কি বোম্বে দেখলে চীনা বা মারাঠী বা গুজরাটী সমাজের রূপ তেমনভাবে ধরা যায় না।

কিন্তু তাই বলে হংকংএ কেনা বেচা ছাড়া আর কিছু হয় না বললে অত্যুক্তি হবে। হংকংএ আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রচ্ছন্ন ঢেউ সর্বদাই প্রবহমান। সে ঢেউ বাইরে বিশেষ উছলে না পড়লেও কোনো সাংবাদিক তার সংস্পর্শ এড়াতে পারেন না। দু'দুবার হংকং এসে এ রাজনীতির রূপটা দেখতে চেষ্টা করেছি। এও হোল উপনিবেশী ধরণ। বিমানঘাঁটি ছেড়ে হোটেলে যেতে রাস্তার একই পাশে মাত্র কয়েকখানা বাড়ির ব্যবধানে উড়তে দেখেছি কম্যুনিষ্ট চীনের ও চিয়াং চীনের স্বতন্ত্র নিশান। ফ্রাঙ্ক মোরেসকে দুটো নিশানই দেখিয়ে বলেছিলাম—প্রায় প্রফেটের মত—যে ভারতবর্ষের কংগ্রেস ও মোসলেম লীগের বিরোধের মত

হংকংএও দাঙ্গা হাঙ্গামা একদিন ঘটবেই। ভারতবর্ষে উপনিবেশী চক্রান্তে সে বিরোধ রূপ নিয়েছিল ধর্মের খোলস পরে, আর হংকংএ নেবে রাজনৈতিক ইজ্‌মের আবরণে। এ হাঙ্গামা ঘটেছিল।

হংকংএ পসার প্রতিপত্তিশালী সিন্ধী ও পারসী বণিক বেশ কিছু আছেন। আর তাঁদের সঙ্গে জুড়ে বসে আছে পুলিস ও দরওয়ানের কাজে নিযুক্ত পাঞ্জাবী শিখ ও মুসলমান। এও উপনিবেশী শাসনের একটা বিশিষ্ট রূপ। এক দেশ বা এক প্রদেশ থেকে মানুষ আমদানি করে অন্য দেশের বা প্রদেশের ব্যবসা বাণিজ্য বা শাসনযন্ত্র কুক্ষিগত করে রেখে, তাদের ঘাড়ে চড়ে শাসন-যন্ত্র চালনা করা উপনিবেশী তন্ত্রের গোড়ার কথা। কয়েকজন সিন্ধী বণিকের সঙ্গে পরিচয় লাভের সৌভাগ্যও হয়েছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়াতে তাঁদের ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে অনেক সুবিধেই হয়েছে; কিন্তু এঁরা ব্যবসাই জানেন, রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় পান নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যখন হংকং জাপানীদের হাতে এসে পড়েছিল তখন তাঁরা কী করেছিলেন?—এই প্রশ্নটি করলাম। সোজা উত্তর এল—কেন, জাপানীদের সঙ্গে ব্যবসা করেছি? ঐ দেখুন ঐ যে বড় বাড়িটা দেখা যাচ্ছে ওখানে জাপানী ফৌজ থাকত, আর এই দোকান থেকে তাদের কাপড় চোপড়, ইউনিফরম্ সাপ্লাই দিয়েছি—বললেন একজন সিন্ধী বণিক তার দোকানের অদূরে একটি বাড়ি দেখিয়ে। জাপানী সামরিক বিভাগের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করে বেশ একটা মোটা টাকার অঙ্ক তাদের খাতায় জমা হয়েছে। এদের সমগোত্র সিন্ধী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে জাপানের কোবে ও নিকোয় পরিচয় হয়েছিল। তাঁদের জীবনযাত্রাও চলেছিল একই ধারায়।

কথার মোড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেসা করলাম, ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে যাবার পর স্বদেশের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ কি নতুন রূপ নিয়েছে?

উত্তর যা পেলাম তা অবিশ্বাস্য। তাঁদের দলপতি বিশেষ কোনো একজন বণিকের নাম করে বললেন যে, তিনি ভারতীয় জাতীয়তা স্বীকার করতে রাজী হননি, যদিও ভদ্রলোক বোম্বেতে ফিরে আসবেন বলে মনস্থির করেছেন। জিজ্ঞেসা করলাম—কেন? এবার উত্তর পেলাম: বোম্বেতে প্রহিবিশন আছে অতএব ভারতীয় হয়ে নাম লেখালে যথা ইচ্ছা পান্-পিপাসা মেটাতে বাধা পেতে হবে; কাজেই তিনি ইংরেজ ঔপনিবেশিক নাগরিক বলে নিজেকে জাহির করবেন বলে ঠিক করেছেন।

কেবল সিন্ধী বা পারসী নয় অন্যান্য জাতের এমন কি চীনেরা, বিশেষতঃ দোআঁশলা চীনেরা, হংকংএ থাকেন একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে—সে উদ্দেশ্য হোল ব্যবসা। এই কারবারী ব্যবসা-বাণিজ্য হংকং বন্দরের একমাত্র প্রাণস্পন্দন। এর শ্বাস প্রশ্বাসের বায়ু আমদানী রপ্তানীর সৌরভে ভরপুর। বারাণসীর ঘাট ও মন্দির দেখলে যেমন কাউকেই বলে দিতে হয় না, তার প্রাণের সাড়া কোত্থেকে আসে, তেমনি হংকংএর বিশাল জাহাজঘাঁটি, জলপথে নৌকা চলাচল ও বিরাট বিরাট পণ্যের গুদাম, কর্মচঞ্চল এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি এবং পথে পথে দুনিয়ার মুদ্রা বিনিময়কারী দোকানের ছড়াছড়ি দেখলে কাউকে বলে দিতে হয় না হংকংএর কর্মব্যস্ত জীবনে মুনাফা ধরবার উদ্দেশ্য কতখানি জায়গা জুড়ে আছে।

হংকং যে চীনের ভূখণ্ড, শহরের মাঝে ততোটা ধরা পড়ে না, যা পোতাশ্রয় ছাড়লে এবং মূল চীনা ভূভাগের দিকে মোটরে বা রেলে এগোলে বুঝতে পারা যায়। হংকং থেকে সোজা রেলপথে ক্যান্টন যাওয়া যায়, আর মোটরে চীন-সীমান্ত পর্যন্ত। সীমান্ত ঠিক করে দিয়েছে একটা ছোট্ট নদী, নাম তার সামচুন। সামচুনকে নদী না বলে জোয়ারের খেড়ি বললেই হয়। কলকাতার বেলেঘাটার খালও বোধ হয় এর চেয়ে ছোট নয়। হংকংএর ১৭ মাইল দীর্ঘ সীমান্তের প্রায় ১২ মাইলই হোল এই প্রকৃতিদত্ত

সীমানা, সামচুন। এ ছাড়া বাকী পাঁচ মাইলের সীমান্ত চলেছে জমি ও পাহাড়ের ওপর দিয়ে। সীমান্ত পারাপারের এবং বাণিজ্যিক আদান প্রদানের জন্যে গোটা ছয়েক সেতু আছে দুই অঞ্চলের মাঝে। অবশ্য আরও অনেক রন্ধ্রপথ আছে, তবে সে সব পথে কেবল বে-আইনী ব্যবসাই চলে থাকে।

হংকংএ বেড়াতে এলে এই চীনা সীমান্ত দেখা সব চেয়ে বড় আকর্ষণ হয়ে পড়ে। সিন্ধী বণিক-বন্ধু বারবার অনুরোধ জানালেন সীমান্ত দেখবার জন্যে এবং তাঁর বিরাট মোটরকার ছেড়ে দিলেন আমাদের জিম্মায়। সাংবাদিক বন্ধু নরমান্ স্নুংএর মারফতে সীমান্ত দেখবার অনুমতিও পেলাম অতি সহজে হংকংএর ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। সীমান্ত দেখে যখন ফিরেছি তখন মনে মনে ধন্যবাদ দিয়েছি সিন্ধী বন্ধুকে। যদি তাঁর কথামত চীন-সীমান্ত না দেখতাম তবে হংকংএ যাওয়াই অসম্পূর্ণ থাকত।

আন্তর্জাতিক সীমান্ত অঞ্চল মাত্রই সাংবাদিকের অতি আকর্ষণের বিষয়। কারণ বর্তমান দুনিয়ার সাংবাদিক জীবটী হোল সেই রামচন্দ্রের দূত দুর্মুখ ও পুরোহিত বশিষ্টের খাঁটি মানসপুত্র। একাধিক রাষ্ট্রের নিজ নিজ বিধি নিয়মের বৈশিষ্ট্যে এসব অঞ্চল থাকে অধ্যুষিত, অতএব সাংবাদিক তার পেশার খোরাক এখানে পান অতি সহজে ও অকুণ্ঠভাবে। তার পর কৌতূহলী দুনিয়ার কাছে বর্তমান চীন শাসনতন্ত্র ও রাষ্ট্রের নায়কদের দৃষ্টিভঙ্গী সব সময়ের জন্যেই নতুনত্বের দাবী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ও সহজ-সাধ্য নয় এবং সেজন্যেই অতি কাম্য। তাই সীমান্তের পাড়ে দাঁড়িয়ে চীনদেশকে দেখবার জন্যে আপামর এদের সকলেরই এত আগ্রহ। সর্বোপরি হংকংএ রাত্রি কাটালে সামচুন পাড়ের নিছক আজগুবি গল্পগুলো যে কোনো সাংবাদিককে আফিংএর নেশার মত পেয়ে বসে। কালিম্পংএ প্রতি ঘরে ঘরে মুসাফিরকে তাঁতাতে যেমন গুঞ্জন ওঠে,—সে গুঞ্জন নিছক গালগল্প হোক বা অভিসন্ধিমূলকই হোক—

ঠিক তেমনি হংকং-প্রবাসী সাংবাদিক-মুসাফিরকে এ গল্পগুলো ঠেলে নেয় সামচুন নদীর পাড় দেখবার আগ্রহে।

অথচ এই সীমান্তে রোমহর্ষক কিছু আশা করে যদি কোনো মুসাফির যান তবে একান্তই নিরাশ হবেন। স্বদেশে যতগুলো নতুন বা পুরনো সীমান্ত অঞ্চল দেখেছি তাদের যে কোনোটির তুলনায় চীন-হংকং সীমান্ত হোল অত্যন্ত শান্ত ও বৈচিত্র্যহীন। তবুও অপরাপর যে কোনো সীমান্ত অপেক্ষা এ সীমান্ত সংবাদ-সৌরভে সবদিক দিয়ে ভরপুর। এর সঙ্গে পরিচয় লাভের আগ্রহের যেন নিবৃত্তি নেই।

হংকং থেকে বিদেশীদের এই সীমান্ত পাড়ে যাওয়া নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার নয়। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয় সীমান্তে যাবার অনুমতি-পত্র যোগাড় করতে। কারণ সীমান্তে বিদেশীদের ঘোরাফেরা করতে দেওয়া সম্পর্কে হংকংএর ব্রিটিশ পুলিশ অত্যন্ত সতর্ক। হংকং শহর ছেড়ে একটির পর একটি ঘাঁটিতে অনুমতিপত্র দেখিয়ে ও জবাবদিহি করে আমরা যখন উপস্থিত হোলাম শেষ তাই পো পুলিশ ষ্টেশনে তখনই বুঝতে পেরেছিলাম অবস্থা কী ধরণের। সেখানে অনুমতিপত্র দেখালে থানার আইরিশ পুলিস ইন্সপেক্টরের নেতৃত্বে চলল আমাদের গাড়ীর আগে আগে এক জীপ বোঝাই সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী হংকংএর সর্বশেষ গ্রাম লউউতে। গ্রামটি রয়েছে পাহাড়ের ঢালুতে, বাইরে থেকে এর অবস্থান ঠাহর করাই কঠিন। পাশেই রেলওয়ে ষ্টেশন নদীর পাড়ে।

গ্রামের রাস্তার ধারে জীপ ও মোটর গাড়ী রেখে আমরা হাঁটতে আরম্ভ করলাম ষ্টেশন বরাবর। আমাদের সামনে ও পেছনে চলেছে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী বন্দুক উঁচিয়ে ঠিক মিলিটারী কায়দায়। তাদের হাতের তর্জনী রয়েছে রাইফেলের ঘোড়ার ওপর; যেন কোনো শত্রু-অধ্যুষিত এলাকার মধ্যে আমরা এসে পড়েছি। সত্যি কথা বলতে কি বেশ অস্বস্তি বোধও করছিলাম। চীনের সঙ্গে প্রথম

সাক্ষাৎকার যে এইভাবে ঘটবে তা কল্পনাও করিনি। কোনো কিছু বিপদের আশঙ্কাও তো কোথাও দেখলাম না! চারদিকেই অতি শান্ত পরিবেশ! তবুও এ ব্যবস্থা কেন? আমাদের মোটরের ড্রাইভার হংকংএর চীনা বাসিন্দা; তার বোধ হয় চীন সীমান্ত দেখবার সৌভাগ্য এতদিন হয়নি তাই সে দলের পেছনে পেছনে এগোচ্ছে আমাদেরই সঙ্গে। শেষবার অনুমতি পত্রখানা বের করে ইন্সপেক্টর দেখে নিলেন দলটাকে ও আমাদের ড্রাইভারকে বলে দিলেন সে যেন দলের সঙ্গে না এগোয়। কারণ অনুমতি পত্রে মোটর ড্রাইভারের কোনো উল্লেখ নেই। আইন কানুনের খুঁটিনাটি নিয়ে কড়া তদারক করা হংকং সীমান্তের বৈশিষ্ট্য।

সামচুন পাড়ে হংকংএর অতি সাধারণ রেলওয়ে ষ্টেশন। পূর্বের মত এখনও হংকং ও মূল চীন ভূখণ্ডে যাতায়াত করতে গেলে এই সীমান্ত ষ্টেশনটিতে যাত্রীদের ও তাদের মালপত্তর পরীক্ষা হয়। যখন রেলগাড়ী এসে পড়ে তখন ষ্টেশনটি মুখরিত হয়ে ওঠে। অন্য সময়ে ষ্টেশনটি থাকে জনকয়েক ষ্টেশন ষ্টাফের তদারকে। সত্যিকারের সীমান্ত রেখাটি চলেছে সামচুন নদীর অপর পাড় দিয়ে আর সেই রেখার পেছনে ইস্পাতের টুপি প'রে ও বুকের উপর ষ্টেনগান ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চীনা শান্ত্রী। অপর পারে ও অদূরে দেখলাম বিশাল পোষ্টার চীনা ভাষায় যাত্রীদের সাবধান করে দিচ্ছে এ-পারের ভিন্‌দেশীয় এলাকার কথা। চীনা শান্ত্রীদের পেছনে ৩০০।৪০০ গজ দূরে একটা ছোট পাহাড়ের মাথায় রয়েছে চীনা শান্ত্রীদের ছাউনি। আরও দূরে চীনা ভূখণ্ডে দেখতে পেলাম একটা গণ্ডগ্রাম; গ্রামের লোকের আনাগোনাও চোখে পড়ল।

চড়ে পড়লাম ব্রীজের ওপর। সামনে ও পেছনে চলেছে হংকং-এর সশস্ত্র পুলিশ। ব্রীজের প্রায় সবটাই হংকংএর এলাকাভুক্ত। মাঝখানে এলে পুলিশ আর এগোল না, ফলে আমাদের গতি হোল স্তব্ধ। এরা কি পাছে কেউ ছুটে ওপারে চলে যায় তার

জন্যেই করে রেখেছে এত কড়াকড়ি ব্যবস্থা? চীনা শান্ত্রী একঠায় একই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে, অপলক তার দৃষ্টি। কিন্তু সে-দৃষ্টি মনে হোল একেবারে উদাস। হংকং-এর পারে কী ঘটছে বা না ঘটছে সে দিকে যেন কোনো খেয়ালই নেই তার।

অপরাহ্ণ প্রায় আগত, একটু পরে সীমান্ত পারাপার বন্ধ করে দেওয়া হবে। রোজই বেলাবেলি সাড়ে পাঁচটায় সীমান্ত দুদিক থেকে নীরব হয়ে যায়। দেখলাম চীন ভূখণ্ডের যে সব চীনা-চাষীদের জমি আছে সামচুনের এপারে হংকংএর এলাকায়, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্রাম করছে রেলের লাইনের ধারে। রোজই তাদের আসতে হয় ক্ষেতের তদারক করতে, সীমান্ত পার হয়ে। নিড়েনি, কাস্তে, মাথাল হাতে করে কেউ কেউ বা ব্রীজ পার হয়ে চলেছে খাস চীনে, নিজ নিজ গাঁয়ে। অবিকল ভারতবর্ষের যে কোনো পাড়াগাঁয়ের ছবি! বর্ষা সবে শেষ হয়েছে, এখন ওদের হাতে কাজ প্রচুর।

চোখের সামনে দেখলাম চীনা চাষীরা দুএকজন করে কাঁটাতারের বেড়া পার হয়ে পৌঁছচ্ছে চীনা মাটিতে। তাদের পরীক্ষা হোল যৎ-সামান্য। নাড়ীনক্ষত্র যাচাই করে নেবার ব্যবস্থা যেন তাদের বেলায় নেই। কেবল সীমান্ত-রেখা পার হবার সময় পাহারারত শান্ত্রীকে দেখাতে হচ্ছে একখানা কার্ড। মুখে কোনো পক্ষেরই বাক্যব্যয় করতে হচ্ছে না। সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়া হলেই হোল।

লউউ থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে ওই একই নদীর পারে মানকুম্‌তো গ্রামে আছে আর একটি সীমান্ত ঘাঁটি, সেটিও দেখলাম। লউউ-এর মত এখানেও রয়েছে পারাপারের ব্রীজ। এটী রেলপথ নয়। ব্রীজটীও নতুন। এর পাশে পুরনো ব্রীজের ভাঙা লোহার হাড় পাঁজড়া পড়ে আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যখন জাপান হংকং কেড়ে নেয় তখন ব্রীজটা বোমা দিয়ে ভেঙে ফেলেছিল আবার হংকং অধিকার করবার পর যখন চীনা ভূভাগের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবার প্রয়োজন বোধ করল তখন তারাই এই নতুন ব্রীজটা তৈরী

করেছিল। সেই জাপানী ব্রীজটাই এখন মানকুম্‌তোর যাতায়াতের একমাত্র সড়ক।

লউউ অপেক্ষা মানকুম্‌তো দেখলাম অধিকতর কর্মমুখর। চীনা শ্রমিকেরা বিরাট বিরাট বস্তা-ভরা তরি-তরকারী, সবজি, ডিম, মুরগী নিয়ে আসছে ভূখণ্ড থেকে হংকংএ চালান দিতে। সীমান্ত পারাপার বা মাল দেখাশুনো নিয়ে যে খুব কড়াকড়ি দৃষ্টি হংকংএর দিকে আছে তাও মনে হোল না। সীমান্ত এখনই বন্ধ হয়ে যাবে তাই চলেছে মাল পৌঁছে দেবার তাড়া। নতুন ব্রীজের উপর চড়ে পড়েছি। এখানেও সীমান্তরেখা চলেছে নদীর খাস চীনের পার দিয়ে। চারদিকের দৃশ্যটা একেবারে গ্রাম্য। রেলপথ নেই বলেই বোধ হয়। চীনের ক্ষেত দিগন্ত ঘিরে রয়েছে। আর তারই মাঝে এসেছে পথ ব্রীজের দিকে। বলদ আর বলদের গাড়ী বোঝাই করে আসছে নানাবিধ আনাজ, ঠিক যেন বাঙলাদেশের শহরের প্রান্তে যে কোনো হাটে চলেছে চীনা চাষী।

চীনা শান্ত্রী যেমনটি দেখছি লউউতে সেই একই ভঙ্গীমায় এখানেও দাঁড়িয়ে আছে। তবে তার দৃষ্টিতে দেখলাম কিঞ্চিৎ নতুনত্ব, সে দৃষ্টি উদাসীন নয়। একদৃষ্টিতে সে শান্ত্রী তাকিয়ে আছে আমার মাথার ওপর গান্ধীটুপির দিকে। মানকুম্‌তো আন্তর্জাতিক খ্যাতি পায়নি বলেই হয়তো কদাচিৎ বিদেশীরা এখানে এসে থাকেন, সেইজন্যেই এই গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে চীনা শান্ত্রী নতুন চেহারার ছাপ বা নতুন পোষাকের ব্যবহার পূর্বে দেখেনি; অথবা হয়তো গান্ধীটুপি কাদের মাথায় স্থান পেয়ে থাকে সে তা জানেও বা। চীনা শ্রমিকদের আনাগোনায় সে যেন ভালভাবে লক্ষ্য করতে পারছিল না আমাকে। তার কৌতূহল উদ্রেক হয়েছে প্রচুর এবং সেজন্যে ঘাড় একবার এদিকে আর একবার ওদিকে নিচ্ছে যাতে আমার গান্ধীটুপি সে ভালভাবে দেখতে পায়। অনুমান করলাম তার চোখের ভাষা এবং ব্রীজের

ওপর দিয়ে আর একটু এগিয়ে দাঁড়ালাম প্রায় সামচুনের মাঝে। এবার সে সোজাসুজি দেখতে পেল আমাকে। চোখ-জোড়ার দিকে তাকিয়েই আছি। তার অভ্যাশ বশে তখনও দেখলাম হাতের আঙুল ষ্টেন-গানের ঘোড়ার ওপর পড়ে আছে। কিন্তু চাউনিতে নতুন কোনো ইঙ্গিতের সন্ধান তো পেলাম না, তবে মনে হোল ওর চোখ-জোড়া যেন পরিতৃপ্ত হয়েছে।

সীমান্ত ঘাঁটির রেজেষ্ট্রীতে নাম সই করতে পাতা উল্‌টে যাচ্ছি। দেখলাম এখানে কেবল একজনই ভারতীয় মুসাফির—বাঙালী সাংবাদিক—এসেছিলেন। হয়তো তিনি ছিলেন সম্পূর্ণভাবেই বিজাতীয় পোষাকে আবৃত তাই চীনা শান্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেননি।

আইরিশ পুলিশ ইনস্‌পেক্টরকে ধন্যবাদ জানিয়ে সীমান্ত থেকে বিদায় নেবার আগে সামচুন নদীর দু'ধারে আবার চোখ ফেরাই। যেমন হংকংএর পারে ঠিক তেমনি খাস চীনের পারেও বিস্তৃত রয়েছে শ্যামল শস্যক্ষেত্র—মানুষের শ্রমের দান। নদীর আর খালের জোয়ারের জল সবে নেমে গেছে, পড়ে আছে পলি-মাটির কাদা জল। তার মাঝে জলক্রীড়ারত চীনা বালকেরা। খেলায় এমন মত্ত তারা যে দু'এলাকার মাঝে বিরাট অদৃশ্য দেয়াল প্রতিক্ষণে তাদের জীবনকে দুই বিপরীত দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে তা তাদের গ্রাহ্য করার কথা নয় যেন। প্রশ্ন করলাম মনে মনে—এই দেয়াল যদি না থাকত তবে কি তাদের জীবনে কোনো নতুন পরিবর্তন দেখা যেত? কর্ম্মমুখর সামচুন পারে সকলেই দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যস্ত। কোনো আদিম প্রশ্ন নিয়ে মাথা ব্যথা করবার তাগিদ নেই তাদের। কিন্তু যখন সে প্রশ্ন উঠবে—উঠবেই একদিন—সেদিন কি আজকের মত পথের ধারে জলক্রীড়ারত ছেলেমেয়েগুলোকে এমনিভাবে দেখতে পাওয়া যাবে?

দু' বাঙলার মধ্যে আসা-যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পাকিস্তানের

সরকার একদা অত্যন্ত আগ্রহ দেখালেন। যথোচিত বিধি ব্যবস্থা চালু হোল দু' তরফেই, একই সময়ে, একদিনে। সেই কাল্‌সন্ধ্যায় দাঁড়িয়েছিলাম বানপুরের আধ মাইল দূরে লউউ-এর থেকেও ছোট একটা রেলওয়ে ব্রীজের এ পারে যেখানে পশ্চিম বাঙলার এলাকা হয়েছে শেষ। সূর্যাস্ত হয় হয়, কোন্ অজানা আতঙ্কে দলে দলে বাঙালী ছুটছেন এদিকে ওদিকে? দেখলাম এক বৃদ্ধা ব্রীজটা হেঁটে পার হতে ভয় পাচ্ছেন। সাথীরা অধৈর্য! আর যে হাতে সময় নেই! বৃদ্ধাকে তাঁর এক সাথী দেখিয়ে দিলেন তাঁর জীবনে দ্বিতীয়বার শিশুসুলভ গতি লাভের উপায়টি। ভুলে-যাওয়া বাল্যের হামাগুড়ি দিয়ে বৃদ্ধা চড়লেন ব্রীজের ওপর।

সাংবাদিক জীবনে অনেক কিছুই দেখতে হয়েছে। সে সবেরই মধ্যে সবচেয়ে উঁচু আসন দিয়ে রেখেছি বানপুরের এই মর্মান্তিক কাল্‌রাত্রিকে। প্রভাতে গেলাম বানপুর গ্রামের মধ্যে। একটু এগিয়েই মিল্‌ল প্রায় বাড়ির দাওয়ার ওপর সদ্য প্রতিষ্ঠিত একটা ইটের সিমেন্টের বেদী। এ বেদীর এপারে ওপারে দুটো দেশ। সীমান্ত রেখা চলেছে কোথায় উঠানের পর দিয়ে, কোথায়ও ঘরের প্রায় মাঝ দিয়ে, কোনোখানে রান্নাঘর শোবার ঘর থেকে স্বতন্ত্র করে। এধারের মুরগী, বলদ ওদিকে গেলে ফিরে নাও আসতে পারে—মানুষের কথা থাক!

তেলের শিশি ভাঙলো বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো
তার বেলা?

[অন্নদাশংকর]

বহুশতাব্দী পূর্বে যখন চৈনিক পণ্ডিত ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ বা উজবেকী পণ্ডিত আল্ বেরুণী বিদেশ ভারতবর্ষের ভালমন্দ বুঝতে ও দেখতে মুসাফির হয়ে এসেছিলেন, তাঁদের কি এমনি ধারায় প্রতি পদে পদে সীমান্ত পার হোতে বাধা পেতে হয়েছিল? ফা-হিয়েন যখন শ্রাবস্তী নগরীতে প্রবেশ করলেন তখন পথের দু'ধারে দাঁড়িয়েছিলেন নাগরিকেরা, চৈনিক পণ্ডিতকে অভ্যর্থনা ও স্বাগত জানাতে।

যখন তাঁরা ফা-হিয়েনের মুখ থেকে শুনলেন যে তিনি আসছেন সেই সুদূর হ'ন রাজার দেশ থেকে, তখন তাঁদের আনন্দের ও বিস্ময়ের কোনো সীমা রইল না!

আজ হাজার বছর পরে সেই আসা-যাওয়ার সরল স্নিগ্ধ সম্পর্ক মানুষ কিসের জন্যে বন্ধ করতে চায়? কার মঙ্গলের জন্যে সামচুন নদী সীমান্ত হোল? কেন বানপুরের এপাড়া ওপাড়ায় মানুষের যাওয়া আসা এমনি করে হাস্যকর নিষ্ঠুরতায় নিয়ন্ত্রিত করা হোল?

সমাপ্ত

শব্দ সূচী

(নাম)

(দেশ, প্রতিষ্ঠান, যুগ-প্রভৃতি)